NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

SELF LEARNING MATERIAL

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

UNDER GRADUATE DEGREE PROGRAMME

HBG

CC-BG-09

HONOURS IN BENGALI

9

প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও পত্রসাহিত্য

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

CBCS • UG • HBG • BENGALI • CC-BG-09

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিস্যাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price: ₹475.00
[Not for sale]

Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল'/'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

'UGC (Open and Distance Learning programmes and Online Programmes Regulations, 2020' অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্তী
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)
প্রবন্ধ, রম্য রচনা ও পত্রসাহিত্য
কোর কোর্স : CC-BG-09
মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

প্রবন্ধ, রম্য রচনা ও পত্রসাহিত্য

কোর কোর্স : CC-BG-09

মডিউল : ১,২,৩,৪ Module : 1,2,3,4

কোর কোর্স ৪ Core Course : 4	লেখক Course Writer	সম্পাদনা Course Editor
মডিউল : ১ Module : 1	ডঃ সোনালী রায়, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল : ২ Module : 2	ডঃ অয়ন চট্টোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা	
মডিউল : ৩ Module : 3	বানীমঞ্জরী দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল : ৪ Module : 4	ডঃ অনামিকা দাস সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং : ডঃ অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ
বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা
ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা
আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ড. অসিত বরণ আইচ

নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (HBG)

প্রবন্ধ, রম্য রচনা ও পত্রসাহিত্য

কোর কোর্স : CC-BG-09
মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

মডিউল ১ : প্রবন্ধ

একক ১	গীতিকাব্য : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	9-23
একক ২	সভ্যতার সংকট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	24-37
একক ৩	নিয়মের রাজত্ব : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	38-55
একক ৪	শূদ্র জাগরণ : স্বামী বিবেকানন্দ	56-72
একক ৫	তরুণের স্বপ্ন : সুভাষচন্দ্র বসু	73-81

মডিউল ২ : প্রবন্ধ

একক ৬	শিক্ষা ও বিজ্ঞান : সত্যেন্দ্রনাথ বসু	85-97
একক ৭	যে দেশে বহু ধর্ম, বহু ভাষা : অন্নদাশংকর রায়	98-115
একক ৮	রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক : বুদ্ধদেব বসু	116-132
একক ৯	সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব : বিনয় ঘোষ	133-148
একক ১০	চড়ক : কালীপ্রসন্ন সিংহ	149-166

মডিউল ৩ : রম্যরচনা

একক ১১	কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'একা কে গায় ওই'	169-179
একক ১২	কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পতঙ্গ	180-186
একক ১৩	কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিড়াল	187-195
একক ১৪	লাইব্রেরী : বিচিত্র প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	196-203
একক ১৫	বই কেনা : সৈয়দ মুজতবা আলী	204-214

মডিউল ৪ : পত্রসাহিত্য

একক ১৬	'ছিন্নপত্রাবলী' : ১০৭ সংখ্যক পত্র	217-249
একক ১৭	'ছিন্নপত্রাবলী' : ৮ ও ৫৫ সংখ্যক পত্র	250-263
একক ১৮	জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি	264-275
একক ১৯	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি	276-297

মডিউল ১

প্রবন্ধ

একক - ১ ❑ গীতিকাব্য : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ প্রবন্ধ সংরূপের প্রাথমিক পরিচয়

১.৪ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের প্রকাশকালগত তথ্য

১.৫ 'গীতিকাব্য'—মূল পাঠ

১.৬ প্রবন্ধের সারাংশ

১.৭ সাধারণ আলোচনা ও টীকা

১.৮ প্রবন্ধটির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই মডিউলের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে বাংলা প্রবন্ধের বিস্তারিত ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র — প্রায় ৫০ বছর সময়সীমার মধ্যে লিখিত পাঁচটি প্রবন্ধ থেকে ছাত্রছাত্রীরা বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির বিবিধ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবেন। সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, জাতীয় চেতনা, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের মননশীল অভিমত প্রকাশিত হয়েছে পাঠ্য প্রবন্ধগুলিতে। যুক্তিনির্ভর তত্ত্বকথা, বিশ্লেষণ, ভাবনামূলক উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় প্রবন্ধগুলির মধ্যে।

১.২ প্রস্তাবনা

সূচনাকাল থেকেই সমৃদ্ধ চিন্তার ধারক ও বাহক প্রবন্ধ সংরূপটি পাঠ্য। পাঁচটি প্রবন্ধের বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যের সন্ধান পাবেন। তৎকালীন মনীষীদের চিন্তাক্ষেত্র ও মনন শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যাবে। প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম তিনটি সময়সীমায় রচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হবে বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবধারা। ঐতিহ্য, নব্যচিন্তা, সংকট, সমাধান ও সাধনার সমবায়ে বাঙালি জাতির যে আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছিল বিগত দুটি শতকে — তার রেখাচিত্র ধরা পড়েছে এই পাঁচটি প্রবন্ধে।

ভাষাগত ভাবেও এই পাঁচটি প্রবন্ধ পৃথক দৃষ্টান্ত বহন করে। অতএব, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতা পাঠককে আনন্দ দেবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রবন্ধ রচনার কলা কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

১.৩ প্রবন্ধ সংরূপের প্রাথমিক পরিচয়

'প্রকৃষ্ট বন্ধন' সম্পন্ন চিন্তা প্রধান ও তত্ত্বনির্ভর রচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়।

প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তথ্যনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হল— মানবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা প্রকাশ করা। প্রবন্ধ মূলত বিষয়ের গুরুত্ব, প্রয়োজন এবং উপযোগিতার প্রতি আলোকপাত করা হয়। রচনার মধ্যে যুক্তি শৃঙ্খল ও বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন লক্ষ করা যায়। প্রবন্ধের ভাষা যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয়ের গাম্ভীর্য ও তত্ত্বভাবনার কারণে অনেক সময় বিশেষ মনন দাবি করে প্রবন্ধ সাহিত্য।

১.৪ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের প্রকাশকালগত তথ্য

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-'৯৪) 'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে।

'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ডে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি গৃহীত হয়েছে—

১. 'উত্তরচরিত', ২. 'গীতিকাব্য', ৩. 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', ৪. 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', ৫. 'আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প', ৬. 'দ্রৌপদী', ৭. 'অনুকরণ', ৮. 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' ('বিবিধ সমালোচনা' থেকে), ৯. 'বাঙ্গালির বাহুবল', ১০. 'ভালবাসার অত্যাচার', ১১. 'জ্ঞান', ১২. 'সাংখ্যদর্শন', ১৩. 'ভারত-কলঙ্ক', ১৪. 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', ১৫. 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', ১৬. 'প্রাচীনা এবং নবীনা' ('প্রবন্ধ পুস্তক' থেকে)। উল্লেখযোগ্য, 'অনুকরণ' নামক প্রবন্ধটির প্রথম নাম ছিল 'সেকাল আর একাল'। রাজনারায়ণ বসু রচিত ওই একই নামের প্রবন্ধটির সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। গ্রন্থভুক্ত করার সময় এর নাম পরিবর্তিত হয়। প্রবন্ধটি কবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনা হিসাবে রচিত হয়েছিল। বঙ্কিম-রচিত 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) নামক দুটি গ্রন্থ থেকে ৮টি করে মোট ১৬টি প্রবন্ধ নিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ' (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী সম্পাদক ও সঙ্কলকরা 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড/২য় খণ্ড — এই ভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে 'প্রথম ভাগ'/'দ্বিতীয় ভাগ' নামেই উল্লেখ করেছিলেন।

প্রবন্ধটির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত 'গীতিকাব্য' নামক সাহিত্যশাখার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

১.৫ 'গীতিকাব্য'—মূল পাঠ

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলি গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম

প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষ কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত; এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনের গ্রন্থিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চত্ত্য ভাষায় অনেকগুলির উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনের গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুত নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলির উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনের গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুত নাটক নহে। "Comus", "Manfred", "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকে নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রিক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"-কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold"-কে ঐ না দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন। ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাঁহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত

স্বরভঙ্গীর সহিত বলিতে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য অগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পরিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; আগের গীতিকাব্য রচিতই হতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকুই গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যকতির রুদ্ধ হৃদয়মদ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যকত্বি এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভাবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। শেকসপিয়র এমত কোন কথাই তৎকালে

ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যর্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখা যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়বের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতির ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেকসপিয়রের ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যর্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখা যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়বের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতির ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেকসপিয়রের ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, তাহা বক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অবক্তব্য, তাহা আত্মচিত্র সম্বধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমনত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুযঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

১.৬ প্রবন্ধের সারাংশ

প্রবন্ধের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন 'কাব্য' বিষয়টির যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব। পাঠকের উপলব্ধি ও অনুভব কাব্যের অন্তর্নিহিত বক্তব্য স্পর্শ করতে পারে — যা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের অতীত।

এরপর লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের অভিমত স্মরণ করে সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এই অংশে তিনি সব সংরূপকেই 'কাব্য' নামে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীনদের বিভাজনকে 'অনর্থক' বলে চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য বা 'কাব্যে'র তিনটি শ্রেণিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—

১. দৃশ্যকাব্য বা নাটক

২. আখ্যান কাব্য বা মহাকাব্য

৩. খণ্ডকাব্য — যা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত নয়।

এরপর লেখক এই তিনরকম কাব্যের রূপগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সংলাপধর্মী, অভিনয় উপযোগী রচনা মাত্রই 'নাটক' নয়। নাট্যগুণসম্পন্ন 'কাব্য'-ই নাটকের পর্যায়ভুক্ত হবে। আবার কোনো আখ্যান কাব্যের মধ্যে নাট্যগুণ ও রস থাকলে তাকেও নাটক বলা সঙ্গত। অর্থাৎ, সাহিত্যরূপের সঙ্গে তার শ্রেণিগত পরিচয় নাও মিলতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, অন্তর্নিহিত গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিকরণ হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে জন মিলটন রচিত Comus (1634) নামক পুরাণনির্ভর আখ্যানকাব্য, বায়রণের লেখা Manfred (1816-17) নামক নাট্যগুণসম্পন্ন কাব্য এবং গ্যেটে রচিত Faust (1806-07) নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। এই রচনাগুলি সংলাপধর্মী বা কথোপকথন-প্রধান রচনা হওয়া সত্ত্বেও এগুলি নাট্যশ্রেণিভুক্ত হতে পারে না — যথাযথ নাটকের গুণ এতে নেই। আবার স্কটের উপন্যাস Bride of Lamermoor-এর মধ্যে যথেষ্ট নাটকোপযোগী উপাদান আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। অনেক সমালোচকের মতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' বা 'উত্তররামচরিত'কেও নাটক বলা যায় না—একই কারণে। বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই অগ্রসর হয়েছেন মূল বক্তব্যের দিকে। যে কোনো উপাখ্যানমূলক কাব্যই আখ্যান কাব্য নয়। এই প্রসঙ্গে বায়রণের ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা Childe

Harold ও The excursion নামক কাব্য দুটির কথা উল্লেখ, করে বুঝিয়েছেন, সব আখ্যান কাব্যই সমগুরুত্ব পায় না — কারণ, আখ্যান বা মহাকাব্যের গুণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। উপরোক্ত দুটি রচনায় সেই গুণ অনুপস্থিত। ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্র মূল বক্তব্যে প্রবেশ করেছেন। খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত গীতিকাব্য বা Lyric প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে, 'গান'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। গীত বা গান কণ্ঠভঙ্গি বা স্বরভঙ্গির বিশেষ ব্যবহার দাবি করে। এরই মাধ্যমে আনন্দ, দুঃখ রাগ, বেদনা মূর্ত্ত হতে পারে। কিন্তু অর্থহীন স্বর কোনো আবেগ জাগ্রত করতে পারে না। তাই, অর্থযুক্ত শব্দের প্রয়োজন হয়। আর এই সব শব্দসংযোগের ফলে যে কাব্য সৃষ্টি হয় তা সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনীয়। যে কাব্য, গানের মত নিভৃত অথচ ভাব জাগ্রত করে তুলতে সক্ষম তাকেই 'গীতিকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন লেখক।

প্রবন্ধের শেষাংশে এসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য। নাটকে ক্রিয়া ও ভাব অনেকটাই ব্যক্ত করা হয়, গীতিকাব্যে তা অব্যক্ত থাকে। শব্দযোজনার কৌশলে গীতিকবিরা ইঙ্গিতে স্পর্শ করেন বিশেষ ভাব। পাঠকের হৃদয়ে জাগ্রত হয় উপলব্ধি, রসানুভূতি।

উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন মহাকবি বাল্মীকি এবং ভবভূতি উভয়েই সীতাবিসর্জন প্রসঙ্গে রামের বিলাপ রচনা করেছেন। বাল্মীকির রাম গীতিকাব্যের তুল্য বিলাপ করেন, ভবভূতির রাম অনেক বেশি প্রকাশপ্রবণ — যা নাট্যকারের উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ।

আমাদের দেশের আলংকারিকেরা সাহিত্যমাত্রই 'কাব্য' বলে মনে করতেন। 'কাব্য' বলতে তাঁরা একটি ব্যাপক ধারণা পোষণ করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'কাব্য' কে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন : (ক) দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটক; (খ) আখ্যান কাব্য, অর্থাৎ গদ্যে রচিত গল্পমূলক রচনা; (গ) খণ্ডকাব্য এবং মহাকাব্য। এই তিন ধরনের রচনার মধ্যে যে রূপগত পার্থক্য আছে, যে কেউ তা বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু সেই রূপগত বাইরের পার্থক্যটাই এদের পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্যের মূল দিক নয়। যেমন, কথোপকথনে রচিত গ্রন্থ মাত্রই নাটক নয়; আবার অনেক আখ্যানও নাটকের আকারে রচিত হতে পারে, কিংবা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি। এই খণ্ডকাব্যেরই একটি বিশেষ দিক ইউরোপে 'লিরিক' নামে পরিচিত। এই 'লিরিক' বা গীতিকবিতার স্বরূপ সন্ধানই আলোচ্য প্রবন্ধটির লক্ষ্য। ভারতের 'খণ্ডকাব্য' এবং ইউরোপের 'লিরিক' সর্বাংশে এবং সর্বত্র এক বা অভিন্ন নয়। এইভাবে প্রবন্ধটির ভূমিকা করে লেখক মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এই পর্যন্ত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যকে আমরা তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি : প্রথমত, 'গীতিকাব্য' নাম বা অভিধার অর্থ জ্ঞাপন, এর উদ্ভবের ইতিহাস ও স্বরূপ কথন; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকারের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অনুসারে সাহিত্যের প্রকাশরীতির দিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক তিন ধরনের কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা; এই ভাবনাটির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল দিক ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্যকে বিশদ করা।

'গীতিকাব্য' এই সমাসবদ্ধ পদটির বিগ্রহবাক হল : যা 'গীতি', তাই 'কাব্য'। 'গীতি'ও যা 'কাব্য'ও তাই। পাশ্চাত্য Lyric অভিধার বাংলা প্রতিশব্দরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এটির প্রবর্তন করেছেন। 'গীতি' বলতে সঙ্গীত; 'সংগীত' বলতে কণ্ঠস্বরের বিশেষত্বের মাধ্যমে মনের কোনো আবেগের প্রকাশ। আর 'কাব্য' হল ছন্দোময় বাক্য। 'গীত' হওয়াই ছিল 'গীতিকাব্য'র আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, গান গেয়ে না শোনালেও, কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই মনের আবেগকে প্রকাশ করতে পারে এবং তা আনন্দদায়কও বটে, তখন গান গাইবার দিকটি অপ্রধান হয়ে পড়ে। এইভাবে 'গীতিকাব্য' গেয় থেকে অ-গেয় অর্থাৎ নিছক আবৃত্তিযোগ রচনায় পরিণত হয়। ভাবাবেগের

উচ্ছ্বাস প্রকাশ গানেরও লক্ষ্য, কাব্যেরও লক্ষ্য। গীতের যে উদ্দেশ্যে, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। এইভাবে যা গীতি তাই কাব্য—এই অভিন্নতার বোধে এসে পৌঁছান রসিকেরা।

দ্বিতীয় ধারায় বক্তব্যে এসে লেখক সাহিত্যের প্রকাশগত দিক এবং সাহিত্যকারের প্রকাশ ক্ষমতার দিকের কথা তুলেছেন। আমাদের মনের মধ্যে স্নেহ-শোক-ভয় প্রভৃতি নানা ধরণের ভাব থাকে। সাহিত্যের মধ্যে সেই ভাবগুলির সবটাই প্রকাশ করা যায় না। কিছু প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়, কিছু অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকাশ সাহিত্যরূপের (যথাঃ নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্য) কথা তুলেছেন। মানুষের মনের যেসব ভাব ও আবেগ ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, সেগুলি ধরা পড়ে নাটকের মধ্যে। পাত্র-পাত্রীর কথা ও কাজের মাধ্যমে ভাবের সেই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যেসব ভাব আবেগ প্রকাশ করা যায় না, ব্যক্ত হয় না, সেগুলির ক্ষেত্র হল গীতিকবিতা। নাটক ও গীতিকবিতার মধ্যে এটি একটি প্রধান পার্থক্যের দিক। এ দুয়ের মিশ্রণ অনুচিত, কারণ, নাটকের নাট্যকার নিজে নিজের কথা বলেন না, চরিত্রগুলির কথাই তুলে ধরেন (অবশ্য পরে যে 'কাব্য নাট্য'-এর উদ্ভব ঘটেছে তাতে গীতিকবিতার কিছু ধর্ম পাওয়া যায়)। আর মহাকাব্য হল, —মানুষের মনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দু'দিকেরই প্রকাশস্থল। এইজন্য মহাকাব্য হল, —নাটক ও গীতিকাব্যের মিলিত দিক। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য—'গীতিকাব্য'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লেখক গীতিকবিতাকে মাঝখানে রেখে, তার একদিকে নাটক আর অন্যদিকে মহাকাব্যকে রেখেছেন। এইভাবে তিন ধরনের সাহিত্যরূপের পটভূমিকায় গীতিকবিতার বিশেষত্ব নিরূপণ করেছেন লেখক।

তাঁর বক্তব্যের তৃতীয় ধারায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ দিয়ে উল্লিখিত তত্ত্বটি বিশদ করেছেন। তিনি মহাকবি বাল্মীকি এবং নাট্যকার ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এখানে। আলোচ্য বিষয়টি ধরা যাক সীতাবর্জন কালে এবং তারপরে রামচন্দ্রের মনোভাব। ভবভূতি নাট্যকার। কাজেই তার 'উত্তররামচরিত' নাটকে রামচন্দ্রের মনোভাবের যেসব দিক প্রকাশযোগ্য বা ব্যক্ত করবার মতো কেবল সেই সীমাতেই তার আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নাট্যকারের সীমা লঙ্ঘন করে গীতিকবির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ, রামচন্দ্রের মনের যেসব দিক অব্যক্ত-অপ্রকাশযোগ্য, যা গীতিকবির ক্ষেত্র, তাও তিনি প্রকাশ করতে গেছেন। উল্টোদিকে বাল্মিকী মহাকবি। মানবমনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দুই ক্ষেত্রেই তার অধিকার। তিনি করেছেনও তাই। প্রবন্ধকারের অভিযোগ, নাটকের মধ্যে গীতিকবিতাকে এনে ফেলে ভবভূতি ঠিক কাজ করেননি। অবশ্য, একথাও তিনি বলেছেন, ঈষৎ মাত্রায় নাটকের মধ্যে গীতিকবিতার অনুপ্রবেশ সহনীয়। মানবমনের ব্যক্তব্য, বিষয়টি হল, —'পরসম্বন্ধীয়'; আর, অব্যক্তব্য বিষয়টি—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার বিষয় হল, —'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'।

১.৭ সাধারণ আলোচনা ও টীকা

সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে সাহিত্যের নানা লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। 'গীতিকাব্য' প্রসঙ্গে প্রধান আলোচনা হলেও নাটক, আখ্যানকাব্য, উপন্যাস— প্রভৃতি রচনা সম্পর্কেও সাধারণ ধারণা ব্যক্ত করেছেন লেখক।

'Lyric' বলতে গীতি কবিতাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। গীতিকবিতার অন্যতম লক্ষণ হল আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে, রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' সহ কয়েকটি কাব্য প্রকাশিত হলেও তা এই আলোচনার ক্ষেত্রে গৃহীত হয়নি। মধ্যযুগের কাব্য, পদাবলী, মধু-হেম-নবীন, অর্থাৎ মধুসূদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখর Lyric জাতীয় কাব্যকে গ্রহণ করে বাংলা গীতিকবিতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কবির মনোভাব সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হবে। অন্যপক্ষে, নাটকের ক্ষেত্রে তা ক্রিয়াপ্রধান বলেই, কিছুটা অধিক প্রকাশিত হতে পারে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, নাটককারেরও অতিরিক্ত সংলাপ যোজনা করা নিষ্প্রয়োজন। মহাকবির ক্ষেত্রে অবশ্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় ভাষা ও বিবরণাত্মক প্রকাশভঙ্গি দুই-ই পাওয়া যায়। কারণ, লেখকের মতে মহাকাব্য একই সঙ্গে গীতিকবিতা ও নাটকের লক্ষণ বহন করে।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে লেখক ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কিছু রচনার নাম উল্লেখ করে সাহিত্যের শ্রেণিবিভাজন করতে চেয়েছেন। বৃহৎ অর্থে তিনি সব রচনাকেই 'কাব্য' আখ্যা দিয়েছেন। এই অংশে রামায়ণ মহাভারতকে লেখক 'ইতিহাস বলিয়া খ্যাত' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যকর্মগুলির মধ্যে কয়েকটির সাধারণ পরিচয় হল নিম্নরূপ—

ভারতীয় সাহিত্য

১. **রামায়ণ :** বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য। মূলত রামচন্দ্রের জীবনকথা কেন্দ্রিক, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের চিত্র সম্বলিত মহাকাব্যিক রচনা।

২. **মহাভারত :** বেদব্যাস রচিত মহাকাব্য। কৌরব বংশের বিবরণ ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলী এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সমকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক-ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে রামায়ণ ও মহাভারত 'আদি মহাকাব্য' হিসাবে স্বীকৃত। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হলেও বহু কবি ও দার্শনিকের অবদান বৃহদাকার দুটি মহাকাব্যে লীন হয়ে আছে। দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' ও 'অষ্টাদশ পার্বিক মহাভারত' রচিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

৩. **শ্রীমদ্ভাগবত :** ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণ সাহিত্যের অন্যতম শাখা 'ভাগবত মহাপুরাণ'। মূলত বিষ্ণুর জীবনকেন্দ্রিক রচনাটি ১৮০০০ শ্লোকে ও ১২টি স্কন্দে বিন্যস্ত। ১৮টি পুরাণের মধ্যে এই পুরাণটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। পরবর্তী বহু সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে এই পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। মহাভারতের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়েছে।

৪. **রঘুবংশ :** মহাকবি কালিদাস রচিত সাহিত্যিক মহাকাব্য। ১৯টি সর্গে রঘুবংশ — অর্থাৎ রামচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বংশাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

৫. **শিশুপাল বধ :** মহাভারতের অন্যতম চরিত্র চেদিরাজ শিশুপালকে কৃষ্ণ বধ করেছিলেন। এ কাহিনি অবলম্বন করে মহাকবি মাঘ সংস্কৃতে একটি কাব্য রচনা করেন। আনুমানিক ৭ম-৮ম শতাব্দীতে এটি রচিত হয়।

৬. **বাসবদত্তা :** সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত নাটক 'স্বপ্ন বাসবদত্তা'। খ্রি. পূ. ৫০০ থেকে ৩৫০-এর মধ্যে সম্ভবত এই নাটক রচিত হয়।

৭. **কাদম্বরী :** রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'কথা' শ্রেণির গদ্য নির্ভর রচনা। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এটি রচিত হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্য

১. **Comus :** মহাকবি জন মিলটন রচিত একটি কাব্য। ১৬৩৪ সালে লেখা হলেও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৩৭ সালে। গ্রন্থটি Comus নামে পরিচিত হলেও এর প্রকৃত নাম 'A Mask presented at Ludllow

Castle, 1634'। গ্রীক পুরাণ কথা থেকে গৃহীত কাহিনিটির মধ্যে সততা ও পবিত্রতার জয়গান করা হয়েছে। দেবতা বাক্কাস-এর পুত্র Comus-এর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ ও ব্যর্থতাই এই ইংরেজি কাব্যের প্রধান বিষয়।

২. **Manfred :** ১৮১৬-'১৭ সালে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ এই নাট্যকাব্য জাতীয় রচনাটি প্রকাশ করেন। Manfred নামক চরিত্রটি নানা অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় এবং ক্রমশ সমাজ বিচ্ছিন্ন, একক জীবনে উপনীত হয়। মৃত্যুতেই তার বিচিত্র জীবন অন্বেষণের সমাপ্তি ঘটে।

৩. **Faust :** জার্মানি মহাকবি গ্যেটে ১৭৭২-১৭৭৫ সালের মধ্যে এই নাটকটি রচনা করেন। যদিও ১৮০৬ সালে এর প্রথম ভাগ এবং ১৮৩১ সালে এর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। জার্মান লোককথা অনুসারে ফাউস্ট নামক চরিত্রটি শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বন্ধক দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে চায়। এই বিষয়টি নিয়েই গ্যেটে Faust নাটকটি রচনা করেন।

৪. **The Bride of Lammermoor :** ১৮১৯ সালে উইলিয়াম স্কট রচিত ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাসটি, সারা বিশ্বে বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনি রূপে জনপ্রিয়। লুসি অ্যাশটন এবং এড্‌গার র‍্যাভেনশউড নামক নায়ক-নায়িকার প্রেম ব্যর্থ হয় পারিবারিক শত্রুতা ও বংশনুক্রমিক দ্বন্দ্বে। উপন্যাসটির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও রোমান্টিক চেতনা — দুই-ই লক্ষ করা যায়।

৫. The Excursion ও Childe Harold

- প্রথমটি Wordsworth রচিত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। ১৮১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Recluse'—এটি তার অন্তর্গত ভ্রমণমূলক দার্শনিক চিন্তাসম্পন্ন একটি রচনা।
- দ্বিতীয় রচনাটি ১৮১২-১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন লর্ড বায়রণ। ইংরেজি ভাষায় লেখা Harold নামক এক তীর্থযাত্রীর যাত্রাপথের বিবরণ-ই এই কাব্যের বিষয়। পতুর্গাল, স্পেন, আলবানিয়া, বেলজিয়াম, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম — প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

যথাযোগ্য কাব্যপ্রতিভার অধিকারী হলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বায়রণ এই দুটি রচনায় প্রতিভার নিদর্শন দেখাতে পারেননি।

১.৮ প্রবন্ধটির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার একটি বড়ো অংশ অধিকার করে আছে সাহিত্য সমালোচনা। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি তার সার্থক উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ প্রধান ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে 'গীতিকবিতা' বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে গান ও কবিতার আন্তর সম্বন্ধ নিরূপণের উদ্দেশ্যে। এই সূত্রে তিনি মানব মনের বিভিন্ন ভাব কীভাবে সঙ্গীত মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, তা বুঝিয়েছেন। স্বরভঙ্গি এবং সুরের সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য শব্দের প্রয়োগ এই উদ্দেশ্য সাধন করে।

প্রবন্ধের এই অংশে এসে লেখক অতি চমৎকার ভাব্যে গীতিকবিতার প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। কবি বা বক্তার ভাবকে যদি ধরতে হয় তাহলে সুর বা গায়ন যেমন সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনই যথার্থ ছন্দোবিশিষ্ট রচনা সেই কাজে সক্ষম হয়। তাই, সর্বদা সঙ্গীতের প্রয়োগ না করেও গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য সাধিত

হয়, উপযুক্ত ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগে কাঙ্ক্ষিত ভাবের মুক্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গেই বঙ্কিম 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে গীতিকবিতার ভাবগর্ভ স্বরূপটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যে সব কথাই সোচ্চারে বলার প্রয়োজন নেই, গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে তা আরও সীমিত। এই সংরূপটি স্বল্প কথা রস উদ্রেক করতে সক্ষম হয়। নাট্যরূপে কিঞ্চিৎ বেশি বাক্য সংযোজিত হয়, তৎসত্ত্বেও লেখকের মতে এক্ষেত্রেও স্রষ্টার সংযম আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ সেকস্‌পীয়র-এর 'ওথেলো' নাটকের কথা বলেছেন তিনি। মিথ্যা সন্দেহে নিরাপরাধ স্ত্রী ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করার পর, প্রকৃত ঘটনা জানবার অভিঘাতে ওথেলোর যে আচরণ বা সংলাপ প্রকাশিত হয়েছে — বঙ্কিমের মতে তাই-ই আদর্শ। ভবভূতির নাটক উত্তর রামচরিতে রাম সীতাকে বিসর্জন দেবার পর যে বিলাপ করেন, তা অতি কথন দোষ দুষ্ট। এর ফলে আভ্যন্তরীন বেদনার বা করুণ রসের সঞ্চার যথাযথ হয় না। এই বহুভাষণ নাটক বা গীতিকাব্যের রস ক্ষুণ্ণ করে। শেষাবধি লেখক জানিয়েছেন কবির নিভৃত, নিজস্ব বক্তব্যগুলি যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ব্যক্ত হলেই কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা সাহিত্য, সৌন্দর্য ও পরিণতি লাভ করেছিল। উপন্যাস ও প্রবন্ধ দুটি ধারাতেই তাঁর মননশক্তি, শিল্পকুশলতা ও রসসৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয় গৌরব চেতা, আদর্শবোধ ও কল্যাণমূলক চিন্তা। সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই তিনি বাঙালি জাতিগঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাষাগত স্পষ্টতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা লক্ষণীয়। বিষয়োপযোগী তথ্য, বিশ্লেষণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁর প্রবন্ধকে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। একই সঙ্গে ভাষার লালিত্য ও বাক্‌বিন্যাসের প্রসাদগুণ রচনার মাধুর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্যে উপরোক্ত লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর বহু পঠনের সাক্ষ্য রয়েছে ছত্রে ছত্রে। অথচ সমগ্র রচনাটির মধ্যে রয়েছে ছত্রে ছত্রে। অথচ সমগ্র রচনাটির মধ্যে প্রাঞ্জলতা, নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নতুন চিন্তার আয়োজন থাকার ফলে সাধারণ পাঠকও এর রসগ্রহণে সক্ষম। শুধু তাই নয়, উৎসাহী পাঠক খুঁজে নিতে চাইবেন, প্রবন্ধে উল্লিখিত তুলনামূলক সূত্রগুলি। বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক সমালোচনার পথিকৃৎ। অনভিজ্ঞ পাঠক 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে অজস্র নতুন প্রসঙ্গের সম্মুখীন হবেন, অভিজ্ঞ পাঠকের ক্ষেত্রে তা নতুন প্রাপ্তির দরজা খুলে দেবে। নিজস্ব পাট ও বিশ্লেষণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত মতামতগুলি তুলনা করে দেখার সুযোগ পাবেন তাঁরা। সামগ্রিক ভাবে বাংলা সমালোচনার ধারায় এবং প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্যিক রচনামাত্রকেই 'কাব্য' বলবার প্রথা ছিল। এ প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মধ্যেও দেখা গেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই, রামায়ণ মহাভারত 'ইতিহাস' বলে খ্যাত হলেও, এ দুটিকেও কাব্য বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত 'পুরাণ' হলেও তার অংশ বিশেষকে কাব্য বলেন। আধুনিক যুগের পাঠক রামায়ণ-মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলে স্বীকার করুন বা না করুন, কাব্য বলেই স্বীকার করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক পাঠকের মতগত পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিকে 'উৎকৃষ্ট কাব্য' বলেন, তা আধুনিক যুগের পাঠক স্বীকার করবেন না। এগুলিকে তাঁরা 'উপন্যাস' বলেই মানবেন। Walter Scott (১৭৭১-১৮৩২) অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের রোমাণ্টিকতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি রোমাণ্টিক রূপ দান করে উপন্যাসকে এক বিস্তৃত পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছিলেন। হয়তো রোমাণ্টিকতার এই বিস্তৃতির কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাসগুলিকে সরাসরি 'কাব্য' বলেছেন; আধুনিক পাঠক এই ধরনের উপন্যাসকে 'রোমান্সধর্মী উপন্যাস' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু সরাসরি কাব্য বলবেন না। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসের এত বৈচিত্র্য এবং সে অনুযায়ী পারিভাষিক নাম প্রদানের প্রথা সৃষ্টি হয়নি। আধুনিক পাঠক এক-একটি সাহিত্যে রূপের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত বলেই এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহমত পোষণ করা সম্ভব হবে না।

নিতান্ত আক্রোশে অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু নাটকের মধ্যেও আজ নানা রূপ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে : কাব্য নাট্য, নাট্যকাব্য রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি গদ্যে লেখা, তথাপি তা কবিতার কাছাকাছি। গদ্য কাব্যের প্রবর্তনের পর গদ্যে-পদ্যে ভেদ অনেকটাই ঘুচে গেছে; কাজেই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরীতির আশ্রয়ে লেখা নাটক কবিতার কাছাকাছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে, নাটক মাত্রই কাব্য, —আধুনিক পাঠক তা নাও মানতে পারেন। নাটক বিচারের দৃষ্টিকোণ আজ যেমন পরিবর্তিত, নাট্যকারের দিক থেকে তার রচনারীতিও আজ ঠিক তেমনটি নেই।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটিকে সমকালীন পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ হয়তো প্রভাবিত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে খাঁটি নাটক কেবল গ্রিক বা ইংরেজি ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় নেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'—এই দৃষ্টিতে নাটক নয়, কাব্য। Goethe-র মত উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। গ্যেটে নিজে করি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি "Faust" নাটকটি লিখেছেন, ফাউস্টের জীবনের ট্র্যাডেজিকে তুলে ধরেছেন। হয়তো গ্যেটের সময় Reading drama এবং Stage drama-র পার্থক্য তেমন প্রবল ছিল না; আজকের সমালোচক Faust কে Reading ধরে নিয়ে তার মঞ্চগত দিক উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু 'কথোপকথনে' গ্রন্থনা তো করতেই হবে। আজকের সমালোচক নাটক বলতে তার মঞ্চায়ন ও আভিনায়িক দিককেই মুখ্য বলে মানবেন এবং সেই কারণে কাব্য নাট্যেরও অভিনয় আজ বিরল নয়। Closet বা Reading drama রূপে আজ নতুন এক ধারার নাটকেরই সৃষ্টি হয়েছে। Absurd নাটক পাঠ্য নাটক রূপে বেশি সফল হলেও তারও অভিনেয়তা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আজ যেখানে পাঠ্য ও অভিনয়—দু'ধরনের নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে' সেখানে গ্যেটে কথিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থিত, কথোপকথন বিহীন, অভিনয়শূন্য নাটকের কল্পনা করবেন না।

আসলে এই ধরনের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণের অনুসারী গবেষক-শিল্পী-সমালোচকগণ নাটককে খোঁজেন কোনো রূপের মধ্যে নয়, রচনার আত্মার মধ্যে। তাই কথোপকথন এবং অভিনয় নাটকের পক্ষে অপরিহার্য বলে তাঁরা মানেন না। নাটকের সেই আত্মা লুকিয়ে আছে কাব্যের মধ্যে, আখ্যায়িকার মধ্যে এবং খাঁটি নাটকের মধ্যে তো বটেই। এই জন্য তাঁরা গদ্য-পদ্য, অভিনয়-কথোপকথন প্রভৃতির বালাই স্বীকার করেন না। অথচ, আধুনিক যুগেই, পাশ্চাত্য জগতে নাটক বিচার করতে গিয়ে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের দ্বন্দ্ব-বিবর্তনকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে রূপদানকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী তার অভিনয় ও মঞ্চব্যবস্থাও ভিন্ন হবে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রঙ্গমঞ্চকে প্রাধান্য দিতে চাননি।

এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটি বিচার্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে'-রই অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর একটু বেশি আলোচনা করেছেন। শেকসপিয়র এবং কালিদাসের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, শকুন্তলার মনোভাব কালিদাসের টীকা ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু ওথেলোর মনোভাব শেকসপিয়র ওথেলোরই কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ শেকসপিয়রীয় রীতিকেই তিনি খাঁটি নাট্যরীতি বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে নাটককে সেখানে বলা হয়—'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কাব্যত্বই এখানে প্রধান নাটকত্ব নয়। কেন এই পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তর দেননি। আমাদের মতে এর উত্তর এই : ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটককে দেখা হয়েছে রসসৃষ্টির উপায় রূপে; কাহিনী ঘটনা চরিত্র সংস্থা-পনের দিক থেকে নয়। রসসৃষ্টিই এখানে নাটকের মূল লক্ষ্য বলে কাব্যত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। একথা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, যে, খাঁটি নাটকের মাধ্যমেও রসসৃষ্টি হতে পারে, হয়েও থাকে। রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করবার জন্যই নাটক 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে পড়েছে কিনা, কে জানে।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির প্রথম অংশ নাটক এবং কাব্যের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য জগৎ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়ন করে আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। তিনি জন মিল্টনের Comus (সম্পূর্ণ নাম—Mark of Comus, ১৬৩৪ খ্রিঃ), George Gordon Byron-এর (১৭৮৮-১৮২৪, Lord Byron নামে সমধিক পরিচিত) Canfred (Faust-এর Parody বা লালিকা রূপে রচিত) নাটকগুলির কথা খ্রিঃ শেষ দুই সন ১৮১৬-১৮১৮) নাটকটির কথাও বলেছেন। Mark of Comus, নাম থেকেই বোঝা যায় এটি মুখোশ-নাটক; নাচ-গান নাটকে পূর্ণ। সমালোচকেরা এটিকে Pastoral drama বলে থাকেন। আমোদই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়া উল্লেখ করেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (The) Excursion (১৮১৪ খ্রিঃ)। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে The Recluse নামে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি বের হয় তার প্রথম পর্বের নাম The Prelude, দ্বিতীয় পর্বের নাম The Excursion তৃতীয় অংশটি অলিখিত। ওয়াল্টার স্কটের একটি প্রেমের উপন্যাস 'The Bride of Lammermor' তখন বাঙালির কাছে একটি প্রিয় উপন্যাস; 'নরনারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসটির কথা বলেছেন।

উপরে উল্লিখিত এই বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে কাব্য ও নাটকের মাত্রা-পরিমাণ অন্বেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য" নাম দেওয়া যায়, তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion এবং বায়রনের Childe Harold তাই। আবার স্কটের লেখা উপন্যাস Bride of Lammermoor কে তিনি 'নাটক' বলেন, যেমন, উপাখ্যানকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য বলেন (এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু তিনি পার্থক্য করলেন না), তেমনি উপন্যাসকেও 'নাটক' বলেন। আবার, Comus, Manfred Faust, যা কথোপকথনের আকারে লিখিত, সে সব রচনাকে তিনি 'কাব্য' বলেন। অর্থাৎ রচনার বাহ্যিক আকৃতি-অবয়ব দেখে তিনি তার সাহিত্যিক প্রকৃতি নিরূপণ করতে চান না। রূপকে অতিক্রম করে তার আত্মাকে পৌঁছতে চান।

এইভাবে কাব্যের সঙ্গে নাটকের ভেদ বিশ্লেষণ করে কাব্যেরই একটি অঙ্গ 'গীতিকাব্যে'র ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। কাজেই এই ভূমিকা অংশটির একটি অপরিহার্যতা আছে। এই অংশটিকে প্রথম ধাপ বলে মেনে নিয়ে পাঠক মূল আলোচ্য ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারবেন।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্য মাত্রই 'কাব্য' এবং সেই কাব্য আবার তিন ধরনের : দৃশ্যকাব্য (নাটক); আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; আর যা কিছুই এ দুয়ের বাহিরে, তাই 'খণ্ডকাব্য'। খণ্ডকাব্যের মধ্যেও যে নানা শ্রেণী আছে, রকমফের আছে, এই বিভাগ অনুসারে তা ধরা পড়ে না। এ বিভাগ অতি-ব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। ইউরোপে যাকে 'লিরিক' বলে খণ্ডকাব্য তার কাছাকাছি, কিন্তু সর্বাংশে অভিন্ন নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বঙ্কিমচন্দ্র লিরিক কবিতা রূপে খণ্ডকাব্যের যে টুকু অংশ গ্রহণীয়, তার কথা বলেছেন।

'গীতিকাব্য' ('অবকাশরঞ্জিনী' নামে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত। বৈশাখ, ১২৮০। এটি নবীনচন্দ্র সেনের একটি গীতিকাব্য সঙ্কলন। এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে এটি লিখিত) প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখন 'লিরিক' বা গীতিকবিতা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির মনে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গীতিকবিতা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতি সুন্দরভাবে গীতিকবিতার একেবারে মূল ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ গীতিকবিতাকে যে Lyre (Lyrea) বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গেয় রচনা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকেই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। মূলত গ্রিকগণ ছিল এই ধারণার পরিপোষক। Lyre (Lyrea) থেকেই Lyric শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ভাবের দিক থেকে পাশ্চাত্য জগতে গীতিকবিতাকে বা

'Reflexive' 'আত্মবাচক' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একেই বলেছেন 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্য রসবোধের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মনের তাবৎ ভাবকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন : ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য। ব্যক্তব্য অংশ নাট্যকারের ক্ষেত্রে; অব্যক্তব্য অংশ লিরিক কবির ক্ষেত্র। অর্থাৎ কবির 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়', অব্যক্তব্য বিষয়ই গীতিকাব্যের বিষয়। তবে, কেবল একা কবিরই আত্মবিষয়ক হবে, এমন কোনো মানে নেই। তা একজন বক্তার আলোচ্য বিষয়ও হতে পারে। এই পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অতি সুন্দর এবং যথার্থ। কিন্তু সেই ব্যক্তব্য অংশের প্রকাশকাল ও প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট কোনো আলোকপাত করেননি। কিংবা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশকলার প্রকরণ অনুযায়ী গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগও তিনি করেননি। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতা নিয়ে এই আলোচনা করেছিলেন, সে সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভব ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করে আজ তাঁর প্রবন্ধটিকে আংশিকভাবে অসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

একদা গীতিকবিতার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'একটুখনির মধ্যে অনেকখানি ভাবের বিকাশ'। 'একটুখানি' কথাটির মধ্যে গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত সংহত-তীক্ষ্ণ-যথাযথ রূপগত পরিসরের কথাটি আছে। গীতিকবিতার এই বিশেষ রূপবন্ধটিকে সবার আগে লক্ষ করতে হবে। গীতিকবিতার প্রকরণ বা প্রকাশকলার প্রধান উপকরণ হল ভাষা (শব্দ, চয়ন, গীতিময় পদসৃষ্টি), ছন্দ এবং চিত্রকল্প। ভাবের তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা, গভীরতাকে ব্যক্ত করতে সরাসরি ভাষাভঙ্গি অপেক্ষা চিত্রকল্পের আশ্রয় দিতে হবে। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প সবই হবে ভাবের প্রকৃত প্রকাশক এবং সেই কারণে অপরিহার্য। নিসর্গজগৎ গীতিকবিতার এটি বড়ো অবলম্বন। নিসর্গজগৎ গীতিকবির মনে নানা তত্ত্ব-ভাবনার সূচনা করে। গীতিকবির আত্মবিশ্লেষণের ফলে কখনো তিনি রোমান্টিক, কখনো বা মিষ্টিক।

আধুনিক যুগে গীতিকবিতার এক নতুন মাত্রা দেখা যাচ্ছে। এখানকার 'গীতিকবিতা' একদিকে পাঠ্য বটে অপরদিকে, সুরসহযোগে তা গেয়ও বটে। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত 'গীতাঞ্জলি'র গান কবিতাগুলি। মূলত এগুলি গান, গানরূপেই রচিত এবং সুরে সমর্পিত। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে এ রচনাগুলিকে পাঠ্য কবিতারূপেও ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিক গীতিকবিতার এই প্রয়োগ বা ব্যবহারিক দিকটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গীতিকবিতার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে গীতিকবিতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ব্যক্ত করার অবকাশ পাননি।

আদিতম গীতিকবিতার নির্দশন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিড-সাহিত্যে অন্ত্যেষ্টির কালে রচিত শোকগীতিরূপে (খ্রি.পূ. ২৬০০)। মৃত রাজার প্রশস্তিরূপে কিংবা দেবতার প্রতি স্তোত্র রূপে। এই পর্বে মেষপালক ও জেলেদের গানও মিলেছে। পরবর্তীকালে (খ্রি.পূ. ১৫০০) সমাধিফলকে উৎকীর্ণ গানও পাওয়া গেছে গীতিকবিতা রূপে। ইজিপ্শীয়দের মতো হিব্রু ও গ্রীক লিরিকের জন্ম হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রিক গীতিকবিতা গীত বা মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হত, কখনও বা নৃত্যের সঙ্গে।

হোমারের রচনার মধ্যেও গীতিকবিতার বিষয় ও মানসভঙ্গির ইঙ্গিত আছে। খ্রি.পূ. সপ্তম শতকের আগে খাঁটি অর্থে গীতিকবিতার জন্ম হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর পিণ্ডার (Pinder) প্রভৃতি গ্রিক কবিগণ এবং ইস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডস প্রভৃতি নাট্যকারগণ কিছু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গীতিকবিতা লেখেন। রোমান গীতিকবিগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মচরিতমূলক গীতিকবিতা রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন। খ্রিস্টিয় ৩০০ পর থেকে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গীতিকবিতায় বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং শিল্পগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। রেনেসাঁসের যুগে ইটালিতে পেত্রার্ক (Petrach) এবং ফ্রান্সের Ronsand গীতিকবিতার যুগের প্রবর্তন করেন, বিশেষত সনেট কবিতায়।

ইংলণ্ডেও গীতিকবিতার অনুশীলন চলতে থাকে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে থেকে Restoration যুগ পর্যন্ত বহু ইংরেজ কবি গীতিকবিতা রচনা করেন। ষোড়শ শতকে এই ধরনের গীতিকবিতার সঙ্কলন বের হতে থাকে। সিডানি (Sidney), স্পেনসার (Spenser), শেকসপিয়ার, বেন জনসন (Ben Janson), হেরিক (Herrick), মিল্টন (Milton) প্রভৃতি এ যুগের গীতিকবি। এঁদের মধ্যে সিডনী, স্পেনসার এবং শেকসপিয়রের সনেটধারা উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের কলিন্স (William Collins) এবং গ্রে-র (Thomas Gray) 'ওড' কবিতা গীতিকবিতার একটি বিশেষ ধারাকে সমৃদ্ধ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, রোমান্টিক পর্বে, গোটা ইউরোপেই গীতিকবিতার জোয়ার আসে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস (Burns) ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক (Blake) কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস; জার্মানিতে গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller), ফ্রান্সে ভিকটর হুগো (Victor Hugo), রাশিয়ায় পুশকিন (Pushkin) প্রভৃতি এঁদের মধ্যে আছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের বোদলেয়ের (Baudelaire) যিনি একজন সাংকেতিকতার প্রবর্তক, ফরাসিভাষায় তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখেন। অন্যান্য গীতিকবিদের মধ্যে আছেন : য়েটস (W.B. Yeats), এজরা পাউণ্ড (Ezra Pound), এলিয়ট (T.S. Eliot), অডেন (W.H. Auden) প্রভৃতি।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী খাঁটি অর্থে এই ধারার সূচনা করলেও, তাঁর আগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অন্যান্য অসংখ্য কবি এদিকে লেখনী সঞ্চালন করে। রবীন্দ্রনাথ এসে এই ধারার চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়। এই পর্বের আর এক বৈশিষ্ট্য, বাঙালি মহিলা গীতিকবির রচিত গীতিকবিতার প্রচলন। এই সব মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। দাম্পত্য প্রেম এবং গার্হস্থ্য ধর্ম এঁদের গীতিকবিতার মূল বিষয় ছিল।

১.৯ অনুশীলনী

ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (২০০ শব্দের মধ্যে)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ও চাকুরি জীবনের পরিচয় দিন।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস এবং প্রথম তিনটি বাংলা উপন্যাসের নাম করুন এবং মন্তব্য করুন।

৩। কালানুক্রমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাসের নাম করুন এবং এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রসঙ্গে মন্তব্য করুন।

৫। 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত, তার বিবরণ দিন।

৬। 'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ কী? ক' ধরনের প্রবন্ধে আছে?

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করুন। তাঁর সহযোগী লেখকগণের নাম কী?

৮। প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'কাব্য' বলতে কী বোঝান হ'ত? তখন 'কাব্য' কীভাবে বিভক্ত করা হত?

৯। এই রচনাগুলির পরিচয় দিন : Faust, comus' Manfred, child Harold.

১০। Walter Scott এবং Bride of Lammermoor প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

খ. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন (১০০ শব্দের মধ্যে)

১। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধ ধারার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির পেছনের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

২। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধের ধারাটিকে কী কী ভাবে বিভক্ত করা যায়?

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পূর্ণ পরিচয় এবং প্রবন্ধকার রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করুন।

৫। কাব্য এবং নাটকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন। Reading drama এবং stage drama-র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৬। বঙ্কিম-প্রবন্ধে আলোচিত সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্ব)—সুকুমার সেন

২। 'বাঙ্গালা প্রবন্ধ'—সুকুমার সেন

৩। 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা'—অধীর দে

৪। 'সাহিত্য সন্দর্শন'—শ্রীশ চন্দ্র দাস

৫। 'বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ও অন্যান্য' (১ম ও ২য় খণ্ড)—গোপাল হালদার

৬। 'বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য'—নীলিমা ইব্রাহিম

৭। 'J. A. Cuddon (সম্পাদিত)—'A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory'.

একক : ২ ❑ সভ্যতার সংকট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ প্রাথমিক পরিচয়
২.৪ 'সভ্যতার সংকট'—মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
২.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
২.৬ সারাংশ (প্রথম অংশ)
২.৭ 'সভ্যতার সংকট'—মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
২.৯ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
২.১০ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পাঠ
২.১১ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও টীকা
২.১২ সাধারণ আলোচনা
২.১৩ প্রবন্ধটির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
২.১৪ অনুশীলনী
২.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্বের প্রবন্ধ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। প্রসঙ্গত 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ মূল সুর কোথায় কতখানি পৃথক, সেই সম্পর্কেও তারা একটি সম্যক ধারণা করতে সক্ষম হবে।

২.২ প্রস্তাবনা

মূল প্রবন্ধপাঠের পাশাপাশি প্রবন্ধে-উল্লিখিত নানা প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আলোচ্য এককটি সজ্জিত।

২.৩ প্রাথমিক পরিচয়

বাংলা ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ, সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের আসন্ন আশীতম জন্মদিন উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্যই লিখিত হয়েছিল 'সভ্যতার সংকট'। পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত রচনাটি উপস্থিত শ্রোতা দর্শকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। শারীরিক কারণে রবীন্দ্রনাথ সামান্য কয়েকটি

কথায় আশ্রমবাসীদের সম্ভাষণ করেন, ভাষণটি পাঠ পরেন বিশিষ্ট দার্শনিক-অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় এটিই শেষ জন্মোৎসব; সেই বছর তাঁর প্রকৃত জন্মদিবস — পঁচিশে বৈশাখ, নিতান্ত অনাড়ম্বরে পালিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজ-শোষণ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের নিন্দা রবীন্দ্রনাথকে নিতান্তই ক্রুদ্ধ করে তোলে। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সেই ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভাবনার আশা ব্যক্ত করেছেন। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবন্ধের শেষে 'ওই মহামানব আসে' গানটি সংযুক্ত হয়। পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানের শেষে গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানটির মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা, ঋষিসুলভ আকাঙ্ক্ষা ও কবির দর্শন।

২.৪ 'সভ্যতার সংকট'—মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য পরিবেশনে প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেকসপিয়রের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্‌সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি, ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্য মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কুলষিত হয়নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা

সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্ঠিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন' যাকে আমার সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তা যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করল। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমার ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম-সভ্যতাকে যারা চরিত্র উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব-বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশে ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি, অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষ্যা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এই ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই

পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিয়ে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েত গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধ কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাকে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তি নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নরজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার একমাত্র কারণ সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চলল।

২.৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'কালান্তর' প্রবন্ধটি সঙ্গে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির ভাবগত এবং রূপগত সংযোগ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দুটিতেই দেখা যাবে, প্রথমে নানাদিক থেকে ইংরেজের প্রশংসা, পরে ইংরেজের ঔদার্য এবং মানবিকতাবোধের প্রতি লেখকের আস্থা-বিশ্বাস হারানো। দুই ক্ষেত্রেই লেখকের মানসিক বিক্ষোভ ধরা পড়েছে। 'কালান্তর' এবং 'সংকট' শব্দ দুটির মধ্যেও একটি দূর ও পরোক্ষ সাদৃশ্য আছে।

তাঁর বাল্যকালে লেখক মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয়ে পেয়েছিল ইংরেজের চরিত্রে। ইংরেজের ঔদার্যের প্রতি তখন তাঁদের ছিল গভীর আস্থা। ইংরেজের সভ্যতার মধ্যেই তাঁরা সভ্যতার চরম নির্দশন দেখেছিলেন এবং জীবনে তারই অনুসরণ করতেন তাঁরা। ভারতীয় 'সাদাচার'কেও তাঁরা তেমন গুরুত্ব প্রদান করতেন না। ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে ছিল—বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। এজন্যে তাঁদের মনে কোনো হীনমান্যতার বোধ ছিল না। ইংরেজের যে সাহিত্যের লেখকের মন পুষ্টিলাভ করেছিল, তার প্রভাব তাঁর পরিণত বয়সেও বজায় ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ইংরেজের দ্বারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে। যেসব দেশে তখন স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল, তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ড।

কিন্তু কালক্রমে সেই ইংরেজের মধ্যে এলো সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বলদর্পিতা ও মদমত্ততার দিকে। ইংরেজের অপশাসনের দুটি দিককে, লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষের সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীকে যন্ত্রচালনার দীক্ষা না দিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখা। দুটি প্রসঙ্গেই তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন প্রথম প্রসঙ্গটির দৃষ্টান্ত নিয়েছেন রাশিয়া থেকে; আর দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি দৃষ্টান্ত নিয়েছেন জাপান থেকে। রাশিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের কর্তৃত্ব নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, ভারতবর্ষে যেমন ইংরেজ ঘটিয়েছে। তেমনি জাপান যন্ত্রচালনার শিক্ষার ফলে অতি দ্রুত সর্বতোভাবে সম্পদবান্ হয়ে উঠেছিল, —ইংরেজ সে সুযোগ ভারতবাসীকে দেয়নি।

আলোচ্য প্রবন্ধটির উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হল—সমকালীন পৃথিবী থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত আহরণ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তার তুলনা। এইখানে আরো একটি বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত। স্বাদেশিকতার নামে তখন বিশ্বের কোন কোন দেশে chauvinism বা উগ্রস্বাদেশিকতার ধারার প্রবর্তন ঘটে। এরই অপর দিক হল, Jingoism অর্থাৎ স্বদেশ প্রেমের প্রকাশের ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদী মনোভাবের প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনই এই ধরনের স্বদেশপ্রেমকে প্রশয় দেননি বা সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীকে কখনই বাহুযুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেননি। আলোচ্য 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিতে তিনি ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্য থেকেই এক নব মানবশক্তির আদর্শ উদ্ভূত হয়ে সেই সংকটের সমাধান করবে বলে তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন তিনি যেমন এক নতুন শিল্পীর আগমন প্রত্যাশা করেছিলেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও তেমনি।

২.৬ সারাংশ (প্রথম অংশ)

জীবনের প্রথম দিকে, ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তাঁর সেই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের মহৎ ও উদার সাহিত্য যেমন তাঁদের জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়েছিল, তেমনি ইংরেজের জাতীয়চরিত্রও তাঁদের কাছে সভ্যতার আদর্শ হয়ে উঠেছিল। এমনকি, ভারতীয় সদাচার-লোকাচারও তাঁরা এ কারণে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ক্রমে ইংরেজের মধ্যে এসে পড়ল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ভারতবর্ষের প্রতি উপেক্ষা, প্রশাসনের ক্ষেত্রে এল পীড়ন। ভারতবর্ষের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য—কোন বিষয়েই ইংরেজ কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ, রাশিয়ায় দেখা গেছে, অঙ্গ অঞ্চলগুলি সম্পর্কে প্রশাসকগণের সহযোগিতার মনোভাব। তাই সেখানে এসেছে উন্নতি, মানবিকতার বোধের প্রসার এবং অসাম্প্রদায়িকতার মনোরম দিক। য়ুরোপীয় প্রশাসকগণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। পারসিক এবং জরথুস্ট্রিয়ানদের মধ্যে উন্নতির সূচনা তখনই হয়েছে, যখন তাঁরা য়ুরোপীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েছে। যে যন্ত্রচালনার চর্চার ফলে ইংরেজ তখন বিশ্ব কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল, ভারতবাসী ছিল যে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত; জাপান সেই যন্ত্রচালনার চর্চার ফলেই তখন খুব দ্রুত উন্নতি অর্জন করে ফেলেছিল। আফগানিস্তানের মধ্যে যে শিক্ষা ও সমাজনীতির অগ্রগতির সূত্রপাত হচ্ছিল তার মূল কারণ—কোন য়ুরোপীয় জাতি কখনও তাদের পরাভূত করতে পারেনি। অর্থাৎ যেখানেই তথা য়ুরোপীয় ও ব্রিটিশ শাসন উপস্থিত ছিল, সেখানেই দেখা গেছে—সে দেশ অনগ্রসর হয়েই আছে। ভারতবর্ষও তাই। যে ইংরেজকে লেখক তাঁর প্রথম জীবনে এক সভ্যজাতি বলে বিশ্বাস করেছেন, তারাই যে মানবতা ও সভ্যতার আদর্শকে এমন বিকৃত করে ফেলতে পারে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেটা বিশ্বাস করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছিল।

২.৭ 'সভ্যতার সংকট'—মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। সৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে

এসেছি তখন দেখলুম উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কিরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময় এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয়নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order. বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহাদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে অ্যাণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রিস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোর্তিময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্রঅকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাইনি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমাদের বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের

এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশের ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভাবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রত্যপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্মান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।।

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন
১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে লেখকের বিসেষ চেতনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে লেখক ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি বিচার করেছেন, —একটি তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ এখানে ক্রিয়াশীল। গোটা য়ুরোপের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার কথা বললেও

লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল, ইংরেজের শাসনব্যবস্থার কুফল পর্যবেক্ষণ করা। প্রবন্ধের এই অংশে লেখকের দৃষ্টিকোণও খুব বাস্তব ও আধুনিক। যন্ত্রচালনার শিক্ষা এবং তজ্জাত অর্থনৈতিক মুক্তি ও অগ্রগতিকেই তিনি এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমকালীন বিশ্ব ও সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে তবেই তিনি এ প্রবন্ধ রচনার হস্তক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধে লেখা যায়, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অনগ্রগতির জন্য তিনি ভারতবাসীকেই দায়ী করেছেন; নানা সামাজিক কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা জাতি-বর্ণভেদ, প্রভৃতি। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাঁর দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত। এখানে ভারতের জাতীয় জীবনের অনগ্রসরতার কারণ রূপে ইংরেজের অপসাশনকেই তিনি দায়ী করেছেন। মূল কারণ হল, ইংরেজের প্রতি লেখকের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা। একদিন ইংরেজের প্রতি তাঁর এবং সমকালের ভারতবাসীর বিশ্বাস ছিল : ইংরেজ তার মানবিক ঔদার্যের কারণেই ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করবে; ভারতবাসীর জাতীয় কর্ম তাই সেই স্বাধীনতার রূপায়ণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। এই জন্যেই ইংরেজের শাসনব্যবস্থার চেয়ে ভারতবাসীর জাতীয় প্রস্তুতিকে রবীন্দ্রনাথ তখন বড়ো করে দেখেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইংরেজ সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ ঘটেছে, তাঁর বিশ্বাস 'দেউলিয়া' হয়ে গেছে। এই জন্যে ভারতবর্ষের জাতীয় অনগ্রসরতার কারণ রূপে তিনি অপশাসনকেই দায়ী করেছেন।

ভারতের এবং পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ও অনুন্নত দেশের সমস্যার সমাধানকারী রূপে রবীন্দ্রনাথ এক মহামানবের আগমনের প্রত্যাশা করেছেন। এই প্রত্যাশা মধ্যে তিনি যত না প্রাবন্ধিক, তার চেয়ে বেশি একজন কবি। এখানেই প্রবন্ধটি রচনাগত দিক থেকে দ্বিতীয় আর একটি মাত্রা অর্জন করেছে। অবশ্য কবি রূপে, এর কিছু পূর্ব থেকেই যেমন নতুন এক শিল্পীর পদধ্বনি তিনি শুনেছিলেন, এখানে সেই নতুন শিল্পীরই আর একরূপ যেন রাজনৈতিক নেতা, কিংবা কোনো 'মহামানব'। ইনি কেবল ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষকেই উদ্ধার করবেন না, সকল দেশের নিপীড়িত মানুষকেই উদ্ধার করবেন। কাজেই ইনি কেবল সংকীর্ণ অর্থে বিশেষ এক দেশের উদ্ধারকর্তা নন—মানবমাত্রেরই উদ্ধারকারী। সেই দিক থেকে বিচার করলে এই 'মহামানবে'র আইডিয়ারির একটি ব্যাপকতা আছে। মনে হয়, 'Super man'-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে তিনি পদটিকেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 'মহামানব' বলতে তিনি আরো অতিরিক্ত কিছুকে বুঝিয়েছেন।

কিন্তু এই 'মহামানব' কোনো ব্যক্তি বিশেষ নন, তিনি যেন একটি নৈর্ব্যক্তিক comcept। তাই তিনি যুগের প্রয়োজনে, ইতিহাসেক ধারাপথ বেয়ে, এক শক্তি রূপে আবির্ভূত হন। গীতার কল্পনার সঙ্গে এ বিষয়ে রবীন্দ্রকল্পনার কিছু পার্থক্য আছে। গীতায় বলা হয়েছে, সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য, দুষ্কৃতদের বিনাশ করবার জন্য, দেশে যখন নানা গ্লানি দেখা দেবে, শ্রীকৃষ্ণ তখন, যুগে যুগে সম্ভাবিত হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহামানবের কল্পনা কিছু ভিন্ন। যদিও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন প্রাচ্য দেশ থেকেই এই মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে, তথাপি তিনি যেন নিখিল বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত এক সত্তা; তাঁর কোনো নির্দিষ্ট দেশের বন্ধন নেই, এমনকি, তিনি নিজে একক কোনো সত্তা নন; নব চিন্তায় উদ্বোধিত এক নির্বিষে, মানব শক্তির সংকেত তিনি। কাজেই তাঁর আগমনের জন্য একদিকে সুরলোকে ধ্বনিত হয় মঙ্গল শঙ্খ; অপরদিকে মর্ত্যলোকের ঘাসে ঘাসে তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়। তাঁর অস্তিত্ব তাই আভুমিনতো, তিনি অণুর চেয়ে অণু, মহতের চেয়েও মহীয়ান। এই জন্যেই শেষে সংযোজিত গানটির মধ্যে 'মানব-অভ্যুদয়ে'র কথা আছে, কোন বিশিষ্ট ও একক মানুষের কথা নয়।

যদি 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটির শেষাংশ তিনি প্রসঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ের বক্তব্যের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ দেখা যায়। 'কালান্তরে' তিনি একটি সম্মিলিত মানবশক্তির আবির্ভাবের দিকটিকেই যেন মুখ্য বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। আর 'সভ্যতার সংকটে' একক একজনের কথা

বলেও সেই সম্মিলিত মানবশক্তির কথাই যেন ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই দুই চিন্তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যিনি একক, তিনিই সম্মিলিত মানবসত্তা। এই একক ও সম্মিলিত মানবশক্তিই কবির কল্পিত এক 'মহামানব'—জীবনের প্রথম দিকে রচিত গানে (জন-গণ-মন-অধিনায়ক...' ইত্যাদি পূর্ণ গানটিতে) যাঁকে তিনি বলেছেন, 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থার' ঐতিহাসিক পথে তিনি সারথি ('হে চিরসারথি...),—'যুগযুগধাবিত' যাত্রাপথের সকল বিপদের তিনিই 'সংকট দুঃখ ত্রাতা'। 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রসঙ্গে এই 'সংকট' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২.৯ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

য়ুরোপ তথা ইংরেজের অপশাসন ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বিশ্বের অনেক দেশেই তখন জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছে। ফলে যেসব দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির সূচনা হয়েছে। কিন্তু ভারত অনগ্রসরই থেকে গেছে। এক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিজেদের দোষ অপেক্ষা ইংরেজে কূট-রাষ্ট্রনীতিকেই লেখক দায়ী করেছেন। ইংরেজের নৃশংস কূটশাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের এক বিরাট ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতি ভারতের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষতি নয়। ইংরেজ ভারতবাসীর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির। অবশ্য, ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে শাসন ক্ষেত্রে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা। কিন্তু লেখকের মতে, ভারতীয় জাতীয় জীবনে তার মূল্য সামান্যই। জাপান কোনো য়ুরোপীয় জাতিদ্বারা পরাভূত নয় বলেই সে দেশ তখন উন্নত ও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ যেখানে ইংরেজের বর্বর শাসনদ্বারা জর্জরিত। একারণেই ভারতবর্ষের অগ্রগতির সূচনা হয়নি। কেবল ইংরেজই নয়, গোটা য়ুরোপই তখন মানবপীড়নে মেতে উঠেছিল এবং বিশ্বের মানবের সমগ্র সভ্যতার ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। লেখকের আশা, এই সংকটকালে প্রাচ্য দেশ থেকেই এক মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে। কেবল ভারতবর্ষকেই নয়, বিশ্বের সমগ্র পীড়িত মানবজাতিকেই তিনি ত্রাণ ও উদ্ধার করবেন। ইংরেজের সাম্রাজ্য একদিন ভেঙে যাবে, কারণ—অধর্মের দ্বারা যে প্রাপ্তি, একদিন তার বিনাশ ঘটবেই। সেই মহামানব এক নবজীবনের আশ্বাস নিয়ে আসবেন, —তাঁর জয়গানে আজ দশদিক মুখরিত।

২.১০ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পাঠ

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র মনীষার সংহত ও পরিপূর্ণ প্রকাশ। পরাধীন ভারতবাসী হিসাবে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শাসক ইংরেজের নানা ক্ষুদ্র রূপ। প্রায় এক শতাব্দী ধরে তিনি ব্রিটিশ শাসনের ভাল মন্দ প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। এর শুভ দিকগুলি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করেছেন আজীবন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনের অতি স্বার্থপর ভূমিকায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে প্রতিবাদ জানালেন। 'সভ্যতার সংকট' এবং 'কালান্তর' তারই উদাহরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সমগ্র পৃথিবীকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতবর্ষ ইংরেজ উপনিবেশ হিসেবে বিপুলভাবে সহায়তা করে। যদিও যুদ্ধের মধ্যপর্বে, কংগ্রেস নেতৃবর্গ এর বদলে স্বাধীনতার দাবি জোরদার করে তোলেন। ১৯৪২-এ শুরু হয় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ব্রিটিশ রাজের দমননীতির ফলস্বরূপ প্রায় ৬০০০০ নেতা-কর্মী-সাধারণ মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এরই মধ্যে নানা নৈরাজ্যমূলক কাজ শুরু হল। সংহিস আন্দোলন মাথা চাড়া দিল এবং ইংরেজের অত্যাচার বৃদ্ধি পেল। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র চিত্র প্রত্যক্ষ করেন নি। কিন্তু তার প্রথমাংশেই ব্রিটিশের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণকে যথার্থই নিন্দাজনক বলে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

চলিত ভাষায় লেখা তীব্র আবেগ ও বিশ্লেষণমূলক রচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ইংরেজ জাতির মাধ্যমেই বাঙালি আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এডমন্ড বার্ক বা লর্ড মেকলের অসামান্য বাগ্মিতা। শেকসপিয়ার, লর্ড বায়রণ ও অন্যান্য ইংরাজি সাহিত্য তৈরি করেছিল ইংরেজি ভাষার সুদৃঢ় ভিত্তি। এছাড়াও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা ক্রমশ ইংরেজদের কর্তব্যবোধ, সম্মান এবং ঔদার্যের পরিচয় লাভ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের শিক্ষনীয় গুণাবলী ও মর্যাদাবোধের ধারণা ভারতীয়দের পক্ষে অনুসরণযোগ্য। তিনি আরো জানিয়েছেন, অতীতে ইংলন্ড বহুবার বিপন্ন দেশ ও জাতির ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে। শাসক শ্রেণির স্বাভাবিক কর্তৃত্ব থাকলেও, ইংরেজ জাতিই ব্যক্তি ও সমাজের সংকীর্ণতা জয় করার পক্ষে প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা তখনও তাঁদের আভ্যন্তরীন গুণাবলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই ভারতীয়রা তাঁদের সংস্পর্শে উপকৃত হয়েছিলেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতা' শব্দটি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন সভ্যতা মানে সদাচার। এর দ্বারা যে কোনে সমাজে, ক্রমশ নানা সামাজিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা ও লালন করে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অর্থহীন আচারে পরিণত হয়। ভারতবর্ষেও এই আচারশৃঙ্খল সমাজকে ক্রমশ জড় পদার্থে পরিণত করেছিল। এই পর্বে ইংরেজের সান্নিধ্য আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুরবাড়ি ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে এইসব নব্য আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। প্রাচীন নিয়মনিষ্ঠার বদলে যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটল। বাঙালি জাতি তথা ভারতীয়রা নব্য চিন্তা, প্রগতি ও উন্নত জীবনবোধের লক্ষ্যে অগ্রসর হল।

কিন্তু এই ভাবনাস্রোত থেকে লেখক ভিন্ন উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। তিনি দেখেছেন, শাসক ইংরেজ, শাসিত/পরাধীন ভারতীয়কে কী ধরনের অসম্মান ও অবমাননার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পীড়ন করে চলেছে। সেই উন্নত চিন্তার পতন ঘটেছে, সভ্যতার সুফলগুলি ভারতীয়দের জন্য উৎসারিত হচ্ছে না। তুলনা করে লেখক দেখিয়েছেন জাপান যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে, রাশিয়া জনকল্যাণমূলক কর্মের দ্বারা জনগণকে সুস্থ ও উপযুক্ত জীবনযাপনের সুযোগ দিচ্ছে। ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতিগত বিভাজনের প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা কেবল দেশের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত প্রাণ। পারস্যে ধর্মের বিভেদ মুছে গেছে — মুসলমান ও জরথুস্টিয়ান, উভয়ে মিলে দেশের জন্য পরিশ্রম করছে। বাইরের অপশাসন থেকে নিজেদের যুক্ত করেছে তারা।

কিন্তু ভারতবর্ষ এ হেন মুক্তি সাধনে নিযুক্ত হতে পারেনি, ইংরেজের হীন স্বার্থবোধের জন্য। শুধু এদেশে নয়; চীন, স্পেন ও অন্যত্র ও ইংরেজের আগ্রাসন নীতির প্রকাশ ঘটেছে। সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারের লোভ তাঁদের মানবমুখিন কল্যাণবোধকে লুপ্ত করে দিয়েছে বলে লেখক মনে করেন।

ভারতের জনসাধারণ অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত। অনেকের বিচারে, ভারতীয়দের চারিত্রিক ত্রুটির কারণেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন, প্রশাসকরা কৌশলে, গোপনে, নানা কূটনীতির মাধ্যমে দেশের অবনতি কায়েম রেখেছেন। এই কাজ নীচাশয়, কুটিল জাতির পক্ষেই করা সম্ভব — ইংরেজের এই পরিচয় নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন লেখক। 'Law and Order' নামে শাসন চলছে নির্বিচার।

প্রবন্ধের শেষাংশে উন্নত ইংরেজদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এনড্রুজ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধুতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই বন্ধুতা তাঁর পক্ষে সম্পদস্বরূপ। এই জাতীয় মানুষের অস্তিত্ব, ইংরেজ ও ইওরোপীয়দের অখ্যাতিকে কিঞ্চিৎ কমিয়ে দিয়েছে।

শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উপলব্ধি উন্মুক্ত করেছে অপূর্ব ভাষায়। আশা করেছেন একদিন ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু ইংরেজের চক্রান্তে সেই দেশ হবে নিস্ফলা, কলহপর, ব্যর্থ এক রাষ্ট্র। যদিও শেষাবধি এক মহামানবের আবির্ভাবের আশায় লেখক উদ্দীপ্ত। ভারতবর্ষ একদিন স্বমহিমা ও শক্তি নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। আজকের অপমানকে পরাভূত করে সম্মান অর্জন করবে মর্যাদা ফিরে পাবে। সে পর্যন্ত ধৈর্য্য, মনোবল শক্তি রক্ষা করতে হবে — কারণ কোন ভাবেই মনুষ্যত্বকে অবনমিত হতে দেওয়া যায় না। প্রবল প্রতাপ, অহংকার ও দম্ভ নিয়ে যে ইংরেজ নিজেদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রা বলে মনে করছে, একদিন তাঁরাও নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও দর্প হারিয়ে অপরের কাছে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হবে। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭৪ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ যেন উচ্চারণ করেছেন তাঁর অভিশাপ—

'অধর্মের দ্বারা শত্রুজয়, বৃদ্ধি প্রাপ্তি ও অভীষ্ট লাভ ঘটলেও শেষাবধি অধর্মকর্তা সমূলে ধ্বংস হয়।'

২.১১ প্রবন্ধে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও টীকা

১. **শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) :** বিশিষ্ট ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। কমেডি, ট্রাজেডি ও সনেট রচনার জন্য সারা বিশ্বে আদৃত। হ্যামলেট ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লিয়ার প্রভৃতি ট্রাজেডি নাটক বিশ্ব সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। মার্চেন্ট অফ ভেনিস, কমেডি অফ এররস্। এ মিডসামার নাইটস ড্রিম, টুয়েলফ্‌ত নাইট প্রভৃতি কমেডি নাটক পরবর্তী নাট্যকারদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। শতাধিক সনেট রচনা করে তিনি এ বিষয়েও পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও, তিনি নিজে নির্মাণ করেছেন মানব চরিত্রের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রগুলি। আধুনিক মানুষের সংকট প্রায়শই শেকস্‌পিয়ারের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যিক হয়ে এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ইংরাজী ভাষার লালিত্য ও ঐশ্বর্য দুই-ই তাঁর রচনায় দীপ্যমান। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ হয়েছে।

২. **বায়রণ (১৭৮৮-১৮২৪) :** জর্ড গর্ডন বায়রণ, বিশিষ্ট ইংরেজ কবি এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তি। সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম কারিগর বায়রণ ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। হাউস অফ লর্ডস-এর সদস্য বায়রণ গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। ডন জুয়ান, ম্যানফ্রেড, চাইল্ড হ্যারল্ড পিলগ্রিমেজ, প্রভৃতি কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

৩. **এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) :** ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এর সদস্য, দার্শনিক বার্ক তাঁর রচনা ও বাগ্মীতার জন্য বিখ্যাত। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিকে তিনি যথেষ্ট সমালোচনা করেন। ভারতে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার বার্ক, হেস্টিংসকে বিশেষভাবে দায়ী করেন। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যকে হেস্টিংস কীভাবে আইনসিদ্ধ করে তুলছেন তা প্রমাণ করেন বার্ক। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, অন্যান্য দেশীয় রাজার সম্পত্তি দখল প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক কাজের দ্বারা হেস্টিংস কোম্পানীর সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এই অভিযোগ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁকে গভর্নর জেনারেল পদ থেকে অপসৃত করে এবং দীর্ঘকাল বিচারচলে। হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়ার পিছনে সভ্য ও নীতিনিষ্ঠ মানসিকতার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই জন্যই এডমন্ড বার্ককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

৪. **লর্ড মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) :** টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ছিলেন ইতিহাসবেত্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ভারতের ইতিহাসে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৮৩৫ সালে রচিত মেকলে'র 'মিনিট' এর উপর গুরুত্ব দিয়ে ভারতীয় শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হয়। সংস্কৃত ও আরবি ফার্সির পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, নীতিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হল। দেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার জন্য ব্রিটিশ সরকার উৎসাহী হলেও, রামমোহন রায় ১৮২৮ সাল থেকে এর বিরোধিতা করেন। মেকলের সুচিন্তিত সুলিখিত 'মিনিট' সেই মতই সমর্থন করেছে। ভারত আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হোক — এই-ই ছিল মেকলের অভিমত। এই নীতির দ্বারা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত হবে, ভারতীয় কেরানীকুল তৈরি হবে — এই সমালোচনা আংশিক সত্য হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয়দের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এ কারণেই 'মেকলে'র নাম স্মরণীয়।

৫. **জন ব্রাইট (১৮৬১-১৮৮৯) :** ব্রিটিশ হাউস অফ কমনস-এর সদস্য, সুবক্তা, যুক্তিবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্রাইট সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। 'কোয়েকার' নামক খ্রিস্টান, মানবাদিকার রক্ষায় উদ্যোগী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য 'ব্রাইট, সর্বদাই সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার, ব্যবসা বাণিজ্য ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিলেতবাস কালে ব্রাইট-এর বক্তৃতায় মানবকল্যাণমূলক চিন্তার প্রকাশ দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

২.১২ সাধারণ আলোচনা

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সাহিত্যই তাঁর যাবতীয় প্রত্যয়, জীবনবোধ বা অভিমত ধারণ করে রেখেছে। সারা জীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অভিঘাতে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশের শিক্ষা, নৈতিকতা, মানবিকতার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। বাঙালি তথা ভারতীয়দের মনোবিকাশে ইংরেজের ভূমিকা অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করেও জানিয়েছেন — এই গুণাবলী ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেছে ব্রিটিশ শাসকের চরিত্র থেকেই। তাঁদের দম্ভ, পীড়ন ও অবহেলা ভারতীয়দের ক্রমশ দিশাহারা করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। রাশিয়া তার অধীনস্থ ভূখণ্ডগুলির উন্নতিসাধনে কোন পক্ষপাতিত্ব করেনি। এর ফলে রাশিয়াই লাভবান হয়েছে। পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসক তার মূল ভূখণ্ড এবং উপনিবেশের মধ্যে যে পার্থক্য বজায় রেখেছে, তাতে ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইংলন্ডেরও প্রকৃত উপকার হয়নি। শোষণমূলক নীতির দ্বারা তাৎক্ষণিক লাভ হয়েছে, অহং চরিতার্থ হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিক উন্নতি হয়নি। প্রবন্ধের শেষ পর্বে তিনি অন্তরের বেদনা ও হতাশার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক চার্লস এন্ড্রুজের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, সব ইংরেজই একজাতীয় মানুষ নন। 'বড়ো' এবং মানবিক গুণাবলীর অধিকারী এন্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্যতম সম্পদ রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এন্ড্রুজ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। নানাভাবে তিনি সহায়তা করেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট হৃদ্য সম্পর্ক ছিল।

যাই-হোক, শেষাংশে তিনি ইওরোপীয় তথা ইংরেজ 'সভ্যতা'কে দ্বিধাহীন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছেন, 'মানবপীড়নের মহামারী' যে সভ্যতার রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে তাদের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।

বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে লেখক জানিয়েছেন, ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে। তিনি আশা করেছেন

মানব সভ্যতার উদ্ধার কল্পে মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে প্রাচ্যদেশ থেকেই। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭৪ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধার করে লেখক বলতে চেয়েছেন— 'অধর্মের দ্বারা শত্রুদের জয় ও অভীষ্ট লাভ সম্ভব হলেও অধর্মকারী শেষ পর্যন্ত সমূলে বিনষ্ট হয়।'

২.১৩ প্রবন্ধটির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে কৈশোরকাল থেকেই। ১৮৭৫ সালে হিন্দুমেলার জন্য লেখা গানে ১৫ বছরের কবি বলেছিলেন একদল লোক ব্রিটিশের জয়গান করলেও তিনি ভিন্ন তানেই গান গাইবেন। পরবর্তী লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম', 'সমস্যা', 'পথ ও পাথেয়', 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভাবনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন লেখক। এই পর্বে ইংরেজের তুলনায় স্বদেশবাসীকে অধিক সমালোচনা করেছেন। যদিও পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার প্রতি ধারাবাহিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে 'কণ্ঠবোধ', 'দয়ালু মাংসাশী', 'জুতা ব্যবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে। বিশ্বকবির উদারনৈতিক মনন একদিকে উদ্দীপ্ত হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঔদার্য সন্ধানে, অন্যদিকে আশা রেখেছেন প্রাচ্যের ঐশ্বর্য বিতরণে। সব পর্বেই তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে সদর্থক ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন — যার সহায়তায় একটি দেশ সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথের এই আশা পূরণ হয়নি — তারই তিক্ত ও বেদনাদীর্ণ প্রকাশ 'সভ্যতার সংকট'।

মৃত্যুর চারমাস আগে লেখা প্রবন্ধটির মধ্যে একজন আধুনিক চিন্তাবিদ ও প্রাচীন ঋষিকল্প মনীষার মিলন ঘটেছে। 'সভ্যতা' শব্দটিকে সদাচার হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও ধীরে ধীরে তিনি প্রকাশ করেছেন 'পাশ্চাত্য সভ্যতা'র প্রকৃত রূপ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন পাশ্চাত্য দেশের আগ্রাসন মানবতা বিরোধী, তাই তাঁদের সভ্যতা সংক্রান্ত অহঙ্কার সম্পূর্ণ অর্থহীন।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় বুয়র যুদ্ধের প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার হিংস্র রূপের কথা। নিজের দেশেও মানবাত্মার লাঞ্ছনা দেখে তাঁর ধৈর্য বাঁধ ভেঙ্গেছে। রাশিয়া বা জাপানের সঙ্গে তুলনা করে হতাশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ কথিত পারস্য, জাপান, আফগানিস্থান — সম্প্রীতির বাতাবরণ সাময়িক ভাবে তৈরি করলেও — বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। দুর্বলের প্রতি সবলের শোষণ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস — মানবজাতির চিরকালীন ইতিহাস।

প্রবন্ধটির ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ অতুলনীয়। কী দুঃসহ বেদনা এবং যন্ত্রণা সহন করে তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার প্রমাণ আছে ছত্রে ছত্রে। 'আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে'। কিংবা'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি — 'পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম' অথবা 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' — প্রভৃতি উচ্চারণ পাঠকের মর্মে আঘাত করে। ভারতের অপমান ও লাঞ্ছনায় বিদীর্ণ হয়ে গেছেন — এ সত্য গ্রহণ করা সুকঠিন।

কিন্তু এই বেদনা বা পরাজয় কেবল ভারতবাসী বা বাঙালির নয় — সমগ্র বিশ্ববাসীর। সভ্যতার ক্ষয় হচ্ছে অত্যাচারে শোষণে — সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। তাই এ ক্ষতি বিশ্বের, এ সংকট সমগ্র মানবসভ্যতার। দর্প, দম্ভ, ক্ষমতা একদিন বিলীন হবে কালচক্রে। কল্যাণমুখী কাজ টিকে থাকে স্মরণে শ্রদ্ধায়, মানববিরোধী কর্ম, সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি করলেও, তৈরি করে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। রবীন্দ্রনাথ সেই সতর্কতাই দিতে চেয়েছেন সমগ্র বিশ্বকে। যে আক্ষেপ, গ্লানি এবং অবমাননা তাঁকে গভীর আঘাত করেছে, তা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। কিন্তু সমষ্টির

অপমান ও পরজায় আরো বেশি আঘাত করেছে অশীতিপর, বিশ্ববরেণ্য এই মানুষটিকে। পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধে বলেছিলেন, খাদ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতা কীভাবে ভারতীয়দের সংকীর্ণ জীবনযাপনে বেঁধে রেখেছে। এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ক্রমাগত লাঞ্ছনা, তাচ্ছিল্য, অবহেলা কীভাবে জাতির আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে। তাঁদের বাধ্য করে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, হীনমন্য হয়ে বাঁচতে। মনুসংহিতার শ্লোক প্রায় অভিশাপের মত উচ্চারিত হয়েছে শেষাংশে। মহামানব আসার মন্ত্রে আবার জেগে উঠেছে ইতিবাচক মনোাব। এই গ্লানিময় পৃথিবীকে তিনি যে অবস্থায় ত্যাগ করছেন — তা সেই অবস্থায় থাকবে না। কোনো মহামানবের আগমনে তা নিষ্কলুষ হবে। রবীন্দ্র-দর্শন সর্বদাই অস্তিবাদী। তাই, সংকট থাকলেও সংকট জয় করার মহামন্ত্রেই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে।

২.১৪ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১। আলোচ্য প্রবন্ধটি কী উপলক্ষে এবং কবে লিখিত হয়েছিল? প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোথায়?

২। আলোচ্য প্রবন্ধটির পটভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৩। প্রাবন্ধিকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কবির রোমাণ্টিক কল্পনা কী রূপ ধরে এখানে প্রসাশিত?

৪। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ভারতে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইংরেজের ভূমিকা কী ছিল? রাশিয়াকে এ বিষয়ে কোন্ নীতি অবলম্বিত হয়েছিল?

৫। যন্ত্রচালনার শিক্ষা জাপানে কী ফল ফলিয়েছিল? এ বিষয়ে শাসিত ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করুন?

৬। তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের অনুন্নতির কারণ কী?

৭। 'সভ্যতার সংকট'—প্রবন্ধের এই শিরোনামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৮। 'মহামানবে'র কর্তব্যভূমি কেন সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান?

নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনা করুন :

১। ইংরেজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে শেষ জীবনের বিশ্বাসের তুলনা করুন।

২। প্রবন্ধটির উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য কী?

৩। 'সভ্যতার সংকট' এবং 'কালান্তর' প্রবন্ধ দুটির ভাবগত সাদৃশ্যের ওপর আলোকপাত করুন।

৪। রবীন্দ্রনাথের 'মহামানবে'-র ধারণাটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

৫। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিতে যেভাবে প্রাবন্ধিক এবং কবির সম্মিলন ঘটেছে, তা আলোচনা করে দেখান।

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'রবীন্দ্রজীবনী' : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কালান্তর'।

৩। অধীর দে : 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা'।

৪। 'রবীন্দ্রপ্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার'—মুহম্মদ হাবিবুর রহমান।

একক : ৩ ❑ নিয়মের রাজত্ব : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ রামেন্দ্রসুন্দর : জীবনকথা

৩.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

৩.৫ প্রাথমিক পরিচয়

৩.৬ প্রবন্ধের মূল বিষয় ও তথ্যাদি

৩.৭ 'নিয়মের রাজত্ব'—মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

৩.৮ সারাংশ (প্রথম অংশ)

৩.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (প্রথম অংশ)

৩.১০ 'নিয়মের রাজত্ব'—মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

৩.১১ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

৩.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় অংশ)

৩.১৩ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রসঙ্গের টীকা

৩.১৪ সাধারণ আলোচনা

৩.১৫ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

৩.১৬ অনুশীলনী

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

- তাঁর গদ্যরীতির বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে জানতে পারবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনে যে রেনেসাঁস দেখা দেয়, তার ফল রূপে রস-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বাঙালি আপনাকে বিস্তৃত করতে আগ্রহী-উৎসাহী হয়। নানা সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাদিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি না লিখে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব লেখকের অন্যতম। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং

শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা নির্মাণে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালির জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়—যাতে সাধারণ বাঙালি সে সব রচনাদি পড়ে সচেতন হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি দার্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষায় চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে তিনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্তবাদও তাঁর আলোচ্য দিক। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মিশ্রণসাধন তাঁর একটি বড়ো অবদান। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়েই সাহিত্য বা প্রাত্যহিক জীবনে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটিকে হৃদয় ও প্রাঞ্জল করে তুলতেন। তাঁর গদ্যও বিশেষত্বপূর্ণ। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং সে কারণেই এটি বহুপঠিত।

৩.৩ রামেন্দ্রসুন্দর : জীবনকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১২৭১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৮৬৪—১৩২৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৯) পূর্বপুরুষ বুন্দেলখণ্ড থেকে বঙ্গদেশের ফতেপুরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের কাছে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কর্ম ও বিবাহসূত্রে এঁরা জেমো (কান্দি) রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে প্রথম হন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৮৮৭-তে তিনি বিজ্ঞানে এম.এ. (তখন এম.এস.সি. চালু হয়নি) পাশ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন,—আমৃত্যু সেই পদেই কর্ম করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বলতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ দীর্ঘদিনের নানাভাবে। তাঁর দুই কন্যা—চঞ্চলা ও গিরিজা।

রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছেন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের সহযোগীরূপে পান। বি.এ. পড়বার সময়েই 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে) তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যদিও তা বেনামীতে। তিনি ছিলেন স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগী, আদর্শনিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হন। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসার কারণ হয়েছে অপরদিকে কেউ কেউ সে বিষয়ে সপ্রশংস হতে পারেনি। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের সমন্বয়কে প্রশংসা চোখে দেখেননি। নিজে বিজ্ঞানী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আশা করেছিলেন। আসলে এ বিষয়ে যাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থক তাঁরা অন্য কথা বলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর কোনো মৌলিক গবেষণা না করে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের আলোকে তিনি বিজ্ঞানের 'ফাঁকি' ধরে ফেলেছিলেন, এতেই তারা উল্লসিত হতেন।

মানুষ হিসেবে শিক্ষক হিসেবে একটি কলেজের প্রশাসক হিসেবে, আদর্শ একজন গৃহীরূপে, স্বদেশসেবক রূপে, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের যে প্রমাণ-পরিচয় মেলে, তা খুবই প্রীতিপ্রদ। শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়টি

বাংলা ইংরেজি—দু'ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকসত্তা তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে অতি-কথন দোষ আবিষ্কার করেছিলেন, মনে হয়, শিক্ষকরূপে পাঠকদের বোঝাতে গিয়েই সেটি ঘটেছে।

রাত জেগে পড়াশোনা করতেন তিনি। এর ফলে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যকৃতের পীড়া এবং মস্তিষ্কের রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুশোকে তিনি মানসিক দিকে থেকে বিশেষ আহন হন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর বেশি পরিমাণে রচনাদি লিখে যেতে পারেননি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন নব্য-ডারউইনবাদ এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতাকে পরিত্যাগ করে এক দার্শনিক অনুভবের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে তিনি নিজে আর লিখতে পারতেন না, তাঁর বক্তব্য লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই কথন ছিল বিচিত্র প্রসঙ্গকে ঘিরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি এই : 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬)। 'মায়াপুরী' (১৯১১), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), মৃত্যুর পর প্রকাশিত—'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ গ্রন্থের নামে 'কথা' শব্দটি আছে। এটি অকারণে নয়। তাঁর বক্তব্যকে দুরূহ প্রবন্ধের ভঙ্গিতে প্রকাশ না করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার ভঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানা যায়। যেহেতু তিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সেইহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানেক দিক থেকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন। বিভিন্ন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রে (যথাঃ 'প্রদীপ', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'সাহিত্য ভারতী', 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী') তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনের তত্ত্বকে যাঁরা বিস্তৃত করে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—টমাস হেনরি হাক্সলি। হার্বার্ট স্পেনসারের Synthetic Philosophy অর্থাৎ সমন্বয়ী দর্শনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। এই সমন্বয়মূলক দর্শনকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, হিন্দু, খ্রিস্টানের ধর্মচিন্তা, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে সম্মিলন—ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। 'চরিত কথা' গ্রন্থে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলস হোলৎজ এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রিপণ কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মী ছিলেন এবং এঁর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর নিজের গভীরতম চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি, তথাপি প্রমথনাথ তাঁকে 'বিজ্ঞানের ঋষি' আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মন্তব্য : "যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানের কবি; রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না।" বিজ্ঞানের এই স্বরূপ যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তিনিই বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন।

বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা নতুন নিয়ম কালকের গবেষণায় তা মিথ্যে বলে প্রায়ই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যেও পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব একটি স্থায়ী সত্যকে আবিষ্কার করেছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা যা পারেনি। এইখানেই বিজ্ঞানবিদ্যা (বা অপরাবিদ্যা)-র ওপর পরবিদ্যা বা দর্শনের জিত। রামেন্দ্রসুন্দর শেষপর্যন্ত তাই বিজ্ঞানের ওপর দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে তিনি বিজ্ঞানের জগৎকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ক্রমিক উন্মেষ ঘটতে থাকে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) বইতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে Style বা শৈলীটি তা সাহিত্যের দিক থেকে আজও তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের সাহিত্য থেকে আহৃত রূপ-উপমা-উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করতেন। এতে যেন এক ধরনের কথা শিল্পী সুলভ ভঙ্গি তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। রামায়ণ-মহাভারত, ঈশপের গল্প, কালিদাসের সাহিত্য (আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্বে', 'কুমারসম্ভব' থেকে একটি প্রসঙ্গকে উদাহরণরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন।) বঙ্কিমসাহিত্য (কখনো রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যক্ষ কিংবা তির্যক উল্লেখ), বিবিধ অভারতীয় সাহিত্য, এবং এমনকি সমকালীন নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের কাছে হৃদ্য ও মনোরম করে তুলতেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক William Kingdom Clifford (১৮৪৫-১৮৭৯) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় একটি উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধে কিংবা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব প্রবন্ধে ক্লিফোর্ড-এর সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটির উল্লেখ করে আপন রচনার সুখপাঠ্যতা বৃদ্ধি করেছেন, যদিও ক্লিফোর্ড-এর নাম সেখানে করেননি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য খুব সচল এবং কৌতুকদীপ্ত ছিল।

৩.৫ প্রাথমিক পরিচয়

উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সূত্রে। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর রচনায়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির রচনায় যে যুক্তিশৃঙ্খলা ও জাগতিক প্রয়োজনের প্রাধান্য দেখা যায় — তাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা প্রকাশের নিদর্শন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিশুদ্ধ কবি প্রতিভার সঙ্গে মিলেছিল বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা — 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি তারই দৃষ্টান্ত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) এই পরম্পরার অন্যতম ধারক। অতি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৮৭ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে এম.এ (তৎকালীন ডিগ্রী) পাশ করেন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর — দুটি স্তরেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রিপন কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীকালে অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। বিজ্ঞান তাঁর প্রথম চর্চার বিষয় হলেও ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগ লক্ষণীয়। বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনা, ডারউইনের বিবর্তনবাদের সহজ ব্যাখ্যা, আইনস্টাইনের তত্ত্বের বিশ্লেষণ রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম কৃতিত্ব। কিন্তু এর পাশেই রচনা করেছেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) চরিতকথা (১৯১৩) জাতীয় গ্রন্থ। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অন্যতম হল প্রকৃতি (১৮৯৬)

জিজ্ঞাসা (১৯০৪) বিচিত্র জগৎ (১৯২০) প্রভৃতি। দার্শনিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং সাহিত্যিক উপস্থাপন তাঁর রচনাকে অত্যন্ত উপভোগ্য করেছে। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে বেদান্তের সূত্র সন্ধান করেছেন। এই প্রয়াস তাঁর রচনাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। 'নিয়মের রাজত্ব' রচনাটি 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৩.৬ প্রবন্ধের মূল বিষয় ও তথ্যাদি

'নিয়মের রাজত্ব' নিবন্ধে প্রকৃতির নিয়ম বোঝাবার জন্য, রামেন্দ্রসুন্দর 'মাধ্যাকর্ষণে'র মত অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পৃথিবী সব বস্তুকে আকর্ষণ করে — এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সূত্র। কিন্তু যদি কয়েকটি শর্ত বদলে দেওয়া যায়, তাহলে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দেবে। যদি কোনো বস্তুর অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা হয় তাহলে তা উপরে উঠে যাবে। রচনার এই পর্যায়ে এসে রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিতীয় একটি সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে কোনো পদার্থ স্থাপন করা হলে, পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে তা ঊর্দ্ধগামী বা নিম্নগামী হয়ে থাকে। অর্থাৎ লোহা (পদার্থ) জল বা বায়ুর (মাধ্যম) চেয়ে ভারী, তাই সেখানে তা নিম্নগামী। কিন্তু পারদের (মাধ্যম) মধ্যে লোহা (পদার্থ) স্থাপিত হলে তা ভাসবে। কারণ, লোহা পারদের চেয়ে হালকা।

দ্বিতীয় সূত্রটিকে রামেন্দ্রসুন্দর 'চাপ' নামে অভিহিত করেছেন। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণের জন্য সব বস্তুই টানে আর জল বা বায়ু 'চাপ'। বস্তুকে ঠেলে তোলে। আকর্ষণ এবং চাপ-এর শক্তি সমান হয়ে গেলে বস্তু ওঠেও না, নামেও না। কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্ধৃতি ('ন যযৌ ন তস্থৌ') দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন এক্ষেত্রে বস্তু স্থির হয়ে থাকে।

এভাবে বস্তুর গতিবিধি ব্যাখ্যা করে লেখক তিনটি ধারায় 'আকর্ষণ', 'চাপ' ও 'নিরপেক্ষ' (চাপ ও আকর্ষণ সমান) অবস্থার কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সমগ্র প্রবন্ধে নিয়মের অনিবার্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যতিক্রম বা ব্যাভিচার থাকলে তাও নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই প্রকাশিত হয়, অযৌক্তিক, এলোমেলো ব্যবস্থা বিজ্ঞানের রাজ্যে নেই।

প্রবন্ধের শেষে লেখক জানিয়েছেন প্রাকৃতিক শক্তির সম্যক পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নি। তাই কোনো কোনো ঘটনাকে অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তথ্য ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেই বোঝা যাবে, সমস্ত বিষয়টিই কোনো যুক্তি সম্পন্ন নিয়মের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত প্রবন্ধটির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী অনিন্দনীয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য।

৩.৭ 'নিয়মের রাজত্ব'—মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল্ বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাহারা মিরাকল্ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্তমান অবস্থায় প্রাকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন ...পতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেহ না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেন নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশূট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল উইতে তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতির নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ!

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম :—

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্ধ্বগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদন্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদ মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; উহার ব্যাভিচার চাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষয় সংশয় উৎপাদগনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই

মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত জোর, যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রেই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রেই ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্ধ্বগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের অধিক হইল, এক জন লোক পৃথিবীতে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল-ফলেই ও আতা ফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্যন্ত পৃথিবী মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পার্যদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এত দূরে আছেন; তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বহু দূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক্ দিয়াও একটু ঘুরিয়া চগিলতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখণ্ডের মালা পরিয়া গর্ব্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম,—একটা কাঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন।

এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌরজগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌরজগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক জোড়া বা পৃথিবী সূর্য্য আর এক জোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌরজগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কি না, বলা যায় না। কেন না, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এত দূরে আছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষগোচরও হয় না।

৩.৮ সারাংশ (প্রথম অংশ)

পার্থিব জগতে বা সৌরলোকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নেই। সর্বত্রই নিয়ম। নিয়মের রাজত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মের মূল কারণ—বস্তু ও পদার্থের 'আকর্ষণ' এবং 'চাপ'। আকর্ষণ এবং চাপ-এর নিয়মটিকে তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত, পার্থিব আকর্ষণে রপ্ত মাত্রই নিম্নগামী হয়। এই নিয়মের নাম 'ভৌম আকর্ষণ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ'। দ্বিতীয়ত, তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়। তরল পদার্থ বলতে যেমন—জল, তেল বা পারদ। এইখানে বস্তু বা দ্রব্যের লঘু-গুরুর তারতম্যের দিকটি আছে। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের চেয়ে গুরু কি লঘু, তা দুটি সমান আয়তনের দ্রব্য নিয়ে ওজন করে দেখতে হবে। যেটি ওজনে গুরু, সেটি তরল বা বায়বীয় পদার্থে নিম্নগামী হবে;আর যদি লঘু হয়, তবে ঊর্ধ্বগামী হবে। তৃতীয়ত, আকর্ষণ ও চাপ একই সঙ্গে কাজ করে; আকর্ষণ প্রবল বলে বস্তুকে নামায়; চাপ প্রবল হলে বস্তুকে ওপরের দিকে তোলে। সেখানে আকর্ষণ ও চাপ সমান, বস্তু সেখানে স্থির থাকে।

এই নিয়ম কেবল পার্থিব জগতের পদার্থের ক্ষেত্রেই ঘটে না। স্যার আইজাক নিউটন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—সৌরজগৎও এ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত; আকর্ষণ এখানেও কাজ করছে। পৃথিবীর আকর্ষণে সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর দিকে আসতে চাইছে। পৃথিবীও আবার, সেই আকর্ষণের কারণেই চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে চাইছে। ফলত, সব গ্রহ-উপগ্রহই অপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ধাবমান। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট বটে, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ হল, বিশ্বজগতের এক 'মহা-নিয়ম'। অঙ্ক কষে আগের থেকেই বলে দেওয়া যায়, কবে, কোনদিন, কখন, কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ তার কক্ষ-পথের কোথায় অবস্থান করবে। সৌরজগতে যখন এই রকম নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তন বর্তমান তখন অনুমান করা যায়, সৌরজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, সেখানেও এই ধরনের কোন নিয়ম অনুসৃত হয়। তবে প্রবন্ধ রচনাকালীন সময় পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (প্রথম অংশ)

প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপস্থাপন রীতিটি খুবই হৃদ্য এবং মনোহর। লেখক এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখেছেন। সেই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ যেন একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন আর লেখক তার উত্তর দিয়ে গেছেন। এইভাবেই প্রবন্ধটির কায়া নির্মিত হয়েছে। যেন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গি, যা কথোপকথনেরই প্রসারিত একটি দিক। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রশ্নগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে করা হয়েছে। তার একটি ক্রমও অনুসরণ করা হয়েছে। এক একটি প্রসঙ্গ আসছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং পরবর্তী সূক্ষ্ম স্তরের প্রশ্ন আসছে

এইভাবে সকল থেকে জটিল দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দিকে প্রসঙ্গের প্রবর্তন ঘটেছে। এর ফলে একটি বিশেষতত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আত্তরে ধারণ করা সহজতর হয়েছে। ইচ্ছে কলেই লেখক এখানে এই Style বা শৈলীটি গ্রহণ করেছেন।

প্রবন্ধটির রচনাগত অপর বিশষত্ব হল সমগ্র রচনাটির মধ্যে আইনের রূপক গ্রহণ করা। যেহেতু প্রবন্ধটির নামের মধ্যে 'রাজত্ব' কথাটি আছে, সেই জন্য সেই রাজত্বের আইন-শৃঙ্খলা-নিয়ম অনুসরণের দিকেও আছে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন মান্য করে চলা—এইসব দিকগুলির রূপকময় উল্লেখ আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধটির রচনাগত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লৌকিক ও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে অতি পরিচিত দৃষ্টান্তমালা প্রয়োগ করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করা। অপরদিকে তেমনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে লঘু হাস্যরসাত্মক করে তোলা। এতে পাঠকের সঙ্গে একটি Intimacy বা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে এ-বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. ঈষৎ ব্যাঙ্গাত্মক, তির্যক উক্তি : "কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।"

খ. রসিকতা : "যে দিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।"

গ. কারো গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে 'বেলুনে'র মতো আকাশে উঠতে দেখলে তাকে বলা হবে—সে 'মিথ্যাবাদী' বা পাগল বা বলবে 'লোকটা গুলি খায়' যিনি রসায়ন শাস্ত্র পড়েছেন তিনি হয়তো বললেন : "হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।"

ঘ. "আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুরও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী।" 'গুরু' শব্দটি নিয়ে এখানে Pan বা ঘমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঙ. "রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মতে ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদন্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকেক রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।" এখানে ব্যক্তিকে পদার্থ রূপে কল্পনার মধ্যে রসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. "যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ। এখানে প্রসঙ্গটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বাক্য থেকে গৃহীত। উমা তপস্যারতা ছিলেন, হঠাৎ মহেশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত। উমা অগ্রসর হতেও পারছিলেন না, পেছতেও পারছিলেন না। একই স্থানে স্থির থাকলেন। উমার অবস্থাটি সমান আকর্ষণ ও চাপযুক্ত কোনো পদার্থের মতো।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হল। এই রকম উদাহরণ আলোচ্য অংশেই আরো আছে। বিশেষ করে আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' সম্বোধন করে উক্তিটি। কিংবা শনি, নেপচুন বা ইউরেনাস-এর প্রসঙ্গে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে আলোচ্য অংশটির বিশেষত্ব হল, লেখক তাঁর বক্তব্যকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত

করেছেন। প্রথম স্তরে আছে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে অপার্থিব ও সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ। এইভাবে দুটি স্তরে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করবার ফলে পাঠকের কাছে বিষয়টিও সহজবোধ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সৌরজগৎও যে একটা নিয়মের অধীন লেখক তার নাম দিয়েছেন—মহানিময়'। এটি তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ,—এ ধরনের শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

লেখক পাঠককে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে নিয়ে গেছেন। এ জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধটির কায়া বিন্যাস করেছেন এবং পাঠকের সঙ্গে communication সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন উত্তরের উপস্থাপন রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৩.১০ 'নিয়মের রাজত্ব'—মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে, কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারাগণ এই আইন মানিতেছে না, তাহা হইবে কি হইবে? যদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌরজগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব-জগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন, —জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন-না-কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম; যতদিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা। তখনই ভাষা বদলাইয়া যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা। তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—অহো, এত দিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম;—যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যাভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম,—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যাভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না, নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তর মুখে থাকে না; একটু

হেলিয়া থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লন্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই, না থাকিবারই কথা; ইহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এনমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুই শত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসর একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী ঊষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত, ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিয়া সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে—আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক সোজা পথে না গিয়া আশে-পাশে কিছু দূর পর্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে-কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পুরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একযোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলো সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলো একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও জাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা

তথা, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ-ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি, না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

৩.১১ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

আইজাক নিউটন আবিষ্কৃত বিশ্বজগৎব্যাপী যে এক 'মহানিয়মের' কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে সেই মহা-নিয়মের ব্যভিচার-ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক আরো নতুন কথা বলেছেন। লেখকের প্রথম বক্তব্য : সেই 'মহানিয়ম' যদি সর্বত্র নাও ঘটে, তবু বলতে হবে, সেখানেও কোন না কোন নিয়মের অস্তিত্বও বহু আছেই। কারণ, নিয়ম ছাড়া বিশ্ব জগতে কোন ঘটনাই কদাপি ঘটতে পারে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য : কোন ঘটনাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে; কিন্তু সত্য নয়। আসল সত্য হল : আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে, যাকে সাবেক নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত করেছি,—তা সেই প্রদেশেরই একটি নিয়ম,—সে কথা ভেবে দেখি না। কাজেই তা একটা 'নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'—অভিজ্ঞতার অভাবে যা আমাদের জানা ছিল না। সেখানকার সেই 'অজ্ঞাতপূর্ব নিয়মটি' জানার ফলে আর সেগুলিকে পরিচিত নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। সেখানে তৃতীয় বক্তব্য হল এই : বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে, তাই-ই কোন নিয়মের বশে ঘটে; প্রতিটি ঘটনারই একটি 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলা থাকে বা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ফলে, ক্রমে ক্রমে, সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আর কোন বে-নিয়মের ফল বলে মনে হয় না। যতদিন সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, কেবল ততদিনই ওই বিশেষ ঘটনা বা ঘটনা-ধারাকে মূল নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। লেখক তাঁর প্রবন্ধ এই বলে শেষ করেছেন : বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের বন্ধনকে দেখে আমাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোন কারই নেই। বরং এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বত্রই এবং সর্বদাই কোন না কোন ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে কিন্তু সেই সব ঘটনা যে ঘটে চলেছে, কী তার প্রয়োজন কেউ তা জানে না। নানা ধরনের মানুষ তার নানা উত্তর দেন।

৩.১২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় অংশ)

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশটির তুলনায় প্রথম অংশটিতে বক্তব্য যতখানি বিশদ ও বিস্তৃত, সেই কারণেই তা প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে বক্তব্য জটিলতর, কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়নি। এই অংশের একেবারে শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাক দুরূহ।

এই দ্বিতীয়াংশে পর-পর কেবলই ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি ঘটেছে একটি বিশেষ পথ ধরে। প্রথমে তাঁর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দিকটি কার্যকরী হয়েছে, তার কথা বলি। লেখক জগদ্ব্যাপী নিয়মকে দেখেছেন—দুটি দিক থেকে। একদিকে তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপী একটি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী; অপরদিকে বিশ্বচরাচর ব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিরন্তরতায় বিশ্বাসী। একটি নিয়ম এখন পর্যন্ত স্থির, অপর নিয়ম নিরন্তর আবিষ্কৃত দিক। বর্তমানের দৃষ্ট সত্য ও নিয়ম এবং ভবিষ্যতের অ-দৃষ্ট অনাগত অনাবিষ্কৃত নিয়ম—দুই নিয়মেই তিনি সমপরিমাণে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টি ও মন একটি আধুনিক সচল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেছে।

নিয়মের এই নিরন্তরতায় এবং নতুন নতুন নিয়মের আবিষ্কারের বিশ্বাস স্থাপন একটি সচল মনের পরিপোষক এবং এত এক ধরনের দার্শনিকতা বটে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে দার্শনিকের সত্যের একটি বিরোধও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য নয়। আজ যা সত্য, কাল তা অন্য সত্য আবিষ্কারের ফলে নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সত্য স্থির-ধ্রুব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সত্যের চাইতে দার্শনিকের সত্যের ওপরেই পরবর্তীকালে অধিকতর গুরুত্ব ন্যস্ত করেছেন।

তবে, বৈজ্ঞানিকের এই সত্যের নিরন্তররতা বা ক্রমে ক্রমেই নবতর আবিষ্কারের ফলে পূর্ববর্তী সত্যের খারিজ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটি কথাও বলেছেন : জগদ্ব্যাপারে এই যে নিরন্তরতা ক্রমে-ক্রমেই ঘটনাবলি কেবলই ঘটে চলেছে, তার কারণও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছেন,—তাও একটি দার্শনিক মন-প্রসূত। তিনি বলেছেন : "জগতে কিছু-না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।... একটা কিছু যে ঘটিতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।" লেখকের এই উক্তিটিই একটি দার্শনিক উক্তি।

তাঁর উত্থাপিত শেষ প্রসঙ্গটি হল : "জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন..." তার উত্তর অন্বেষণ করা। সেই উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষের কাল্পনিক উত্তর প্রদান করেছেন, এবং তারই মধ্যে চিন্তাধারার বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। প্রথমত, 'অজ্ঞানবাদী'র 'অজ্ঞতাবাদ (Agnosticism), যে তত্ত্বের মূল কথা হল—জগতের চরমতত্ত্ব চিরকাল অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকে। কাজের উল্লিখিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা বলবেন—'জানি না'। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ জীবন ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একাত্ম। কাজেই ব্রহ্মই এই সব ঘটাচ্ছেন, অর্থাৎ 'আমি'ই যেন তা ঘটাচ্ছি। বৈদান্তিকের উত্তর তাই : "আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু।" বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদের কারণেই লেখক সেই অনুযায়ী জগদ্ব্যাপী নিয়মের ব্যাখ্যা তাঁদের মুখে দিয়েছেন।

আলোচ্য অংশটির রচনারীতি প্রথম অংশটিরই মতো। এখানেও সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ফলে একটি কথোপকথনের ভঙ্গি তাতে ফুটে উঠেছে। যেমন,

"চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমনকি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়,...উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত, সময়ে সময়ে নাচাইতে নিয়ম। প্রতি এগারো বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে।" এখানে বাক্য ভঙ্গিতে অব্যয় 'ত' এর প্রয়োগ একটি সহজ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তেমনি, চুম্বকের কাঁটার 'নর্তনপ্রবৃত্তি'র উল্লেখ মৃদু রসিকতার প্রবর্তন করেছে।

কিংবা আর একটি দৃষ্টান্তে—এখানে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য বলা হয়েছে।

"তুমি সোজা চলতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম, তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী, কাঁদিতেছে, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।"

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছেন (যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁরাই অতি সহজ, কৌতুক-স্নিগ্ধ সরস গদ্যে তা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর সেই ধারারই সাধক। ইংরেজি Popular science এর সঙ্গে তুলনীয়।

৩.১৩ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রসঙ্গের টীকা

১. আর্গাইলের ডিউক

স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের অভিজাত একটি পরিবারের উপাধি আর্গাইল। বিলেতের প্রথা অনুসারে 'আর্ল', 'মার্কুইস', 'ডিউক' প্রভৃতি বিশেষ উপাধির অধিকারী হন ওই পরিবারের সদস্যরা। অষ্টম ডিউক জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮২৩-১৯০০) বিজ্ঞান, রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'The Reign of Law' নামক গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত আলোচনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর সমকালীন বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য, ক্যামাবেল প্রথম পাখির উড়ালের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ফ্লাইং মেশিন সংক্রান্ত ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

২. সাত্ত্বিক ভাব

বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে কৃষ্ণনাথ শ্রবণে বা দর্শনে সমগ্র দেহে পরিবর্তন আসে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ভক্তের শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনের ফলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘাম) রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বিবর্ণতা, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা) — এই আটটি ভাবের সমাহারকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়। শ্রীরাধা, মীরাবাঈ চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলেছেন বৈষ্ণব দার্শনিকরা। এঁদের কৃষ্ণপ্রেম অতি গভীর তাই আটটি ভাবই প্রকাশিত হয়। সাধারণ ভক্তদের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৫টি লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে বলে শাস্ত্রকাররা মনে করে থাকেন।

৩. 'ন যযৌ ন তস্থৌ'

কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব কাব্য থেকে উদ্ধৃত। শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে যান পার্বতী। ক্ষুব্ধ শিব পার্বতীকে কিছু না বললেও প্রেমের দেবতা মদনকে ভস্ম করে দেন। অপমানিতা পার্বতী কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তুষ্ট শিব তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ছদ্মবেশে এসে, পার্বতীর সামনে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন। পার্বতী সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলে শিব তাঁকে পিছন থেকে ডাকেন। শিবকে চিনতে পেরে পার্বতী তাঁর গমনোদ্যত পদক্ষেপটি শূন্যে তোলা অবস্থাতেই স্থানু হয়ে যান। এই পরিস্থিতিটি মধ্যবর্ত্তী একটি অবস্থার সৃষ্টি করে — যেতেও পারছেন না আসতেও পারছেন না — এমন বোঝাবার জন্যই উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র সমান অবস্থায় কী ঘটতে পারে বোঝাতে এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন।

৩.১৪ সাধারণ আলোচনা

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুই-এর সমান্তরাল চলন পাঠককে আনন্দ দেয়। বাংলা ভাষায় 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান' বা 'Popular Science'-এর ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব অপরিসীম। ডারউইন, জার্মান চিকিৎসক-বিজ্ঞানী- হেলমহোলটস্। ইংরেজ গণিতজ্ঞ উইলিয়াম ক্লিফোর্ড প্রভৃতির তত্ত্ব ও বিজ্ঞান চিন্তাকে বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। বর্তমান প্রবন্ধটির নাম 'নিয়মের রাজত্ব'। এখানে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা উল্লেখ করে লেখক তার অনিবার্যতার দিকটি নির্দেশ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ-এর নিয়ম ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যতিক্রম হিসেবে, হাইড্রোজেন গ্যাসপূর্ণ বেলুন। মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে ওপরে ওঠে — এই তথ্যটি এনেছেন।

পরবর্তী অংশে কারণ নির্দেশ করে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন জল বা বায়ুর তুলনায় লঘু বস্তু মাধ্যাকর্ষণ এড়াতে পারে, তাই লোহা ডুবে যায়, শোলা জলে ভাসে। এটি ব্যতিক্রম নয়, আরেক জাতীয় নিয়মেরই দৃষ্টান্ত।

এইভাবে সহজ ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে, লেখক অগ্রসর হয়েছেন নিয়মের শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনায়। বিশ্বজগৎ ও সৌরজগত কয়েকটি নিখুঁত নিয়মের অনুসরণ করে চলেছে। বিজ্ঞানের যথার্থ আবিষ্কার এবং চর্চা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম। তাই, রামেন্দ্রসুন্দর জানিয়েছেন আজ যা অজ্ঞাত, কাল তা-ই দিনের আলোর মত স্পষ্ট হতে পারে বিজ্ঞানের সহায়তায়। সাধারণ মানুষ প্রাগৈতিহাসি কাল থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে চলেছে। মানুষ-ই আবিষ্কার করেছে আগুন, কৃষিকার্যের কৃৎকৌশল, গৃহনির্মাণের নির্ভুল পরিকল্পনা। এভাবেই প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। আর্কিমিডিস বা নিউটনের আবিষ্কার তারই উদাহরণ।

সরস এবং সকৌতুক ভঙ্গিতে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে ব্যতিক্রম ও অনাবিষ্কৃত নিয়মের কথা বলেছেন লেখক। কিন্তু তাঁর দার্শনিক মনন ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে জগতের সৃষ্টিরহস্যের মূল সন্ধানে। বৈদান্তিক ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান, বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদ—সবই যেন সেই অজ্ঞাত সূত্রাবলীকে ব্যাখ্যা করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রবন্ধের এই পর্যায়ে এসে কিঞ্চিৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

সামগ্রিক ভাবে জগৎব্যাপী বিভিন্ন নিয়মের দৃঢ়তা এবং শঙ্খলার কথা বলা হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক সত্য সব নিয়ম এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেনি। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান সাধক এবং একইসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে আস্থাবান। তাই প্রবন্ধের শেষাংশ নানা তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে যদিও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হননি।

৩.১৫ বিশ্লেষণমুলক আলোচনা

বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ববর্তী প্রাবন্ধকিদের নাম স্মরণ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫) গ্রন্থে বলা হয়েছিল '... যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তার কঠোর শত্রু'। উনিশ শতকের নব্য শিক্ষা পদ্ধতির সূচায় জ্ঞানের প্রত্যক্ষতা, বিশ্বচিন্তা এবং যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রাধান্য পায়। অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের নানা রচনায় তার প্রমাণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্য বাঙালি পাঠককে সরাসরি বিজ্ঞানচর্চার স্বাদ দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' (১৮৮২) গ্রন্থটি তেমনভাবে প্রচারিত না হলেও বাঙালির বিজ্ঞানচর্চাকে কয়েকধাপ এগিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দিয়েই আয়ত্ত করেছিলেন বিজ্ঞানের

মৌলিক সূত্র। 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) গ্রন্থে তারই প্রকাশ ঘটেছে। জগদীশ চন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' (১৯২১) একটি বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা। যাইহোক, রামেন্দ্রসুন্দরের স্বকীয় গদ্যরচনা বিজ্ঞানর্চাকে আকর্ষণীয় করেছে। তবে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর আর্দা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাধু ভাষা সত্ত্বেও সহজ শব্দের ব্যবহার ও কথোপকথনের ভঙ্গি অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রবন্ধের সূচনায় একটি ছদ্ম তর্ক দিয়ে লেখক যুক্তি প্রতিযুক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। যাঁরা একটি নিয়মকে ধ্রুব এবং অলঙ্ঘ্য বলে মনে করেন তাঁদের মতামত স্বীকার্য নয়। কারণ, ভবিষ্যতে নতুন কোনো আবিষ্কার নিয়মকে পাল্টে দিতে পারে। আবার, যাঁরা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী তাঁদের মতে নিয়ম যতই ধ্রুব হোক না কেন ব্যতিক্রম থাকবেই তর্ক-বির্তকের অবতারণায় প্রবন্ধ আরম্ভ হল। সরস ভঙ্গিতে এই রচনা এগোতে থাকে। কেন লেখক বৈজ্ঞানিক নিয়ম বিষয়ে এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন তার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথমাংশে।

মাধ্যাকর্ষণকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তার কারণ, এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। গাছের ফল প্রাকৃতিক নিয়মে মাটির দিকে ধাবিত হয়। লেখক কৌশলে জানিয়েছেন 'এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।' অর্থাৎ 'অসাধারণ' নিয়মের সম্ভাবনা বিজ্ঞানের রাজ্যে সর্বদাই আছে।

'অসাধারণ' নিয়মটি ক্রমশ লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি তখনই কার্যকর, যখন বস্তুটি বায়ুমণ্ডলের চেয়ে ভারী। যদি কোনো বৃক্ষচ্যুত ফল ওপর দিকে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে ফলটি বায়ুমণ্ডলের তুলনায় হালকা। এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক 'লঘু' ও 'গুরু' শব্দের অর্থ প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি মাধ্যাকর্ষণকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' নয় বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ, নিয়মটি লঘু-গুরু বিচারের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। অধিকাংশ বস্তু বায়ুর তুলনায় ভারী বলেই মাধ্যাকর্ষণ বিষয়টি সিংহভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাই সাধারণ লোক একেই 'নিয়ম' বলে ভাবেন। বিজ্ঞান সাধক রামেন্দ্রসুন্দর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন বস্তু সাধারণ অবস্থায় নিম্নগামী। বায়ু ও অন্যান্য বস্তুর সংস্পর্শে (জল, পারদ, তেল) এলে তা ক্রশ ওজন অনুসারে ওঠে বা নামে। পারদ ভারতী ধাতু, তাই লোহা পারদে ভেসে ওঠে, ডোবে না।

শেষ পর্যায়ে দার্শনিক পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞান চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' — এই কথা স্মরণ করে লেখক বলেন — 'এযার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই।' —বিজ্ঞান সাধকের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচয় পেলেও মূল বিষয় থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হয়ে যায় প্রবন্ধটি। উনিশ শতকের আধুনিক মননের সঙ্গে যুক্ত হয় সনাতন ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিকতা।

অতি সুন্দর ও সাবলীল গদ্য ভাষার নিদর্শন রেখেছেন লেখক। 'আইনের ভাষা' প্রয়োগ করে স্তরে স্তরে বক্তব্যকে প্রকাশ করায় সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধ অল্প। লেখক তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা দিয়ে কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিবিধ ও বিচিত্র জ্ঞানচর্চায় যাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের অগ্রগণ্য। সহজ উদাহরণে, সংলাপ রচনার ভঙ্গিতে বিজ্ঞান পরিবেশনের কৌশল বাংলা গদ্যের পরিসরকে বিস্তৃত করে দিয়েছে।

৩.১৬ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন :

১। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন?

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি কেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে?

৩। তিনি ভারতীয় দর্শনের কোন্ দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?

৪। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোন্ প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত?

৫। রামেন্দ্রসুন্দরের মূল কর্মক্ষেত্র দুটির নাম বলুন।

৬। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী?

৭। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন?

৮। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষক-সত্তা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল?

৯। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।

১০। রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন 'বঙ্গের হাক্সলি' বলা হত?

১১। 'মহানিয়ম' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

১২। প্রত্যেক ঘটনার 'সম্বন্ধ' ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী?

১৩। বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের অস্তিত্ব দেখে আমরা কি বিস্মিত বা আনন্দিত হব?

নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন :

১। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির মূল্যায়ন করুন।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির উপস্থাপন ও গদ্যরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৩। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরুন।

৪। বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র যে নিয়মগুলির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করুন।

৫। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির এই অংশে বিন্যাসের যে দুটি স্তর দেখা যায়, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৬। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে?

৭। বিশ্বব্যাপী নিয়মের কারণরূপে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য কী?

৮। আলোচ্য অংশটির গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। অধীর দে—'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা'

২। নির্মলেন্দু ভৌমিক—'রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন' (ভূমিকা)

৩। সুকুমার সেন—'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য'

একক - ৪ ❑ শূদ্র জাগরণ: স্বামী বিবেকানন্দ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা

৪.৪ স্বামী বিবেকানন্দ : তার প্রবন্ধ সাহিত্য

৪.৫ প্রাথমিক পরিচয়

৪.৬ মূল বিষয় ও তথ্যাদি

৪.৭ শূদ্র জাগরণ : মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

৪.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (প্রথম অংশ)

৪.৯ সারাংশ (প্রথম অংশ)

৪.১০ শূদ্র জাগরণ : মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় অংশ)

৪.১২ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

৪.১৩ সাধারণ আলোচনা

৪.১৪ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

৪.১৫ অনুশীলনী

৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের—

- গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন;
- তৎকালীন বিশ্বের ও ভারবর্ষের শূদ্রজাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি; তিনি ছিলেন—কর্মবীর। কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। সেই কর্মের দিক থেকে জগৎকে দেখবার ফলে ইতিহাস, রাজনীতি এবং স্বদেশপ্রেমকে তিনি বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের সব বাঙালি মনীষীই তাদের স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে বিশেষভাবে ভিত্তি করেছেন এবং দেশে-দেশে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির যে বিচিত্র

প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রেম ইতিহাস ও রাজনীতির পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সেই পথে চারণা করেছেন, তবে তা একান্তভাবে তাঁরই অনুগত পথে। আলোচ্য 'শূদ্র জাগরণ' (এটি তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত) প্রবন্ধটিতেও তিনি ভারতবর্ষের শূদ্র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানটি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন। শূদ্র বলতে তিনি কেবল ভারতীয় একটি বিশিষ্ট বর্ণকেই বোঝাননি, বিশ্বের যেখানেই যত অনুন্নত, পীড়িত মানুষ আছে, তাদেরও বুঝিয়াছেন। এখানেই তিনি মানবতাবাদী, এখানেই তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় শূদ্রকে তিনি ইংরেজের শাসনাধীন যে কোনো ভারতীয়কেই বুঝিয়াছেন। এইভাবে তিনি প্রবন্ধটির ভাব ও অর্থগত সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র অর্থে 'শূদ্র' বর্ণটিকে গ্রহণ করে তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার উৎস যেমন নিরূপণ করেছেন তেমনি সেই সমস্যার পথও নির্দেশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য কথা হল, —ইংরেজের প্রসঙ্গে উত্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা, ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। সব ভারতীয় আলোচকই ভারতীয় জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যাকে দু'দিক থেকে লক্ষ করেছেন; একদিক হল ভারতবাসীর নিজের কর্তব্য, অপরদিক হল শাসকরূপে ইংরেজের কর্তব্য। এই দুই দিকের কর্তব্য যখন একসঙ্গে মিলবে, তখনই শূদ্রদের জাগরণ সম্ভব ও সার্থক হবে। সমগ্র বিশ্বের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে বিস্তৃত পড়াশোনা ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। তাঁর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর মনীষার শুভ সংযোগের ফলে এটি একটি বিখ্যাত প্রবন্ধরূপে পরিচিতি লাভ করে।

৪.৩ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ক'জন কর্মবীর ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধানকল্পে আত্মনিয়োগ করেন, স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত : জন্ম : ১২.১.১৮৬৩। প্রয়াণ : ৪.৭.১৯০২) তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। রোমাঁ রোলাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অসংখ্য লেখক-লেখিকা তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে তথ্যবহুল, বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ পরস্পরের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকথায় তাঁর কর্মসাধনার মূল্যায়ন করেছেন : "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলন সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।"

বিবেকানন্দ জেনারেল এসেম্বলি কলেজের (পরে যার নাম হল—স্কটিশচার্চ কলেজ) স্নাতক। ছাত্রাবস্থাতেই দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্বভাবতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন তর্কনিপুণ, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতেন। তাঁর মধ্যে ছিল নেতৃত্ব করবার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সংগীত বিষয়ে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ, নিজে সংগীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত যে গানটি শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি : 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,/ভাবো ব্যোমে ছায়াসম, ছবি বিশ্ব-চরাচর'। আসলে তাঁদের বাড়িতেই ছিল সংগীত-চর্চার ধারা। এই সংগীত-প্রিয়তা ও সংগীত প্রতিভা তাঁর

মানসকে এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করে। তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং সেখানে তাঁর পরিচিতি। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, এই মহাধর্ম সম্মেলন শুরু হয়, ১৭ দিন ধরে তা চলে। তিনি চার বছর ধরে (১৮৯৪-১৮৯৭) আমেরিকা ও ইংলন্ড পরিভ্রমণ করেন। বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য তিনি ভারত ভ্রমণ করেন, তারই অভিজ্ঞতা 'পরিব্রাজক' নামে তাঁর গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তাঁর ধর্ম মানুষ তৈরির ধর্ম। তিনি বলতেন : "যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন—" একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, স্বদেশি বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পড়াতে হবে। দিতে হবে টেকনিক্যাল এডুকেশন, দেশে যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে। তাঁর এ চিন্তা ও যুগের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। তিনি আরো বলেছেন : "জনশিক্ষা বিস্তারই জাতীয় উন্নতির মূল।"

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল—প্রাচীন ভারতের আদর্শকে উজ্জীবিত করা, তাঁর জীবনের ভিত্তি হল—অদ্বৈত বেদান্তবাদ। তাঁর সাধনা—ত্যাগ ও সেবার সাধনা, নানাপ্রকার অস্পৃশ্যতাকে পরিহার করা। জীবনই তাঁর কাছে শিব। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ভারতবর্ষের দরিদ্রজনের অস্পৃশ্যজনের হীনজনের প্রতীক ও প্রতিনিধি তিনি। দেশের যুবশক্তির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, সর্বপ্রকার কর্মে তিনি তাদেরই আহ্বান করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন : "আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন।" নারীজাতির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। 'হিন্দুনারীর আদর্শ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রচনাও তিনি লিখেছিলেন।

'শ্রী অরবিন্দ এই জন্যেই তাঁকে "এক শক্তিধর পুরুষ" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৪.৪ স্বামী বিবেকানন্দ : তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য

অকাল মৃত্যুর কারণে বিবেকানন্দের অনেক রচনাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ও বাংলা—দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন; ইংরেজি—বাংলাতে আছে তাঁর পত্রাবলী। যাকে বলে 'পত্র-প্রবন্ধ' এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সেই ধারার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্র-প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিতি লাভ করে, যদিও প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথও ভ্রমণ-পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছেন।

বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ও পত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—কথ্য বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর সাধু ভাষায় লেখা গদ্য যেমন সহজ-সাবলীল, কথ্য ভাষায় লিখিত গদ্য তেমনি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। যে সময়ে অন্যান্য গদ্য শিল্পীরা সাধু বাংলায় রচনাদি লিখছেন, সেই সময় কথ্য গদ্যকে এসব স্বীকৃতি দান বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কথ্য গদ্যই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিবেকানন্দের কর্ম ও সাধনার দিকটি তাঁর প্রবন্ধে ও পত্রে সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়—'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি সাময়িক পত্রে। প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫), 'ভাববার কথা' (বিভিন্ন বিষয়ের রচনার সংকলন), (১৯০৭), এছাড়া পত্র-সংকলন 'পত্রাবলী'। 'ভাববার কথা' বইতে তিনি কথ্য বাংলা ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

"...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে।

ও ভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেলে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনওকালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

ধর্মচিন্তা, রাজনেতিক ও স্বাদেশিকতার চিন্তা, শিক্ষা ও ইতিহাস-চিন্তা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের নানা দিক 'রাজযোগ' গ্রন্থে ধর্মগত জটিলতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নব্য ভারতের তিনি রজোগুণ ও কর্মযোগের সম্মিলনে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'সংস্কারক কে?' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। খাঁটি সংস্কারক বলতে তিনি এই বুঝিয়েছেন :

"যদি তুমি দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে দাও, তবে তোমার তিনটি জিনিস থাকা চাই-ই চাই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে?... তারপর চাই কৃতকর্মতা। বল দেখি, তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?... আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন-প্রাণপণ অধ্যবসায়।"

বিবেকানন্দের পূর্বে মূর্খ, চণ্ডাল, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এমন করে কেউ ভাবেননি। আলোচ্য 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটি তারই ফল। এই মানুষদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতার কারণে দূরে ঠেলে রাখা, তাদের সামাজিক ঊর্ধ্বায়ন—প্রভৃতিকে তিনি একদিকে আবেগ, অপরদিকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—দুদিক থেকেই দেখেছেন। বেদান্তধর্মকে তিনি জীবনের Practical ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এভাবেই। তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু সে সন্ন্যাস কর্মময় সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্মসাধনাই তাঁর মূল সাধনা। তাঁর গদ্যের স্টাইল হল একদিকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা (সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সংস্কৃতেও তিনি কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন), আবার অন্যদিকে শ্লেষ-ব্যঙ্গকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধের পরিমাণ ইংরেজির তুলনায় কম। মানুষকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত করবার জন্যই তাঁর ভাষা এই বিশেষত্ব অর্জন করেছিল।

৪.৫ প্রাথমিক পরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) আধুনিক ভারতের সাধক, ধর্মসংস্কারক, দার্শনিক। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। শিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) তাঁর বক্তৃতা সমগ্র বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ধর্মব্যাখ্যা ও তত্ত্বভাবনা সর্বদাই সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

স্বদেশবাসীকে স্বামীজী কর্মে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে তিনি তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছে। একই সঙ্গে প্রবন্ধ ও পত্রাবলী রচনা করে তিনি সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন শুধু নয়, কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে হবে। স্বামীজীর সব রচনাই কোনো না কোনো ভাবে মানুষকে উন্নত জীবনের দিকে আকর্ষণ করে।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। এর অন্তর্গত নিবন্ধ 'শূদ্র জাগরণ'। উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩০৫-০৬) ষষ্ঠ থেকে একাদশ সংখ্যায় কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৬-০৭) সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় ওই এই রচনার দুটি কিস্তি ছাপা হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর গ্রন্থটি বেরিয়েছিল। ভারত প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেলেও সামগ্রিক ভাবে বিশ্বের সামাজিক বিন্যাস, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অতীতের সূত্র ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা — সবই স্থান পেয়েছে।

৪.৬ মূল বিষয় ও তথ্যাদি

বর্তমান ভারত গ্রন্থটির মধ্যে বিভিন্ন শিরোনামে ক্ষুদ্র ও নাতিদীর্ঘ ১৪টি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। শিরোনামগুলি নিচে উল্লিখিত হল—

'বৈদিক পুরোহিতের শক্তি', 'রাজা ও প্রজার শক্তি', 'স্বায়ত্তশাসন', 'বৌদ্ধ বিপ্লব ও তাহার ফল', 'মুসলমান অধিকার', 'ইংলন্ডের ভারতাধিকার', 'বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়', 'পুরোহিত-শক্তি', 'ক্ষত্রিয় শক্তি', 'ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন', 'বৈশ্যশক্তি', 'শূদ্র-জাগরণ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ', 'স্বদেশমন্ত্র'।

এর মধ্যে শূদ্র-জাগরণই দীর্ঘতম রচনা। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনার চেষ্টা আছে। সেই ইতিহাস মূলত সমাজব্যবস্থা ও মানবসভ্যতা বিকাশের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করেছে।

বর্ণ বিভাজনের বিষয়টি ভারতবর্ষে প্রাগৈতিকহাসিক কাল থেকেই গুরুত্ব পেয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র—এই চারটি স্তরে মানবসমাজ বিন্যস্ত ছিল। বিবেকানন্দের নিবন্ধ শুরুই হয়েছে শূদ্রজাতির গুরুত্বহীনতার আশঙ্কায়। আধুনিক জগতেও অর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির নিরিকে বর্ণবিভাজন ঘটে চলেছে।

নিবন্ধের সূচনা থেকে লেখক দেখিয়েছেন এই জাতিভেদ এখন আর বর্ণনির্ভর নয়। কর্ম এবং আচরণেই ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ হয়ে চলেছে লেখকের উপলব্ধি, সমগ্র বিশ্ব আজ ক্ষমতার অধীন। তাই, ইংরেজ বর্ণশ্রেষ্ঠর ভূমিকার অবতীর্ণ। আবার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্ররূপে সে-ই ক্ষত্রিয়। এবং বণিকধর্ম আয়ত্ত করেছে বলে ইংরেজ-ই বৈশ্য। বিবেকানন্দ এই বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে। এরসঙ্গে সাবেক বর্ণব্যবস্থার মিল সামান্যই। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, সত্যকাম, বেদব্যাস প্রমুখের জন্ম ভিন্ন কুলে হয়েও ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের কথা শোনা যায় বটে, তবে তা নিতান্তই দুর্লভ দৃষ্টান্ত। বিপরীত ভাবে, দুষ্কর্মকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের শূদ্রের সমান বলে চিহ্নিত করা হত। লেখক জানিয়েছেন বর্তমানে এই ভাবে বর্ণ পরিবর্তন হয় না। কর্মের দ্বারাই সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। তাই শূদ্রকুলের কোনো মানুষের উন্নতি ঘটলে তা একাধারে স্বজাতি ও সমগ্র সমাজের পক্ষে ইতিবাচক হয়।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োগ করে স্বামীজী দেখিয়েছেন। যে কোনো রাষ্ট্রের মূল শক্তি তার প্রজা বা সাধারণ অধিবাসীবৃন্দ। কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রাজশক্তি সম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অর্থসম্পদে পরিপূর্ণ বৈশ্য ক্ষমতার দম্ভে বারেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর প্রজাবর্গ থেকে। এর ফলে ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অধিকার বঞ্চিত শূদ্রসমাজ ক্ষোভ ও ক্রোধের দ্বারা চালিত হয়ে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। এই পরিবেশ সুস্থ সমাজ গঠনের পরিপন্থী।

এই সূত্রে লেখক সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। মহাপরাক্রান্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন কীভাবে অন্যান্য পরাধীন দেশের উত্থানের কারণ হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেছেন। জাপান রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে উচ্চবর্ণের আসনে বসেছে। অন্যদিকে মহাশক্তিধর চীন বা তুরস্কের উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন বহু উচ্চশক্তির পতন ঘটছে বা ''শূদ্রত্ব' প্রাপ্তি হচ্ছে।

লেখকের মতে, ইওরোপে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ, এনার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদ এবং নিহিলিজম বা নাস্তিবাদ সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজছে। এই মতবাদগুলি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে চলেছে এবং উচ্চশক্তির পতন ঘটছে। শূদ্ররা উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদেরও যোগ্যতালাভ করতে হবে। নিজেদের মনোভাব ও কর্মক্ষমতাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষোভ, ঘৃণা পরিত্যাগ করে অগ্রসর হওয়াই কাঙ্ক্ষিত।

আধুনিক ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত। এযুগে বাণিজ্যিক কারণেই যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। তাই, দেশ দেশান্তরের নানা জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি ভারতে লভ্য হচ্ছে। ভারতীয়রা ধীরে ধীরে উন্নতিলাভে সচেতন হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ শাসনের এই সুফলের পাশাপাশি কিছু কুফলও ভোগ করতে হচ্ছে। দৃঢ় সামনের ফলে ভারতীয়দের সৃজনমূলক চিন্তাশক্তির যথাযথ বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দের মতে, প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে একপক্ষে রাজতন্ত্রই ভাল। সর্বশক্তিমান রাজার কাছে সব প্রজাই সমান। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে, প্রধান শাসকের কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ থাকে। যার ফলে পক্ষপাতের পরিবেশ তৈরি হয় — যেখানে উন্নতির চিন্তা বিকশিত হতে পারে না।

শেষে স্বামীজী ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা করে বলেন, নিজেদের গৌরব রক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরেজ যে শক্তি প্রয়োগ করে চলেছে তা অনাবশ্যক। বরং অধঃপতিত ভারতের কল্যাণ কর্মে অর্থ ও মনোযোগ প্রয়োগ করলে 'শূদ্র' জাতির উন্নতি সম্ভব হত। ব্রিটেনের উন্নতিও সেখানে জড়িত আছে। ইংরেজের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলে 'শূদ্র-জাগরণ' সম্ভব।

৪.৭ 'শূদ্র জাগরণ'—মূল পাঠ (প্রথম অংশ)

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতের দেশের 'ভারবাহী পশু' সে শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দুরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য আশ্লীলতা বিকিরণে; এ শূদপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা। ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্র সাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান ঋধ্পতেজে শূদ্রত্ব দুরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতন্য এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল

ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম[১] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকূলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের ভাগ পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ[২] ও নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধীবর[৩] ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাকে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকূলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে, জাতিনির্বিশেষে দণ্ড পুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজে নেতৃত্বে বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়। তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালীন প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তি ও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখাক খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি-সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী[৪] পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

---

১. সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

২. বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত- ঋগ্বেদ, ৭।৩৩।১১-১৩

৩. ধীবরজননীর পুত্র

৪. পশু শিকার করিয়া জীবনধারণ করে যে।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই, ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

৪.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (প্রথম অংশ)

এই নিবন্ধটি বিবেকানন্দের প্রতিভার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। শূদ্র জাগরণের বিষয়টিকে তিনি সমকালের বিশ্বের যুগস্বভাবের দিক থেকে ইতিহাসের তথ্যমালার উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করেছেন; আলোচনার মূল দৃষ্টিচকোণটি হল—তুলনামূলকতার দিক। সবার শেষে আছে—সাহিত্যিক দিক থেকে বিষয়টির প্রকাশগত দিক। এই সবগুলি মিলিত ও একত্র হয়ে রচনাটিকে করে তুলেছে একান্তভাবেই বিবেকানন্দীয়।

প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্বেই দেখা যায়, লেখক প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের (Administration) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তুলনাটি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার। দুই ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা। ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা বলেই তা প্রতিভার পরিচায়ক। লেখক বলেন : ইংরেজ আজ ব্রাহ্মণ, ইংরেজই আজ ক্ষত্রিয় এবং পুনশ্চ ইংরেজই আজ বৈশ্য। একা ইংরেজ প্রশাসনই প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছে। আর সেই ইংরেজের দ্বারা শাসিত গোটা ভারতীয়গণই আজ শূদ্রে পরিণত। এইভাবে 'শূদ্র' এই আখ্যাটিকে একটি অভিনব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকায় দেখা হয়েছে। লেখকের আক্ষেপ, এই রাজনৈতিক 'শূদ্রত্ব' ঘোচাবার জন্য ভারতবাসীরদের মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, উদ্যম নেই। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অপরদিকে ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই আছে ঈর্ষা ও অনৈক্য, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন জাতিগত দিক থেকে শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-অনৈক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, রাজনৈতিক শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসীরদের মধ্যেও তাই দেখা যায়। একদিকে ব্রাহ্মা-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, অপরদিকে শূদ্রগণের মধ্যেও তাই। এই স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রগণ আজ একটি পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর লেখক রচনাবলির বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণে রত হয়েছেন এবং সমগ্র সমকালীন বিশ্বের একটি লক্ষণকে খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'যুগস্বভাব'। এই 'যুগস্বভাব'কে তিনি অবহেলিত উপেক্ষিত বিধ্বস্ত শূদ্রগণের পক্ষে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তখন দেখা যাচ্ছিল যুগ প্রভাবে বা কাল প্রভাবে সমাজের উচ্চবর্ণ ক্রমেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ নিম্নবর্ণে পরিণত হচ্ছে, বর্ণভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শূদ্রদের পক্ষে তা শুভ ঘটনা। লেখকের মন্তব্য : "কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে।" সমকালীন ইতিহাস থেকে তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন,

রোমরাজ্যের পতনের পর ইউরোপের নানা পরাধীন দেশের উত্থান ঘটেছে; মহাবল চীনের পতন ঘটছে, নগণ্য জাপান রাজনৈতিক উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রীস-ইতালি-তুরস্ক-স্পেনের নিম্নাভিমুখ পতনও এখানে উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই উচ্চশক্তির পতন পরাভব এবং নিম্নশক্তির উত্থান সূচিত হচ্ছিল। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য জগতে এই যে উচ্চশক্তির ক্রমাবনতি, তার পেছনে কারণ হিসেবে আছে সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনর্কিজম্, (নৈরাজ্যবাদ) এবং জাইহিলিজম্ (জাতিবাদ)। ইউরোপের এইসব রাজনৈতিক মতবাদগুলিকেই লেখক "বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা" বলে মনে করেন। এইসব বিপ্লবের ফলেই উচ্চশক্তির পরাভব ঘটে চলেছে। এরই ফলে, অর্থাৎ ইতিহাসের এক অমোঘ নির্দেশের ফলে ও বলে ভারত ও বিশ্বের শূদ্রগণের উন্নতি আসন্ন।

কিন্তু শূদ্রগণের এই বিশ্বব্যাপী আসন্ন উন্নতি প্রসঙ্গে লেখকের দুটি বিশেষ বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, শূদ্রের যে জাগরণ ও উন্নয়ন ঘটবে, তাতে শূদ্রগণ তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম-সংস্কার-সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলবে না,—"শূদ্র 'ধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" দ্বিতীয়ত, সেইটি আয়ত্ত করতে গেলে শূদ্রদের নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার জন্য জাতিগত প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ "যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।" অর্থাৎ কেবল যুগস্বভাব বা কালপ্রবাহের কারণেই নিতান্ত অনায়াসে ও অবলীলাক্রমেই শূদ্র-জাগরণ ঘটবে না; তাদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতীয় কর্মসম্পাদন করতে হবে,—তবেই জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব হবে।

লেখক এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থায়ী দিকে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং সমাজে শূদ্রগণের অবস্থানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য জাতি 'গুণগতজাতি'। এর অর্থ হল, ব্যক্তির নিজস্ব quality বা গুণ অনুসারে সমাজে সে উচ্চ বা নীচ স্থানে অবস্থান করে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও এই গুণগত জাতির দকি একটি দোষের বা অনিষ্টের কারণ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব "শূদ্রগণকে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল"। 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পক্ষে অনিষ্টের আর ভারতের পক্ষে ইষ্টের কারণ কেন? আপন প্রতিভাবলে কোন শূদ্র ধনশালী বা বলবান হলে, তাকে সমাজের উপরিতলে স্থান দেওয়া হত, এতে তার জাতি আপন বিশুদ্ধতা নিয়ে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে এ প্রথার বড়ো দোশ উন্নত ও প্রতিভাশীল শূদ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-ধনের ভাগ তার নিজের জাতি পেতে পারে না। তেমনি আবার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল থেকে পতিতেরা স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রকুলে গৃহীত হত। এই শূদ্রের সংখ্যাও বেড়ে যেত।

কিন্তু আধুনিক ভারতে, ইংরেজের শাসনের ফলে কোন শূদ্র পণ্ডিত বা ধনবান হলেও, তার নিজের সমাজ ত্যাগের অধিকার নেই। "কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে।" এর ফলে আপন বৃত্তমধ্যগত শূদ্রগণের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। ভারতে যতদিন ইংরেজ শাসনব্যবস্থার এই বিধি প্রচলিত থাকবে, ততদিন নীচ জাতিদের এইভাবে উন্নতি হতে থাকবে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে লেখক অর্থনৈতিক দিকটি জড়িত করে নিয়েছেন।

এইবার সমাজের নেতৃত্ব-শক্তির সঙ্গে সমাজের সাধারণ প্রজাগণের সম্পর্কের ফলাফল ব্যক্ত করেছেন লেখক। প্রজাগণই সমাজের মূল শক্তি। কাজেরই এই শক্তির সঙ্গে নেতৃত্বশক্তির যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে, তা ওই নেতৃত্বশক্তিরই পতনের কারণ হয়। ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে, রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। অতঃপর এই বৈশ্য শক্তি শূদ্র শক্তির কাছে পরাভূত হবে। প্রতিক্ষেত্রেই পরাভবের কারণ কর্তৃসম্প্রদায় ক্ষমতাগর্বে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

কিন্তু এখানেও শূদ্রগণের প্রতি বিবেকানন্দের সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শূদ্রশক্তির আধিপত্যের দিন সমাগত। তবে সে জন্য চাই শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও সহানুভূতি। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বজাতি বাৎসল্য এবং শত্রুবিদ্বেষই কোনো জাতির উন্নতির মূল কারণ। স্বার্থই জীবনের শিক্ষক। ব্যক্তি ও ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষাই দেশ-জাতি-সমষ্টির উন্নতির কারণ হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হওয়াটাই যেন শেষে বড়ো না হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসী কোনপ্রকারে উদরপূর্তিতেই সন্তুষ্ট; উচ্চবর্ণের ভারতবাসী কোনপ্রকারে ধর্মরক্ষাকেই জীবনের বড়ো আশা বলে মনে করে। লেখকের মতে, এখানেই আত্মস্বার্থ রক্ষা কোনো বৃহৎ জাতীয় স্বার্থরক্ষার সোপান না হয়ে সমাপ্তি হয়ে থাকে, যা বিশেষ শোচনার কারণ। আত্মস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষাই হবে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার প্রাথমিক স্তর।

লেখকের এই বক্তব্য এক বিশেষ গদ্যশৈলীতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষকে, দেশবাসীকে আবেগচালিত করবার জন্য তিনি প্রথমাংশে নিয়েছেন পুনরাবৃত্তির আশ্রয়, একটু বা ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টির অনুসরণ। নতুবা এই রচনাটিতে ইতিহাসবোধ ও যুক্তি নিষ্ঠা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার কারণ। শব্দচয়নের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে, তা প্রবন্ধটিরই অন্তর্নিহিত দৃঢ়তার সূচক।

তবে, বক্তব্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণতা ঈষৎ পীড়াদায়ক : 'গুণগত জাতি' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য আর একটু প্রসারিত হবার অপেক্ষা রাখে। 'গুণগত জাতি' পাশ্চাত্য দেশের শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে কিভাবে দোষ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে, সাধারণ পাঠক তা সহজে ধারণা করে উঠতে পারে না। তেমনি, বিপরীত দিকে, সেই তত্ত্বটি প্রাচীন ভারতের শূদ্রকুলকে কিভাবে "দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল" তাও স্পষ্টতর হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৪.৯ সারাংশ (প্রথম অংশ)

প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোটি ছিল এইরকম : সবার উপরে ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং সবার নীচে শূদ্রগণ। স্বভাবতই এই শূদ্রগণ ছিল সমাজে অবহেলিত ও অনুন্নত। উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা শোষিত। লেখক এই অর্থে 'শূদ্র' বর্ণকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি আর একটি অর্থাৎ এটিকে প্রয়োগ করেছেন : ইংরেজের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মারাই, যে কোন ভারতীয় শূদ্রে পরিণত। অর্থাৎ সব ভারতবাসীই তৎকালীন ইংরেজ রাজশক্তির দ্বারা দলিত, পরাভূত। সব ভারতীয়ই তখন তাই শূদ্রের সমান। এইভাবে লেখক 'শূদ্র' আখ্যাটিকে একটি প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কেবল সব ভারতীয়ই নয়,—পৃথিবীর যেখানে যত দলিত উপেক্ষিত-অনুন্নত সমাজ ও গোষ্ঠী আছে, তারও যেন শূদ্র। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে শূদ্র আখ্যাটিকে প্রবন্ধকার প্রসারিত ও বিস্তৃত করে নিয়েছেন। এই শূদ্রের জাগরণ ও উত্থান প্রসঙ্গটি আলোচ্য প্রবন্ধের বিবেচ্য। এই উত্থান ও জাগরণের আছে দুটি দিক : একদিকে শূদ্রদের নিজের মধ্যে চাই ঐক্য-সংহতি-প্রীতির প্রতিষ্ঠা; অন্যদিকে তাদের সঙ্গে শাসনগমের সহযোগিতা। লেখকের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে যে নানা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দেখা দেখা গেছে, তা শূদ্র জাগরণেই পূর্বাভাস ও তার পরিপোষক। অবশ্য উচ্চবর্ণের মানুষেরা সেজন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন। শূদ্রের এই জাগরণ হবে—শূদ্রদেরই নিজস্ব ধর্ম-কর্ম—সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তাদেরই জীবনবৃত্তের মধ্যে এবং সর্বদেশের শূদ্রের সমাজে।

সমাজের প্রচলিত কাঠামোটিকেও এজন্য দৃঢ় করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কোনো মানুষের গুণ বা দোষ অনুসারে সে সেই সমাজের উঁচু স্তরে ওঠে বা নীচে স্তরে নেমে যায়। এতে সমাজের বাঁধুনির দৃঢ়তা থাকে না। আবার, গুণ

বা প্রতিভাবলে কোন নীচু বর্ণের মানুষ যদি সমাজের উচ্চস্তরে উঠে যায়, তবে তার নিজস্ব সমাজ তার গুণ বা প্রতিভার সুফল পায় না। তেমনি কোন ব্যক্তিগত দোষের ফলে সমাজের উঁচুতলার মানুষ নীচে নেমে এসে নীচু সমাদেল আবর্জনা বাড়ায়। সমাজে ব্যক্তি মানুষের এই ওঠা-নামাটি বন্ধ করতে হবে। তবেই শূদ্রজাতির উত্থান ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। আধুনিক ভারতে কোন শূদ্র মহাপণ্ডিত হলে কিংবা বিশেষ ধনবান হলেও আপন বর্ণ ও সমাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। এটিকে শূদ্র-জাগরণের একটি সহায়ক কারণ বলা যায়। এতে শূদ্রের ধন এবং প্রতিভা তাদের নিজ সমাজেরই কাজে লাগবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নীচ জাতির উন্নতি হতে থাকবে।

মানুষের সমাজ সর্বদাই বিবর্তনশীল। তাই প্রাচীন পৌরোহিত্য শক্তি একদিন রাজশক্তির নিকট পরাভূত হয়েছে; রাজশক্তি আবার পরাভূত হয়েছে বৈশ্য শক্তির কাছে। এইবার বৈশ্য শক্তি ও শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে বলে আশা করা যায়। ইতিহাসই এ কথা বলে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপরের বর্ণ বা শক্তি নীচের বর্ণ বা শক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার ফলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৈশ্য শক্তিও তেমনি শূদ্রশক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে নিজেদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ফলে শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। এই অবস্থায় শূদ্রদের আশু কর্তব্য হল, নিজেরা একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'জাতি' বা 'দেশ' গঠন করুক।

৪.১০ 'শূদ্র জাগরণ'—মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবণ গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ[১] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুন, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচারণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নাই। যে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজ বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন

১. চিহ্ন

করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিতি জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমাক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত ইহুদীবংশোদ্ভূত হইয়াও খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পোল (St. Paul), কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছে, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমর্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূপ রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয়। ভারতনিবাসী ইংরেজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন যে সদাজাগরূপ বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরেজের থাকিবে এমন ভারতরাজ্য—শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ প্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়; বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য যে সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে শাসক এ শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ (দ্বিতীয় অংশ)

'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ যেমন লেখকের প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, দ্বিতীয়াংশ তদ্রূপ নয়। আসলে প্রথম অংশেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার যে প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়াংশে সে প্রয়োজন যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রথমাংশে শূদ্রজগরণের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর দ্বিতীয়াংশে শূদ্রজাগরণের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকাটিই লেখকের দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। আবার, এই ইংরেজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে যে পথে চারণা করেছেন, সমস্যার পটভূমিকাটি অভিন্ন বলে, বিবেকানন্দও মোটামুটি সেই পথে গিয়েছেন। সকলেই ইংরেজের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তাকে দেখেছেন : একটি ভালোর দিক, ভারতবাসী যার ফলে নানাভাবে উন্নত হবার সুযোগ পেয়েছে। অপরটি ইংরেজের দোষ-দুর্বলতার দিক। শূদ্র-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র তুলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে তোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের যে রাজনৈতিক সামাজিক সুযোগ সুবিধের কথা তুলেছেন, আধুনিক ভারতে ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক-সামাজিক সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্রাচীন ভারতীয়

১. রোমক সম্রাট সীজার

শূদ্র আর আধুনিক ভারতের শূদ্রগণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণই ছল ইংরেজবৎ। কাজেই তখন শূদ্রগণ অত্যাচারিত হত ব্রাহ্মণের দ্বারা, আধুনিক ভারতে ইংরেজের দ্বারা। কিন্তু শূদ্রের উন্নতির বা জাগরণের কোনো পথ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেননি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেকানন্দ যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ তিনজনেই ইংরজেরে সহযোগিতার প্রশ্নটি তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজের 'গৌরব রক্ষা', প্রভৃতি কারণে ইংরজে ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর্ম করতে রাজি নয়। শূদ্রের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের নিপীড়ণমূলক আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কবি-সুলভ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, যাকে নীচেও পশ্চাতে রাখা হয়, সেই উচ্চবর্ণকে 'পশ্চাতে টানিছে'। বিবেকানন্দ সেখানে ইতিহাসের নজির উত্থাপন করে বলেন, সমগ্র বিশ্বেই আজ উচ্চবর্ণের ও শক্তিধর রাষ্ট্রের পতনের পালা এবং শূদ্রের উত্থানের যুগ চলছে। স্বাভাবিক কারণেই বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিকটিকে আশ্রয় করেছেন। অবশ্য, 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের 'শূদ্র জাগরণে'র প্রসঙ্গে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং তারই অন্তর্গত 'কবির দীক্ষা' রচনা দুটির উল্লেখ করে থাকেন। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করে রাখবার ফলে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে এবং রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে আসছে এবং এই সূত্রানুযায়ী এই বার শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে রচিত, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ আরো পরবর্তীকালীন চিন্তার অবকাশ পেয়েছেন। রথের চাকা আর্য শক্তির টানে না চলে অনার্য শক্তির টানে যেখানে চলতে শুরু করেছে সেখানে শূদ্র বা অনার্য শক্তির উল্লাসিত হবার কারণ নেই। কারণ, বিজয়লাভের পর তারাও যদি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তবে তাদেরও পতন অনিবার্য। 'কবির দীক্ষা'র সন্ন্যাসী কি বিবেকানন্দ? বিবেকানন্দ হোন বা না হোন রবীন্দ্রনাথের রাজাগণ 'রাজর্ষি', একাধারে রাজা ও ঋষি। এই ঋষিবৎ নিরাসক্ত চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রকল্পনায় 'রথের রশি'র 'রশি' শেষে মানববন্ধনে পরিণত হয়েছে—'এখন আর দেরী নয় ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্গো।' উচ্চ নীচ সকলের হাতে হাতে বন্ধন তৈরি করে কালের রথ চালনা করা। আর যদি তা না করা হয় তবে শূদ্রদেরও একদিন পরাভব স্বীকার করতে হবে।

৪.১২ সারাংশ-২

প্রবন্ধের প্রথম অংশে শূদ্রদের অবনতিরও অনুন্নতির কারণ নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন শূদ্রগণের জাতীয় কর্তব্য। আর, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে আছে, ভারতের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কর্তব্য কথা। ভারতের তৎকালীন শাসক বলতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগের পর ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতো এতো সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা আধুনিক ভারতে আর দেখা যায়নি। তবে, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার দোষ এবং গুণ—দুইই আছে। গুণের দিকটি এই : ব্রিটিশ জাতি যেন বৈশ্যজাতি, বৈশ্যের মতোই বেণে। তবে ব্রিটিশ-বানিয়া দেশ-বিদেশ থেকে কেবল ভোগ্যপণ্যই ভারতে নিয়ে আসেনি; সঙ্গে এনেছে দেশ-বিদেশের নানা ভাব-ভাবনা। শূদ্র-ভারতবাসী দেশ বিদেশে সেইসব ভাব-ভাবনায় ক্রমে ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কিছু দোষের দিকও আছে; এ শাসনব্যবস্থা এত দৃঢ় ও নিয়মবদ্ধ যে তা ভারতবাসীর চিন্তা শক্তিকে হ্রাস করে দিচ্ছে, জাতীয় জীবনে তাকে জড় করে রাখছে।

অতঃপর লেখক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র—এই দুই শাসনব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে দেখাচ্ছেন, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই প্রজার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়,—অন্তত ইতিহাসে সাক্ষ্য তাই। ইতিহাস থেকে লেখক তার দৃষ্টান্ত

সংকলন করেছেন। রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজা কোন প্রজাকেই সুবিধা দেন না, কাজেই বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সুযোগ পাবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই। প্রজাদের মনের মধ্যেও এজন্য কোন অসন্তোষ থাকে না। রাজার কৃপা অর্জনের জন্য প্রজাদের মধ্যেও কোন প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা থাকে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে বা প্রজা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের মধ্যে বহু পার্থক্য এসে পড়ে। প্রজারে স্ববশে রাখবার জন্য, শাসকগোষ্ঠী তাদের সব শক্তি শাসিতের কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তা নিয়োগ করে। এতে শক্তির অপচয় এবং অপব্যয় ঘটে। ইংরেজের শাসনপ্রণালীর বিশিষ্টতা ও দৃঢ়তা একদিকে শূদ্ররূপী ভারতবাসীকে জড়ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; অপরদিকে শাসকরূপে ইংরেজ তার আপন শক্তিকে নিজে গৌরব প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করছে।

আজ ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য নিজেদের মধ্যে যে সংশয়-বিতর্ক-বিদ্বেষের ভাব আছে, তাকে সরিয়ে ফেলে একত্র হওয়া। অন্যদিকে ইংরেজও আজ ভুল করছে : যে বীরত্ব, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে তারা একদিন ভারতবর্ষ জয় করেছে, তারা মনে করে, তাদের সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষা করে চললেই বুঝি এদেশে তা চিরস্মরণীয় হবে। তাদের সব শক্তি তাই আজ সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষার প্রতি নিয়োজিত। তাদের সেই শক্তিকে তারা যদি শূদ্র-ভারতের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত করত, তবে ভারত ও ব্রিটেন উভয় দেশেরই মঙ্গল হত। ফলে শূদ্র ভারতের জাগরণ ও উন্নতি ত্বরান্বিত হত।

৪.১৩ সাধারণ আলোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসামান্য মনীষা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও মোহহীন দৃষ্টি নিয়ে রচনা করেছেন 'বর্তমান ভারত' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ। এর প্রতিটি অংশে, প্রাচীন থেকে আধুনিক পৃথিবীর সামাজিক অগ্রগতির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। 'শূদ্র-জাগরণ' অংশে বর্ণ প্রসঙ্গ এলেও প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত, পীড়িত মানুষের উন্নয়ন বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। মানবকল্যাণে আত্মনিয়োজিত স্বামীজী কেবলমাত্র ভারতীয়দের কথা বলেন নি। সমগ্র বিশ্বের অনুন্নত মানুষের কথাই ভেবেছেন তিনি। তাঁদের জাগরণেই বিশ্বের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বহন করেন স্বামীজী। তাই এ নিবন্ধে অতীত ইতিহাস থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক ইওরোপ বা পাশ্চাত্যে ক্ষমতায়নের অন্যতম সূত্রগুলিও পরীক্ষা করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবহিত বিবেকানন্দ, পাশ্চাত্যের শাসন ব্যবস্থা, সমাজ বিন্যাস এবং কর্মপ্রসারের ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচনা ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাফল্যের পিছনে কায়িক শ্রম দিয়েছে শূদ্ররাই। অথচ তাঁদের বিদ্যালাভ বা শক্তিলাভের অধিকার নেই। রামায়ণে শম্বুক বেদপাঠের অপরাধে, মহাভারতে একলব্য অস্ত্রশিক্ষা আয়ত্তের দোষে চরম শাস্তি পায়। এই অবমানিত গোষ্ঠীর কতটুকু উন্নতি হয়েছে, এই প্রশ্ন নিয়ে রচনাটি অগ্রসর হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বক্তব্যের গতি ভিন্নমুখে চালিত হয়েছে। লেখকের মতে আধুনিক কালে বর্ণ নিরূপিত হয় ক্ষমতা দিয়ে। ইংরেজ প্রায় বিশ্বব্যাপী হয় ক্ষমতা দিয়ে। ইংরেজ প্রায় বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়ায়, নিজেদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য — তিনটি বর্ণেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

তিরস্কারের ভাষায় লেখক শূদ্রদের সমালোচনা করে বলেছেন তাঁদের উদ্যমহীনতার কথা। স্বজাতি বিদ্বেষ ও ক্ষুদ্রতার চর্চায় যাঁদের দিন কেটে যাচ্ছে — প্রকৃত শিক্ষা ও কর্মোদ্যোগে যুক্ত হওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই। এই পর্বে তিনি পরাধীন ভারতকে 'শূদ্র' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অধিকার বঞ্চিত, ক্ষমতা শূন্য মানুষই 'শূদ্র'।

প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন ইতিহাসের অমোঘ গতিতে কোন মহাপরাক্রম জাতির পতন ঘটছে। তার ফলে কয়েকটি দুর্বল জাতির উত্থান সম্ভব হচ্ছে। এজন্য সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সাধারণ মানুষের সচেতন সক্রিয়তা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। 'শূদ্র' বা ক্ষমতাহীনের উত্থান ঘটলেও তা সর্বদা সামগ্রিক উন্নতির মধ্যে গৃহীত হয়। তার ফলে শূদ্রের আত্মবিশ্বাস ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার আপন সমাজ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই বৃহত্তর শূদ্র সমাজের কোনো যথার্থ উপকার হয় না।

প্রজাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র এগিয়ে চলে। কিন্তু অধিকাংশ শাসন ব্যবস্থাই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই শাসন বিধির চক্রে রাজা প্রজার দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজতন্ত্রের ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু কোনো পদ্ধতিই ত্রুটিহীন নয়। শূদ্রদের উন্নতিসাধন জরুরী কিন্তু তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যও রক্ষা করে চলতে হবে।

নিবন্ধের শেষাংশে ইংরেজ শাসনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁদের ব্রজ্রকঠিন নীতি নিয়ম, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, ভারতবাসী ও ইংরেজ — উভয়েরই ক্ষতিসাধন করছে। এক্ষেত্রে 'শূদ্র' ভারতবাসীকে 'ব্রাহ্মণ' ইংরেজ পদদলিত করে চলেছে। বিবেকানন্দ এই পদ্ধতিকে তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছেন 'হাস্য ও করুণরস' জাগ্রত হয়। তাঁর এই বিশ্লেষণ আমাদের স্মরণে আনে বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তি — 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে রাখিবে যে নীচে/পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' সমসাময়িক দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ প্রায় একই দিকে প্রবাহিত।

বিবেকানন্দের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও সমকালে রবীন্দ্রনাথ, ইংরাজ শাসনের সঙ্গে ভারতবাসীর উন্নতি প্রসঙ্গ বিষয়ক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর মতাদর্শ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁদের মতৈক্য লক্ষণীয়। উভয়েই মনে করেন স্বদেশবাসীকে সচেতন হতে হবে এবংশাসক ইংরেজকে সম্মানজনক আচরণ শিখতে হবে। আংশিক ভাবে তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। ভারতবর্ষ আজও সততার সঙ্গে বর্ণবিভাজন মুছে ফেলতে চায়নি, দরিদ্র মানুষকে সমকক্ষতা দিতে পারেনি। অন্যপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী, ক্ষমতালোভী শক্তি আরও পীড়নের মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই সন্ন্যাসীর মন্ত্র বা ঋষিবাক্য পূর্ণ সার্থকতা পায়নি।

৪.১৪ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

সমাজ ও জাগতিক জীবনের উন্নতিই একটি রাষ্ট্রকে ক্রমশ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে — সন্ন্যাসী দার্শনিকের এই উপলব্ধিই শূদ্র-জাগরণ জাতীয় রচনার প্রেরণা। পতিত, ক্ষমতাহীনের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন স্বামীজী। শূদ্র জাতির অস্তিত্ব তাঁদের প্রতি উচ্চবর্ণের আচরণ; শোষণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিবরণের পাশাপাশি আধুনিক পৃথিবীর সামাজিক বিন্যাস ও শক্তিদম্ভের উৎসগুলি নির্দেশ করেছেন। এই ব্যাখ্যা থেকে বিবেকানন্দের বহুপঠন, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানের সমাজ ও রাজনীতির কথা বিচার করে বর্ণবিভাজনের যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। যুক্তি পরম্পরা ও উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন অর্থ, বিদ্যা ও শক্তির প্রসাদে যে কোনো মানুষই 'ব্রাহ্মণত্ব' লাভ করতে সক্ষম। অর্থাৎ চতুর্বর্ণের সংজ্ঞানুসারে 'শূদ্রত্ব' আর জন্মগত চিহ্ন নয়। এই আধুনিক বিশ্লেষণ অবশ্যই সমাজবিদ্যার অন্যান্য সূত্র সত্রজাত। ভারতবর্ষের মত ঐতিহ্যলালিত দেশে বর্ণবিভাজন সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়া সম্ভব নয় — একথা লেখকও জানতেন। আন্তর্জাতিক ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার প্রেক্ষিতে তিনি 'শূদ্রত্ব' বিষয়টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

নিবন্ধের বক্তব্য স্পষ্ট ও একমুখিন। তবে কখনও কখনও তা পরস্পরবিরোধিতায় দুষ্ট। শূদ্রের উন্নতি প্রয়োজন অথচ উন্নত শদ্র নিজের গোষ্ঠীবিচ্যুত হয়ে যায়, আপনজনদের সঙ্গে তার পার্থক্য ঘটে — স্বামীজীর এই পর্যবেক্ষণ নর্ভুল। কিন্তু তাহলে কি শূদ্র ব্যক্তিমাত্রেই উন্নতি থেকে দূরেই থাকবেন? প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্র ভাল — ধারণাগত ভাবে এই কথার সমর্থন করা গেলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। একদিকে স্বামীজী দৃঢ়বদ্ধ ব্রিটিশ শাসনকে মৌর্যযুগের পর ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছে, অন্যদিকে তার বিধিবদ্ধতাকে ভারতবাসীর পক্ষে অমঙ্গলজনক বলে নিন্দা করেছেন। দুটি বক্তব্যই আংশিক ভাবে সত্য।

প্রবন্ধটির ভাষা ও উপস্থাপনা রীতি অতি উন্নত। লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা প্রভৃতি রচনাতেও নানাভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কথা বলা হয়েছে। 'চণ্ডাল', 'মূর্খ', 'দরিদ্র' ভারতীয় ভ্রাতার কথা যে আন্তরিকতার সঙ্গে ভেবেছেন তা সত্যই দুর্লভ। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা নানাভাবে দরিদ্র সমাজের পাশে দাঁড়ান। স্বামীজীর সেই জাতীয় চিন্তা ও মনন বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে — 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে'র প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ। কিন্তু সেই কর্মোদ্যোগের দার্শনিক ও ভাবগত ভিত্তি রচনা করেছেন প্রবন্ধ গ্রন্থের মাধ্যমে। 'বর্তমান ভারত' তারই নিদর্শন। কর্মবীর স্বামীজীর দৃঢ় চিন্তা ও কর্মের দিশা 'শূদ্র-জাগরণ' নিবন্ধে নিহিত। দার্শকিের দূরদৃষ্টি, ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সহজাত হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ স্বামীজীর রচনাকে অতুলনীয় করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভাষা ও বাক্যগঠন, বিশেষত সমাসবদ্ধ শব্দ ও বাক্যের অন্বয় কিঞ্চিৎ দুরূহ মনে হয়। কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব অনুসারে এই পদ্ধতিই নির্বাচন করেছেন লেখক। অন্যথায়, তাঁর বহু চলিত ভাষার রচনা পড়লে বোঝা যায়, বাংলাভাষায় বক্তব্য পড়লে বোঝা যায়, বাংলাভাষায় বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণ করে নিয়েছেন। সে ভাষা জীবন্ত, অর্থপ্রসারী, প্রাণবান। শূদ্র-জাগরণের ক্ষেত্রেও সে ভাষা প্রয়োগ করতে পারতেন লেখক। কিন্তু নিবন্ধটির ভাব ও দর্শন চলিত ভাষার উপযোগী নয়। তাই স্বামীজী প্রয়োগ করেছেন দৃঢ়বদ্ধ সংস্কৃত কাঠামোর সাধু গদ্য।

ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতির নব্য অভিমুখ মিলিয়ে দিয়ে, 'শূদ্রত্ব' বিয়েটিকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন বিবেকানন্দ। একই সঙ্গে প্রাচীন ধারণা ও নবীন মতাদর্শ উপস্থাপিত করে নতুন চিন্তাক্ষেত্র খুলে দিয়েছেন। নিবন্ধটির মধ্যে তথ্য ও আবেগ সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত দর্শন, উন্নতিকামী ভারতবাসীর পথ নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচ্য।

৪.১৫ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

১। স্বামী বিবেকানন্দকে কেন 'কর্মবীর' বলা হয়?

২। কোন্ কোন্ দৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য রচিত?

৩। 'শূদ্র' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন?

৪। শূদ্র-জাগরণের প্রাক্কালে শূদ্রদের কর্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজির নির্দেশ ব্যক্ত করুন।

৫। তাঁর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৬। বিশ্ব ধর্মমহাসভা ক'দিন চলেছিল?

৭। কে তাঁকে 'শক্তিধর পুরুষ' বলেছিলেন?

৮। বিবেকানন্দের রচনাবলী কোন্ কোন্ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়?

৯। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

১০। কথ্য বাংলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য বলুন।

১১। ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থার গুণের ব্যবস্থার দিকটি কী?

১২। ইংরেজকে 'বৈশ্য' কেন বলা হয়েছে?

১৩। কেন ব্রিটিশ-শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীর মনে ইংরেজ জাতির 'গৌরব'কে সদাই জাগিয়ে রাখতে চায়?

১৪। 'যেন তেন প্রকারেণ'—এই বাগধারাটি আলোচ্য প্রসঙ্গে কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন :

১। বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি তুলে ধরুন।

২। বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে দু-কথা বলুন।

৩। বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার বিশেষত্ব কী?

৪। তাঁর মতে খাঁটি সংস্কারক কে?

৫। 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধটির গদ্য শৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৬। 'বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

৭। রাজতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দোষ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গটির অবতারণার কারণ কী?

৮। শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সহজ কথায় বিশ্লেষণ করুন।

৯। 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। স্বামী বিবেকানন্দ : 'বর্তমান ভারত'।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কালান্তর'। 'সভ্যতার সংকট'। 'রথের রশি'। 'কবির দীক্ষা'।

৩। অধীর দে : 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা'?

৪। পত্রপত্রিকা : 'কোরক' বিবেকানন্দ সংখ্যা ২০১৩।

একক - ৫ ❑ তরুণের স্বপ্ন : সুভাষচন্দ্র বসু

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ প্রাথমিক পরিচয়
৫.৪ মূল বিষয় ও তথ্যাদি
৫.৫ মূলপাঠ
৫.৬ সাধারণ আলোচনা
৫.৭ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
৫.৮ অনুশীলনী
৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাবন্ধিক সত্তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৫.২ প্রস্তাবনা

প্রবন্ধের মূল পাঠের পাশাপাশি প্রবন্ধে-উল্লিখিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের তাৎপর্য বিশ্লেষণে আলোচ্য এককটি সর্জ্জিত।

৫.৩ প্রাথমিক পরিচয়

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁর অসামান্য মেধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কর্মপদ্ধতি, আত্মবিসর্জন — সবই তুলনারহিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কটক শহরে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই রাজনীতি সচেতন সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় শিক্ষক ওটেনের ভারতবিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ করে কলেজ থেকে। বিতাড়িত হন। স্যর আশুতোষের হস্তক্ষেপে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে বি.এ পাশ করেন। পিতা জানকীনাথ বসুর আদেশে বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভস পরীক্ষায় বসেন ও চতর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইংরেজের চাকরি প্রত্যাখ্যান করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন সুভাষচন্দ্র। শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতিমূর্ত্তি সুভাষ স্বাধীনতার জন্য 'আবেদন-নিবেদন' পদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসে যোগদান করলেও গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটে।

১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার শাসকবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে। অতঃপর অনশন এর মাধ্যমে মুক্তির দাবি করেন নেতাজী। ইংরেজ সরকার বিবেচনা করে এবং সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বাড়িতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। আফগানিস্তান থেকে মস্কো হয়ে জার্মানী পৌঁছান। এরপর অশেষ শ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে ভারতের দিকে

অগ্রসর হন। দুঃখের বিষয়, এর পূর্বে ১৯৪২ সালে রাসবিহারী বসু ও মোহন সিং এই সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। কিন্তু জাপানের সহায়তা না দাওয়ায় তখনকার মত আজাদ হিন্দ বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরপর সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু তাঁকেই এই দায়িত্ব সমর্পণ করেন। সুভাষচন্দ্র সঠিক লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চাইলেও নানা কারণে ব্যাহত হন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫-এ এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে সম্ভবত তাঁর মৃত্যু হয়। আজীবন দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। নেতাজীর স্বাধীনতাকামী শেষ কর্মোদ্যোগ তেমন ফলপ্রসূ না হলেও তার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিপুল কর্মযজ্ঞের মাঝেও সুচিন্তিত নিবন্ধ, প্রবন্ধ আত্মজীবনী, ইতিহাস ও পত্রাবলী রচনা করেছিলেন নেতাজী। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও বিবিধ লেখার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭-২৮ থেকে। বেতার ও সভা সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণও পরবর্তী কালে সঙ্কলিত হয়েছিল। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম—

১. তরুণের স্বপ্ন — (১৯২৮)

২. নূতনের সন্ধান — (১৯৩০)

৩. The Indian Struggle (1920-1942) Part-I (১৯৩৫)

৪. The Indian Stuggle Part-II (১৯৪৬)

৫. On to Delhi (Writing & SPeeches) (১৯৪৬)

৬. An Indian Pilgrim An unfinished Autobiography (১৯৪৮)

ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সৃজনী শক্তি, ইতিহাসবোধ কল্পনার বিস্তার এবং মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে।

৫.৪ মূল বিষয় ও তথ্যাদি

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ প্রস্তুত করেছিলেন তাই-ই 'তরুণের স্বপ্ন' নামে অধিবেশনের আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ একই নামের গ্রন্থের ভূমিকায় সাংবাদিক ও সুভাষচন্দ্রের সহযোগী গোপাললাল সান্যাল এই তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধটির শেষে ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ তারিখট মুদ্রিত আছে। অর্থাৎ ১৯২৩ সালে লিখিত নিবন্ধটি ১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনে ব্যহার করেছিলেন নেতাজী।

নিবন্ধের মূল বক্তব্য তরুণদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে এই উদ্দীপনাপূর্ণ রচনা একটি সম্পদ স্বরূপ। যৌবনের পূর্ণ শক্তিকে আহ্বান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যুবসমাজ আনন্দ ও সৃজনের সাধনা। যৌবনের ধর্মই উদারতা উদ্বেলতা। তার শুভচেতনা সমস্ত নৈরাশ্য ও অন্ধকারকে জয় করে নতুন দিনের আলোককে প্রতিষ্ঠিত করবে। তরুণ জীবনের সাহস, তেজ ও উৎসাহে স্তিমিত সমাজ নতুন আত্মবিশ্বাসে প্রাণিত হবে।

যৌবনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে লেখক বলেছেন জড়ের মধ্যে চঞ্চলতা, প্রাচীনের মধ্যে নবীনতা, পুরাতনের মধ্যে নতুনের সন্ধান করতে পারে তরুণ সমাজ। তারা ভুল করলেও নতুন চিন্তার জন্ম হয়। তারুণ্যের ধর্ম হল উদারতা, উন্মাদনা, মুক্তির উদ্দাম ডাকে সাড়া দেওয়া। পার্থিব লাভালাভ তারুণ্যকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। রবীন্দ্র

কবিতা উদ্ধৃত করে লেখক জানিয়েছেন তারুণ্যের মধ্যেই আছে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত সমাজের সম্ভার। তাই দেশে দেশে কালে কালে তরুণসমাজ ঘটিয়েছে বিপ্লব বিদ্রোহ। সৃষ্টি করেছে শিলাশোভা, নির্মাণ করেছে নতুন সমাজ, ধ্বংস করেছে অমঙ্গল ও অত্যাচার।

ভারতবর্ষের তরুণ সমাজের লেখক উদার আবাহন বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রাচীন থেকে আধুনিক সভ্যতার ধারাবাহিক উল্লেখ করে তারুণ্যের শক্তি সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন। যৌবনের দৃপ্ত রূপ, পূর্ণাঙ্গ শক্তি নিয়ে বিকশিত হলে সব বাধা দূরীভূত হতে পারে। ভারতবর্ষে এবং বিশ্বে। যেখানে জড়তা ও শীতলতা সমাজকে স্থবির করে রেখেছে, সেখানেই আজ তারুণ্যের অন্তহীন স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই নতুন বিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব হবে। যৌবনের হাত ধরেই বার্ধক্যের মুক্তি ঘটবে—এই আশা ব্যক্ত করেছেন লেখক সুভাষচন্দ্র বসু।

৫.৫ মূলপাঠ : তরুণের স্বপ্ন

আমরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি। সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্যে বিচরণ করিব নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বান ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ,
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্বতরাজী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদের আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে—সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে, কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders" অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব! যৌবন সর্বকালে সর্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা—সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণাই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা, হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী! জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সহায্যে আমরা কি নি না করিয়াছি—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, সুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি।এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনেরে রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ

যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত কবিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

৫.৬ সাধারণ আলোচনা

আলোচ্য নিবন্ধটির মধ্যে ভাব ও ভাষার অপূর্ব সম্মেলন লক্ষণীয়। নেতাজী তাঁর পূর্ণ যৌবশক্তিতে উপনীত হয়ে অনুভব করেছিলেন তারুণ্যের শক্তি ও সামর্থ্য। প্রবন্ধের সূচনা থেকেই অতি সুন্দর, উদ্দীপক এক বার্তা দিয়েছেন লেখক। পরাধীন ভারতের স্থবিরতা কাটিয়ে নব্যজীবনের আবাহন শোনাতে পারে তরুণ দল। তারুণ্য তার 'সবুজ' ও 'কাঁচা' মন নিয়ে 'আধমরা'দের বাঁচিয়ে তোলার শক্তি রাখে — রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব মনে রেখে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস অন্ধকার থেকে আলোকে, নৈরাশ্য থেকে আশায় নিয়ে যেতে পারে তরুণ সমাজ।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় স্তরে লেখক জানিয়েছেন যৌবনের ধর্ম কিঞ্চিৎ সৃষ্টিছাড়া ও শৃঙ্খলাহীন পথে প্রবৃত্ত করলেও শেষাবধি তা নতুন পথ নির্মাণ করে, মুক্তির দরজা খুলে দেয়। ব্যাবিলনের অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, ফ্রান্স প্রভৃতি সভ্যতার উদাহরণ দিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছেন তরুণদের হাত ধরেই এই সভ্যতাগুলি বিবর্তনের পথ খুঁজে পেয়েছে। সৃষ্টির মহামন্ত্র নিয়ে জাগ্রত তারুণ্যের জয়গান করেছেন লেখক। সমকালীন যুব সমাজকে প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। নিরন্তর কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত হবার প্রেরণা জাগরুক রাখতে হবে।

নিবন্ধটির মধ্যে লেখকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করা যায়। নিজের অফুরন্ত কর্মশক্তি ও সৃজনক্ষমতাকে দেশের কাজে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যবহার করেছিলেন নেতাজী। আপন ভূমিকাকে যুবসমাজের সামনে তুলে ধরে তাদের কর্মে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছেন তিনি, কিন্তু কোনোভাবেই আত্মপ্রচার করেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রাচীন সভ্যতার উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত। কৌশলে তিনি জানিয়েছেন পরাধীন ভারতের উদ্ধারে তরুণ সমাজের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। 'স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা' — এই কথা বলে ইঙ্গিতে তিনি পরাধীনতার যন্ত্রণাকে সূচিত করেছেন। রাজনৈতিক কারণে স্পষ্টভাবে কিছু না বলেও তিনি স্বদেশের জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন যৌবনমন্ত্রে।

নেতাজী শৈশবকাল থেকেই রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচিত। তাঁর স্বদেশ প্রেম স্বাধীন চিন্তানুসারী। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাঁদের মতাদর্শ মানতে পারেন নি — ফরওয়ার্ড ব্লক নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৯ সালে। অনেক আগে থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচী জন্য তরুণ ও তাজা রক্তের সন্ধান শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম-দীর্ঘসূত্র পরিকল্পনা। নতুন দল গঠন করে, নব্যচিন্তক ও কর্মীদের মাধ্যমে স্বাধীনতা ত্বারান্বিত করতে হবে — এই-ই ছিল নেতাজীর প্রধান উদ্দেশ্য। 'তরুণের স্বপ্ন' নিবন্ধে সেই পরিকল্পনার দার্শনিক ও ভাবগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। উপমা, রূপক ও অন্যান্য অলঙ্কার সংযোজন করে নেতাজী এই রচনার অন্তর্নিহিত আবেগ ও উপলব্ধি যথাযথ রক্ষা করেছেন।

৫.৭ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাংলার ও সারা ভারতের গৌরব। কর্মময় জীবনে, সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু মেধাবী ও সাহিত্যপ্রেমী সুভাষচন্দ্র যখনই রচনা করেছেন প্রবন্ধ, পত্র বা ভাষণ — তাঁর অতুলনীয় ভাষাশৈলী, যুক্তিবোধ, দৃঢ়তা, মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যের প্রাথমিক গুণগুলি তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। কঠিন, কঠোর কর্তব্যে জড়িত থেকেও ভাষার প্রসাদগুণ ও ভাবপ্রকাশক দক্ষতা থেকে বিচ্যুত হননি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও মননশীল চিন্তন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়। 'গোড়ার কথা' নামক নিবন্ধে নেতাজী লিখছেন — 'মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে মিললেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রুপ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও জাতির শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতার ধারাই তার আত্মা;' — এই যুক্তি ও ভাষাশিল্প তাঁর বহু পঠন এবং নিজস্ব চিন্তনের মিলিত ফল।

'তরুণের স্বপ্ন' এক অপূর্ব আশাবাদ ও ইতিবাচক ভাবনার নিদর্শন। সাধু ও চলিত দুটি রূপেই সুভাষচন্দ্র স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে সে নিদর্শন আছে। বর্তমান প্রবন্ধটির ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য (সাগরাভিমুখে, প্রেমাশ্রুরূপী) না থাকলেও তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং বাক্যগঠনের পদ্ধতি দেখে এ কথা মনে হয়। 'আমরা' শব্দটি তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তম পুরুষ বহুবচনের প্রয়োগে যেন কর্তব্যপরায়ণ যুবকদলের উপস্থিতি অনুভব করেন পাঠক। 'আনন্দমঠে'র সন্তানদল কিংবা 'গোরা' উপন্যাসের দর্শন যেন পরোক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে।

মনুষ্য জীবন কেবল উপভোগের জন্য নয়। বিশেষত যৌবনস মহৎ কর্মের উপযুক্ত সময়। নেতাজীর স্বল্পায়ু জীবনে, বিপুল কর্মের আয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে বিস্ময়কর। কিন্তু মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে লব্ধ শিক্ষা সর্বদাই গ্রহণ করা উচিত। সামর্থ্য অনুসারে কর্ম করলেও দেশ ও সমাজের অগ্রগতি সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই নেতাজী সাধারণ যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রকাশিত রচনাটির তাৎপর্য বিশেষ গভীর। একদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেষিতে তরুণদলকে আহ্বান জানানো প্রয়োজন — এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারুণ্যের গুণগান করা হয়েছে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তরুণ সমাজের ভূমিকা স্মরণ করেছেন লেখক। আলেকজান্ডার, চন্দ্রগুপ্ত কিংবা প্রাগৈতিহাসিক রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা — সকলেই তারুণ্যের ধজা উড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আত্মত্যাগ, মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদি জয় করে তরুণরা স্থাপন করে কীর্তি। ফরাসী বা রুশ বিপ্লব এর ব্যতিক্রম নয়। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ যুক্তিযুদ্ধ বা চীনের ছাত্র আন্দোলনে তারুণ্যের শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

সমগ্র রচনাটিতে যৌবনের জয়বাণী ঘোষিত হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রে তারুণ্যদীপ্ত নেতৃত্ব পরাধীন ভারতের সামনে নতুন পথ খুলে দিয়েছিল। স্বপ্ন সর্বদাই বাস্তবকে অতিক্রম করে। তরুণদের কর্মদক্ষতা যেমনই হোক না কেন স্বপ্ন হবে বৃহৎ ও উচ্চশিখরস্পর্শী। মানবজীবনের শ্রেষং সময় যৌবন। এই সময়েই ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার বদলে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করার প্রেরণা আসে। সেই প্রেরণাকে অবলম্বন করে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ স্থির করতে চেয়েছেন।

আবেগ, উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, স্বর্ণালী ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশা — সব মিশে গেছে 'তরুণের স্বপ্ন' নিবন্ধে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়রা অর্ধবিকশিত। তাঁদের অকালবার্ধক্য, স্বার্থরক্ষার তৎপরতা, ঝুঁকি না নেবার প্রবণতা ভারতবর্ষকে আরো

অযোগ্য করে তুলেছে। রাজনীতিতে তখনও নবীন সুভাষচন্দ্র কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে ভারতের মূল ব্যাধি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। জাতীয় নেতৃত্বের অতি পরিণত বুদ্ধি ও হিসেবী সিদ্ধান্তের বদলে তরুণদের হঠকারী, আবেগজনিত আত্মধ্বংসী কর্মও অধিক মূল্যবান। কারণ এরই ফলে নতুন দিশা খুলে যায় — স্থাবর, অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে মুক্তধারা।

নেতাজীর বাংলা রচনার অন্যতম এই নিবন্ধটি। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'দেশের ডাক' 'গোড়ার কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তরুণের স্বপ্ন' নিবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনা। 'Dreams of Youth' নামে লেখাটি অনূদিত হয় ১৮৪৯ সালে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আড়ালে যে স্বপ্নদর্শী, কল্পনাসমৃদ্ধ, রোমান্টিক মনের অধিকারী ছিলেন সুভাষ। তার পরিচয় যায় মূল রচনা ও অনুবাদে। রচনার বহিরঙ্গে লঘু উদ্দীপনা লক্ষ্য করাযায়, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেই লঘুতাকে অতিক্রম করে গভীর সঞ্চারী হয়েছে। 'এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দসাগরের বান ডাকিয়া আনিব। ... আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ — সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ।' এ ভাষা, এই প্রকাশভঙ্গি খাঁটি সাহিত্যের নিদর্শন। তাই রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করেও 'তরুণের স্বপ্ন' নিবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে।

মডিউল-১

একক-১-৫

৫.৮ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

ক বিভাগ

১. 'গীতের যে উদ্দেশ্য যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য'। — গীতের উদ্দেশ্য কী? উপরোক্ত সংজ্ঞাটি সমর্থনযোগ্য কি না যুক্তিসহ বিচার করো।

২. 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও গীতিকাব্য রচনার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তব্য' ও 'অব্যক্তব্য' — এই দুই-এর ভূমিকা আলোচনা করেছেন। লেখকের অনুসরণে এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করো।

৩. 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসন বিষয়ে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় দাও। লেখকের এই ক্ষোভ যথাযথ কি না — বিচার করো।

৪. 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণী বিচারশক্তি ও মর্মবেদনার অপরূপ প্রকাশ। —আলোচনা করো।

৫. 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লেখো।

৬. 'আকর্ষণ ও চাপ উভয়েই যুগপৎ কাজ করে।' — রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে উপরোক্ত মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৭. 'শূদ্র' শব্দটি স্বামী বিবেকানন্দ কোন কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন? শূদ্রজাতির উন্নতির জন্য কোন পথ অবলম্বন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন?

৮. 'এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়' — শূদ্র জাগরণ প্রবন্ধের এই মন্তব্যটি প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা করো।

৯. 'এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ সাগরের বান ডাকিয়া আনিব। —'আমরা' বলতে লেখক কাদের বুঝিয়েছেন? তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, লেখকের অনুসরণে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

১০. 'এই যে তরুণে আন্দোলন — এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী' — 'তরুণের স্বপ্ন' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

খ বিভাগ

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো / সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ইওরোপে গীতিকাব্য কোন নামে খ্যাত?

ক. সনেট খ. লিরিক গ. এপিক ঘ. ব্যালাড। (খ)

২. ভবভূতি রচিত একটি নাটক হল— / একটি নাটকের নাম লেখো

ক. মৃচ্ছকটিক খ. মালবিকাগ্নিমিত্রম গ. উত্তররামচরিত ঘ. রত্নাবলী (গ)

৩. সভ্যতার সংকট কত সালে রচিত হয়েছে?

ক. ১৯৪১ খ. ১৯৩৯ গ. ১৯৩৫ ঘ. ১৯৪০ (ক)

৪. '... এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে — এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। — কেমন রাষ্ট্রশক্তির কথা বলা হয়েছে?

ক. যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা

খ. জাপানকে পরাজিত করার শক্তি

গ. প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জনের সম্ভাবনা

ঘ. বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা (ঘ)

৫. 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

ক. জিজ্ঞাসা খ. নবজীবন গ. বিজ্ঞান রহস্য ঘ. অব্যক্ত (ক)

৬. মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন?

ক. লুই পাস্তুর খ. নিউটন গ. আর্কিমিডিস ঘ. স্প্যানালজিনি (খ)

৭. বিবেকানন্দের মতে শক্তির আধার হল— / শক্তির আধার কী?

ক. ধন খ. বিদ্যা গ. প্রজাপুঞ্জ ঘ. অর্থ (গ)

৮. ভারতভূমি ও ইংলন্ডের প্রধান —

শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক. পণ্যবীথিকা খ. বিলাস ক্ষেত্র গ. ধর্মক্ষেত্র ঘ. শাসনস্থল (ক)

৯. 'তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—'

—তটিনী শব্দের অর্থ কী?

ক. সর্প খ. অগ্নি গ. নদী ঘ. হরিণী (গ)

১০. 'যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে—

আমাদের সহায় হয়। —শূন্যস্থান পূরণ করো।

ক. মস্তিষ্ক ও বাহু খ. বাহু ও শক্তি গ. কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধি ঘ. বাহু ও বুদ্ধি (ঘ)

৫.৯ সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

'বঙ্কিম-মানস' —অরবিন্দ পোদ্দার — পুস্তক বিপনী

'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' — ভবতোষ দত্ত — দে'জ পাবলিশার্স

'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' — সুকুমার সেন — আনন্দ পাবলিশার্স

'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব' — বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় — দে'জ পাবলিশার্স

'রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলী' — পবিত্র সরকার

'রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথা' — আশুতোষ বাজপেয়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সনস

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' — স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সপা.) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচার

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১ম-৮ম খণ্ড)' — উদ্বোধন কার্যালয়

'তরুণের স্বপ্ন (গ্রন্থ)' — সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ পাবলিশার্স

'আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৪৭), দ্বিতীয় খণ্ড,' প্রণব চট্টোপাধ্যায় — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদে।

'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, এক ঐতিহাসিক কিংবদন্তী'—নিমাইসাধন বসু, আনন্দ পাবলিশার্স।

মডিউল ২

প্রবন্ধ

৬.২ মডিউলটি পাঠের উদ্দেশ্য

এই মডিউলের উদ্দেশ্য বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো। এই মডিউলের প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে অভিনব। বাংলা প্রবন্ধ বিষয়ক এই কোর্সে আমরা বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই মডিউলে চারটি সুনির্দিষ্ট প্রবন্ধ আমরা পাঠ করব। প্রবন্ধগুলি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাবন্ধিকদের রচনা ও বক্তব্যের নিরিখে একটা মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টাও নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট প্রবন্ধগুলিও পড়বেন। প্রতিটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার এখানে প্রদত্ত হয়েছে, এর থেকে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে। প্রাবন্ধিকদের জীবন পরিচয় সূত্রে প্রবন্ধগ্রন্থগুলিও উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ-পাঠের জন্য সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে রয়েছে বিশ্লেষণাত্মক পাঠ ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় যা শিক্ষার্থীকে ওই প্রবন্ধের মুল বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

একদিকে যেমন মাতৃভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার সম্পর্ক উঠে এসেছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাধক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধটি থেকে, তেমনই বিনয় ঘোষের 'সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব' প্রবন্ধে পাওয়া যাবে সাংস্কৃতিক কৃতির তন্বিষ্ঠ বিশ্লেষণ। অন্যদিকে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অন্নদাশংকর রায়ের 'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' একটি বহুল পঠিত, চর্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুটি থেকে সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, ভাষা ও ধর্ম কিভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত—সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞাত হতে পারবে। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন আধুনিক কবির কলমে তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার ইতিহাস উঠে এসেছে। বৈজ্ঞানিক নিজে যখন প্রাবন্ধিক হন, তখন সেই প্রবন্ধের ভাষা ও বয়ানের মধ্যে নতুন কী কী দিক ধরা পড়ে, তা জানা যাবে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কলম থেকে। প্রতিটি প্রবন্ধই এক অর্থে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট হয়ে আছে। আমরা এই মডিউলে সেগুলি পাঠের সূত্র ধরে বাংলা প্রবন্ধের সমর্থ ক্ষেত্রটির প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেব, যাতে শিক্ষার্থীরা এঁদের লেখালিখি ও বক্তব্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

একক : ৬ ❑ শিক্ষা ও বিজ্ঞান : সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ লেখক পরিচিতি
৬.৪ মূলপাঠ : শিক্ষা ও বিজ্ঞান — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৬.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ
৬.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ
৬.৬.১ প্রাবন্ধিকের মত অনুসারে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার মূল সমস্যাগুলি কী?
৬.৬.২ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধানের কী কী পথ দেখিয়েছেন?
৬.৬.৩ জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতির কারণ কী?
৬.৬.৪ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান সমস্যা কী? কোন পথে সমাধান সম্ভব?
৬.৬.৫ বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে
৬.৬.৬ আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে
৬.৬.৭ ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রসঙ্গ
৬.৭ অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানি সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। তাঁর লেখা ও পাঠ্যসূচির অন্তর্গত 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধটির মূলপাঠ ও বিশ্লেষনাত্মক পাঠের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হতে পারবেন। একজন বৈজ্ঞানিকের বাংলা প্রবন্ধ পাঠের ফলে শিক্ষার্থী যেমন সহজভাবে বুঝতে পারবেন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত, অন্যদিকে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাবনা জানা যাবে।

৬.২ প্রস্তাবনা

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল পাঠ, ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার মূল সমস্যা, সমাধান, জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতির কারণ, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রসঙ্গে বর্তমান এককটি সজ্জিত।

৬.৩ লেখক পরিচিতি

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালে এবং মৃত্যু ১৯৭৪ সালে। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চাকে যাঁরা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য।

তাঁর এবং আইনস্টাইনের মিলিত তত্ত্ব বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বে আজও আদৃত। তাঁর আবিষ্কৃত বোসন কণার ওপর গবেষণা করে অসংখ্য বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর অবদান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি সাহিত্য ও যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনাও তিনি করে গেছেন। খুব ভালো এস্রাজ বাজাতেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। সবুজপত্র, পরিচয় সহ একাধিক পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বিজ্ঞান পরিচয়', 'জ্ঞান বিজ্ঞান' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। পদ্মবিভূষণ, দেশিকোত্তম সহ একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রবন্ধের পাশাপাশি একাধিক ছোটগল্পের রচয়িতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক। ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে ভূষিত করেন।

৬.৪ মূলপাঠ : শিক্ষা ও বিজ্ঞান — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে—বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র পাঠানো হয় বছরে বছরে। এরা বিদেশে যায় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বিবিধ শাখায় জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু প্রায়ই এটা লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষানবিশদের সেই প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে যা থাকলে পরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত আধুনিক কর্মপদ্ধতি দ্রুত আয়ত্ত করা। সম্প্রতি আমেরিকা প্রত্যাগত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ জানিয়েছেন যে, আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালাতে বললে আমাদের ছেলেরা অনেক সময় খুবই ত্রস্ত বোধ করে প্রস্তুতির অভাবে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিটি পরীক্ষায়। কি বিপুল অপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের। অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, এই সব ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য আসলে আমরা ছাত্র-সমাজের যে উপাদান নিয়ে কাজ করি তার উৎকর্ষের জন্য আসলে আমরা ছাত্র-সমাজের যে উপাদান নিয়ে কাজ করি তার উৎকর্ষের নিজস্ব অভাবই দায়ী নয়। বরঞ্চ যথাযথ পরিচালনা ও সুযোগ লাভ করলে ভারতীয় ছাত্র সত্যই কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং সব দিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা দেখায়। আমার বোধ হয় সম ও প্রয়াসের এই অপচয় এড়ানো সম্ভব, একমাত্র যদি আমরা আমাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তা অপসারণের কাজে দৃঢ়ভাবে ব্রতী হই। কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না যে, ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কি-না। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করা সত্ত্বেও আমার এই মত দেশের সর্বত্র বাদানুবাদের উদ্রেক করেছে এবং অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজিকে বাদ দেওয়া দেশের প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল নয়। একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলে তার ফলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল' (academic mobility) ব্যাহত হবে এবং তার দরুণ উগ্র প্রাদেশিকতার একমাত্র প্রতিষেধক চিন্তা ও আদর্শের অবাধ লেনদেনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। অনেকেই এখন সাহসে ভর করে বলছেন যে, আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল স্খলিত হলেও তা ইংরেজি ভাষার স্বর্ণসূত্রটিকে পিছনে রেখে গেছে, যা নাকি আমাদের সংহতির স্বপক্ষেই কাজ করেছে ও সহায়তা করেছে আমাদের আত্মার পুনরাবিষ্কারে। এই সব লোক এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় আদর্শেই বিশ্বাসী। তাঁদের মতে সম-সাময়িকতার বাস্তব চাহিদাকে অযথা বিরাট করে দেখা ঠিক নয় এবং তার চাপে আমরা যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও আমাদের পাঠ্যবিষয়াদি পরিবর্তন করতে বাধ্য না হই। তাঁরা মনে করেন যে আমাদের উচিত, শাশ্বত সত্যকে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে দর্শনের অধিকারী ছিলেন—তাকেই শ্রেয়জ্ঞান করে চলা। আমাদের সব ছাত্রদের পক্ষেই জ্ঞানার্জনের সাধারণ পৃষ্টপট রচনার প্রধান উপাদান হিসাবে তাঁরা নির্ভর করে চলেছেন ক্লাসিক্স চর্চা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, হিউম্যানিটিজ, ভাষা ও আইন শিক্ষার উপরেই। বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব নির্দিষ্ট সীমার চাইতে বেশি মনে করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের উপযোগিতা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীকে তাঁরা দেখেন সন্দেহের চোখে। তাঁরা বিশ্বাস করেন পুরানো আদর্শের স্থান নিতে পারে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এমন কিছুই নেই। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী কার্যকর হাতিয়ার তৈরির ব্যাপারে হয়তো তাঁরা কাজে লাগেন তবুও তাঁরা মনে করেন যে, ওই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব প্রাচীন দর্শনের ভিত্তিতেই—অনেকেরই মতে যে দর্শন হল প্রধানতঃ অহিংসা।

গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে তার পাঠ ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতা থাকে। অতএব ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত—যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ—তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু'দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলতো এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরনের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এ জগৎ দু'দিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।

বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে আধুনিক কালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ায় পাঠ গ্রহণ করা উচিত। হয়তো জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখাই ভালো। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকেই দর্শনের প্রধান বিষয় করা ঠিক নয়। বরং সাধারণ ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত দেশবিদেশের মানুষকে মনে করা যেতে পারে যেন এক 'রিলে দৌড়ের' প্রতিযোগী, যেখানে ব্যক্তিগত দৌড়রাজের ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষপরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণের এবং দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু এই সব প্রয়াস দেশের ও জগতের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে এইটেই হচ্ছে আসল কথা। বলা যেতে পারে যে,

এই ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিটিও ভারতীয়, যদিও এতে হয়তো ব্যক্তির আত্মাকে পরমার্থ জ্ঞান করতে অস্বীকার করা হয় এবং প্রচারিত হয় কর্মের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কতাই। বস্তুবাদী দার্শনিক এও বলতে পারেন যে, এই পারলৌকিকতা আসলে জড়ত্ব, স্বার্থপরতা ও লোভেরই প্রকৃষ্ট জন্মভূমি। মানুষের উদ্বেগ যখন তার নিজস্ব মোক্ষলাভের জন্যেই তখন সে লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় খোঁজে গুহাকন্দরে। এরই মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পায়, আর যারা পিছনে পড়ে থেকে সংসারের অশুভ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সমাজ ও দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে তাদের ছেড়ে দেয় শয়তানের কবলে।

আমাদের এই দর্শনের আধিপত্য যখন কায়েম ছিল তখন আমাদের প্রথম সারির চিন্তাবিদেরা জীবনের গুরুত্ব স্বীকার করতে অবহেলা করতেন। এরই দরুণ দ্বিতীয় সারির সেই সব ক্ষুদে মানুষেরাই প্রাধান্য পায়—যারা মৌখিক আনুগত্য জানাত দর্শনের প্রতি, অথচ কার্যত মাতামাতি করত—হিংসা, ঝগড়াঝাঁটি ও আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদ নিয়েই। ফলে এল বিদেশি হানাদারের দল—অনেক ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হয়েই এল—আর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করল শতাব্দীর পর শতাব্দী জোড়া দাসত্ব। তবু আমাদের যে ঘুম ভাঙ্গছে এটা একটা সুলক্ষণ। সমাধান ভিন্ন ধরনের হওয়া সম্ভব, সম্ভব পারলৌকিকতার সঙ্গে পার্থিব দায়িত্ব পালনের সুসংগতি। আমাদের দেশে সম্প্রতি মহান স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। তিনি মোক্ষেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন দুর্গত মানবের সেবাকে।

সম্প্রতি আমার সুযোগ ঘটেছিল জাপান যাত্রার। সেখানেও প্রায় ভারতবর্ষের কাছাকাছি সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। জাপান এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত, তার অগ্রগতি সারা পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু। আমি তাই সাগ্রহে এ সুযোগ গ্রহণ করি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান-বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগ দিতে যাই।

সেখানে গণিতবিদ, পদার্থবিদ, জীববিদ ও দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অধিকাংশই জাপানী, কিছু ছিলেন বিদেশি, যেমন আমেরিকার এক দার্শনিক ও যুগোস্লাভিয়ার এক গণিতবিদ। আমি ভেবেছিলাম এ ধরনের আলোচনা সভায় আমরা কোন বিদেশি ভাষারই শরণাপন্ন হব। কিন্তু পৌঁছানোর পর আমাকে বলা হল যে, অধিকাংশ জাপানি বিজ্ঞানিরা ইংরেজি, হয়তো বা তার উপরেও আরও কয়েকটা ভাষা বুঝতে পারলেও, (অনেক সময়েই তাঁদের সব ভাষারই বই পড়তে হয়) সারা দেশ জুড়ে শিক্ষা চলে জাপানি ভাষার ভিত্তিতে এবং আমাকে তৈরি থাকতে হবে আলোচনা সভায় প্রধানত জাপানি শোনার জন্যই। আমি অবশ্য একজন দোভাষীর সাহায্য পাব, যাঁর কাজ হবে আলোচনা সবায় বিভিন্ন বক্তা যা বলবেন তার ভাষান্তর করে দেওয়া এবং আমার পালা যখন আসবে, তখন জাপানি ভাষায় আমার বক্তব্য সহযোগী সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা। স্পষ্টতই এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ এবং আমি অবাক হলাম দেখে যে আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক বিশেষ জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা অনায়াসেই চালানো হল জাপানি ভাষায়, আর আমরা বিদেশিরা যখন বললাম তখন তাঁরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের চিন্তাসূত্রটি ধরতে পারলেন ও আমাদের নিবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের অনুমোদন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক সমালোচনা উপস্থিত করলেন বেশ ধারালো ভাবেই।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানি ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানি ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকেরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়।

নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার-করা শব্দ (loan words) ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানির ইংরাজিতে লেখা একটি বইয়ের জাপানি তর্জমা হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রি হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাজারের মতো। শুধু জাপানি ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানিরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়তো তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশি বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানিরা ইংরাজিতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিকে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজি টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশি উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও আশা করি বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থামোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়ান্ট, ইন্টিগ্রেশন,—এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিষ। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশাকরি শিক্ষক এবং ছাত্রেরা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে অনেক সময়ে বিজ্ঞানিরা বাধ্য হয়ে বিতর্কে নামতে হয়—লড়াই চালাতে হয় শব্দের হাতিয়ারযোগে। কিন্তু তিনি খুশি হন যখন তাঁর পক্ষে এমন যথাযথ পরীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারে।

আমাদের দেশে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার পরীক্ষা খুবই বাঞ্ছনীয় যার বিশেষ ঝোঁক থাকবে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের উপরে এবং যেটি চালানো হবে কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে।

আমার বিশেষ আশা যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানির সভাপতিত্বে মঞ্জুরী কমিশন এই প্রস্তাবটির প্রতি সদয় হবেন ও একে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশ মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।

আমি আশা করি, আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি দীর্ঘকালস্থায়ী এমন যজ্ঞক্ষেত্র হবে যেখানে শিক্ষক

ঋষিরা এবং ছাত্র ঋত্বিকগণ মিলিত হয়ে প্রচার করবেন, সবার উপরে মানুষ সত্য এবং তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন আমাদের কবিগুরুর অন্তরের প্রার্থনা :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
... ...
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

৬.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ

বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারখানায় প্রতি বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয় উচ্চতর শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের জন্য। তবে লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার অভাবহেতু তারা আধুনিক কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করতে স্বচ্ছন্দ নয়। আমেরিকা প্রত্যাবৃত্ত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদের মতে, প্রস্তুতির অভাবে ভারতীয় ছাত্ররা আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণে প্রকট হয়ে ওঠে ব্যর্থতা। এ অপচয় জাতীয় প্রয়াসের। এই সময় ও প্রয়াসের অপচয় এড়াতে পারলে এবং পরিকাঠামোগত উৎকর্ষ, যথাযথ পরিচালনব্যবস্থা ও সুযোগ লাভের অবকাশ দিলে ভারতীয় ছাত্ররা কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও অপূর্ণতার বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তা নিষ্কাশনের মাধ্যমেও এই অপচয় রোধ করা সম্ভব। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রথম শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়েই ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গড়ে তোলাও সম্ভব। কিন্তু এই ভাব বিনিময়ের যোগসূত্র হিসাবে কোনো বিদেশি ভাষা গৃহীত হলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ তা শিক্ষক ও ছাত্রের সংযোগের পথে বাধাস্বরূপ। প্রচুর অনুসন্ধিৎসু ছাত্রও শুধুমাত্র বিদেশি ভাষা ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে মুখস্থবিদ্যার পথে ধাবিত হয়, ফলে শিক্ষণীয় বিষয় তাদের কাছে অধরা থেকে যায়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাবিদরা অনেকেই ইংরেজীকে বাদ দেওয়া দেশীয় স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেন না। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অভিমত এই যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হলে বিদ্যায়তনিক চলাচল বা Academic Mobility ব্যাহত হবে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট হবে এবং গতিশীলতাও ব্যাহত হবে। ফলস্বরূপ সংকীর্ণতা ও উগ্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হবে। আবার অনেকের মতে, ইংরেজরা ভারত পরিত্যাগ করলেও ইংরেজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকেই জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসী এইসব শিক্ষাবিদরা আরও মনে করেন যে, সমসাময়িকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটানো অনাবশ্যক। পূর্বতন ধারার অনুবর্তন করে তাঁরা ইংরেজী ভাষা অবলম্বনেরই পক্ষপাতী কারণ তাঁদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বকে নির্ভর করেই আধুনিক যুগে পদার্পণ সম্ভব হয়েছে। আগে বিজ্ঞান চর্চার অবকাশ তেমন ছিলনা। তাই বিজ্ঞানকে তাঁরা সন্দেহের

দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে সীমিত করেছেন কারণ তাঁদের পক্ষে পুরনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া অসম্ভব। কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী হাতিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করেন প্রাচীন অহিংসা দর্শনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে সকলেরই ইতিহাস শিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রদান ও ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, ভারতীয় সভ্যতার অবনতি প্রসঙ্গেও একাধিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে প্রাচীন সংস্কৃতির মুল ভিত্তি হিসাবে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত এবং এতে গুরুত্ব প্রদান করা হত মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপর। ফলে পৃথিবীকে দুদিনের পান্থশালা মনে করায় তাঁরা পার্থিব দুর্দশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের আশায় অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু এইধরনের উৎকৃষ্ট দর্শনচিন্তার প্রচার ও প্রসার আসলে মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলে। এই ঔদাসীন্যের ফলস্বরূপ ভারতীয়রা আক্রমণকারীদের হতে পরাস্ত হল।

ভারতীয়দের ব্যক্তিগত সুখলাভের চিন্তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ ঐতিহ্যের সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন দেশের মানুষকে দৌড়ের প্রতিযোগী মনে করা উচিত, যেখানে নিজ ভাগ্যের উন্নতি অপেক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের চিন্তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি যদি দেশের দারিদ্র্য, রোগ নিরাময়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তাতে তাঁর জীবনাবসানের পরেও এই হিতকর কর্মের জন্য তিনি দেশের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে এই জাতীয় চিন্তায় কর্মের সার্বভৌম তত্ত্বের কথাই প্রাধান্য পায়। বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে পারলৌকিকতা আসলে লোভ, লালসা, স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মগোপনে প্ররোচিত করে আর এইসমস্ত মানুষের স্বার্থপরতা সমাজ ও দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত মানুষদের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে।

ভারতের প্রথম সারির চিন্তাবিদরা জীবনের প্রতি অবহেলিত থাকায় দ্বিতীয় সারির ক্ষুদ্র মানুষেরা প্রাধান্য পেতেন। বাহ্যত এঁরা দর্শনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করলেও মূলত ঈর্ষা এবং বিবাদ নিয়েই এঁরা ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ভারতবাসী বিদেশি হানাদারের অধীনস্থ হল। তবে মুক্তিকামনাও এই সময় প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের থেকেও প্রাধান্য দিয়েছেন মানবকল্যাণকে।

ভারতের সমসাময়িককালে জাপানেও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তিত হয়। কিন্তু জাপান এখন কেবল আধুনিক রাষ্ট্রই নয়, তার অগ্রগমন সমগ্র বিশ্বের কাছে বিস্ময়। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ আয়োজিত আলোচনাসভার আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় যেসব পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ, দার্শনিকরা আমন্ত্রিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই জাপানী, কয়েকজন ছিলেন বিদেশি। সাধারণত এ জাতীয় আলোচনাসভা কোনো বিদেশি ভাষাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইংরেজীর প্রচলন থাকলেও সমগ্র জাপান জুড়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি যেহেতু জাপানী ভাষাতেই হয়, কাজেই উক্ত আলোচনাসভার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এক্ষেত্রে সকলের সুবিধার্থে একজন দোভাষী থাকবেন। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ক একটি জটিল আলোচনা জাপানের মত একটি আধুনিক রাষ্ট্রে অনায়াসেই চলল তাদের মাতৃভাষায় এবং আমন্ত্রিতদের চিন্তাসূত্রটিও তাঁরা অনায়াসে উপলব্ধি করে সেই সংক্রান্ত সমর্থন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক বক্তব্যও উপস্থাপিত করলেন।

এমনকি পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম আলোচনা ও গবেষণাও সম্পাদিত হচ্ছে জাপানী ভাষাতে। এক্ষেত্রে তাঁদের কিছু ঋণ শব্দ বা loan words ব্যবহার করতে হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর একটি ইংরেজী বই জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বইটি ছ-মাসে প্রায় তিন হাজারের

মত বিক্রি হয়েছে। শুধু জাপানী পড়তে পারে এমন লোকেরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানার জন্য আগ্রহী। কিন্তু ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের কারণে ৮০ শতাংশ ভারতবাসী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

আবার একথাও প্রচলিত যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বিজ্ঞানচর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দ যদি ছাত্রদের বোধগম্য হয়, তবে ঋণ শব্দ হিসেবেই সেগুলি ভারতীয় শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। এমন বহু শব্দ আছে ভারতীয় ভাষায় যার উৎপত্তি বিদেশি শব্দ থেকে এবং সেগুলি ভারতীয়দের কাছে সহজেই বোধগম্য।

কিছু বিদেশি শব্দ, যেমন- রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, সেন্টিমিটার, থার্মোমিটার, ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির পরিভাষা নির্মাণ অনাবশ্যক কারণ এগুলি প্রায় সকলের কাছেই বোধগম্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিভাষার ব্যবহার করাই কাম্য। বিজ্ঞানীকে অনেকসময় শব্দকে হাতিয়ার করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়। কিন্তু তা সার্থকতা পায় তখন, যখন তাঁর যথাযথ পরীক্ষার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ ভারতীয় ভাষাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব চর্চা অগ্রসর হবে এমন একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে তো বটেই, জাতি-ধর্ম-মতবাদ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ এক-- এই শিক্ষা প্রচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটি যজ্ঞক্ষেত্র সদৃশ হতে হবে যেখানে শিক্ষক ঋষি এবং শিক্ষার্থী ঋত্বিকদের মিলিত প্রয়াসে প্রচারিত হবে মানবপ্রীতি, স্বদেশচেতনা, সমন্বয়ের বাণী।

৬.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

৬.৬.১ প্রাবন্ধিকের মত অনুসারে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার মূল সমস্যাগুলি কী?

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর "শিক্ষা ও বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার মূল সমস্যাগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষায় সমস্যার মূল কারণ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি ভাষায় শিক্ষাদান। প্রতি বছর উচ্চতর শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কারখানায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয়। কিন্তু সেই ছাত্ররা ভালভাবে আধুনিক কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারে না। এর প্রধান কারণ এই ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার অভাব। আমেরিকা-ফেরত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদের মতে, প্রস্তুতির অভাবে ভারতীয় ছাত্ররা আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে শেষ অবধি প্রকট হয়ে উঠবে ব্যর্থতা। আসলে এ অপচয় জাতীয় প্রয়াসের। ভারতীয় ছাত্ররা তখনই কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হবে যখন এই সময় ও প্রয়াসের অপচয় এড়ানো সম্ভবপর হবে এবং তাদের পরিকাঠামোগত উৎকর্ষ, যথাযথ পরিচালনব্যবস্থা ও সুযোগ লাভের অবকাশ দেওয়া যাবে। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও অপূর্ণতার বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তা নিষ্কাশনের মাধ্যমেও এই অপচয় রোধ করা সম্ভব। কাজেই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রথম শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়েই ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গড়ে তোলাও সম্ভব। কিন্তু এই ভাব বিনিময়ের যোগসূত্র হিসাবে

কোনো বিদেশি ভাষা গৃহীত হলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ তা শিক্ষক ও ছাত্রের সংযোগের পথে বাধাস্বরূপ। প্রচুর অনুসন্ধিৎসু ছাত্রও শুধুমাত্র বিদেশি ভাষা ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে মুখস্থবিদ্যার পথে ধাবিত হয়, ফলে শিক্ষণীয় বিষয় তাদের কাছে অধরা থেকে যায়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাবিদরা অনেকেই ইংরেজীকে বাদ দেওয়া দেশীয় স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেন না। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অভিমত এই যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হলে বিদ্যায়তনিক চলাচল বা Academic Mobility ব্যাহত হবে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট হবে এবং গতিশীলতাও ব্যাহত হবে। ফলস্বরূপ সংকীর্ণতা ও উগ্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হবে। আবার অনেকের মতে, ইংরেজরা ভারত পরিত্যাগ করলেও ইংরেজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকেই জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসী এইসব শিক্ষাবিদরা আরও মনে করেন যে, সমসাময়িকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটানো অনাবশ্যক। পূর্বতন ধারার অনুবর্তন করে তাঁরা ইংরেজী ভাষা অবলম্বনেরই পক্ষপাতী কারণ তাঁদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বকে নির্ভর করেই আধুনিক যুগে পদার্পণ সম্ভব হয়েছে। আগে বিজ্ঞান চর্চার অবকাশ তেমন ছিলনা। তাই বিজ্ঞানকে তাঁরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে সীমিত করেছেন কারণ তাঁদের পক্ষে পুরনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া অসম্ভব। কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী হাতিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করেন প্রাচীন অহিংসা দর্শনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে সকলেরই ইতিহাস শিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রদান ও ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, ভারতীয় সভ্যতার অবনতি প্রসঙ্গেও একাধিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

৬.৬.২ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধানের কী কী পথ দেখিয়েছেন?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর "শিক্ষা ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধে বলেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করা দরকার। শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বপ্রথম শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়েই ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি গড়ে তোলাও সম্ভব। কিন্তু এই ভাব বিনিময়ের যোগসূত্র হিসাবে কোনো বিদেশি ভাষা গৃহীত হলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ তা শিক্ষক ও ছাত্রের সংযোগের পথে বাধাস্বরূপ। প্রচুর অনুসন্ধিৎসু ছাত্রও শুধুমাত্র বিদেশি ভাষা ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে মুখস্থবিদ্যার পথে ধাবিত হয়, ফলে শিক্ষণীয় বিষয় তাদের কাছে অধরা থেকে যায়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাবিদরা অনেকেই ইংরেজীকে বাদ দেওয়া দেশীয় স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করেন না। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অভিমত এই যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হলে বিদ্যায়তনিক চলাচল বা Academic Mobility ব্যাহত হবে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট হবে এবং গতিশীলতাও ব্যাহত হবে। ফলস্বরূপ সংকীর্ণতা ও উগ্র প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হবে। আবার অনেকের মতে, ইংরেজরা ভারত পরিত্যাগ করলেও ইংরেজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকেই জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় আদর্শে বিশ্বাসী এইসব শিক্ষাবিদরা আরও মনে করেন যে, সমসাময়িকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটানো অনাবশ্যক। পূর্বতন ধারার অনুবর্তন করে তাঁরা ইংরেজী ভাষা অবলম্বনেরই পক্ষপাতী কারণ তাঁদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বকে নির্ভর করেই আধুনিক যুগে

পদার্পণ সম্ভব হয়েছে। আগে বিজ্ঞান চর্চার অবকাশ তেমন ছিলনা। তাই বিজ্ঞানকে তাঁরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে সীমিত করেছেন কারণ তাঁদের পক্ষে পুরনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া অসম্ভব। কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী হাতিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করেন প্রাচীন অহিংসা দর্শনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে সকলেরই ইতিহাস শিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রদান ও ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, ভারতীয় সভ্যতার অবনতি প্রসঙ্গেও একাধিক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে প্রাচীন সংস্কৃতির মুল ভিত্তি হিসাবে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত এবং এতে গুরুত্ব প্রদান করা হত মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপর। ফলে পৃথিবীকে দুদিনের পান্থশালা মনে করায় তাঁরা পার্থিব দুর্দশা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের আশায় অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু এইধরনের উৎকৃষ্ট দর্শনচিন্তার প্রচার ও প্রসার আসলে মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলে। এই ঔদাসীন্যের ফলস্বরূপ ভারতীয়রা আক্রমণকারীদের হতে পরাস্ত হল।

প্রাবন্ধিকের মতে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত সুখলাভের চিন্তা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ ঐতিহ্যের সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন দেশের মানুষকে দৌড়ের প্রতিযোগী মনে করা উচিত, যেখানে নিজ ভাগ্যের উন্নতি অপেক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের চিন্তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি যদি দেশের দারিদ্র্য, রোগ নিরাময়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তাতে তাঁর জীবনাবসানের পরেও এই হিতকর কর্মের জন্য তিনি দেশের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তবে এই জাতীয় চিন্তায় কর্মের সার্বভৌম তত্ত্বের কথাই প্রাধান্য পায়। বস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে পারলৌকিকতা আসলে লোভ, লালসা, স্বার্থপরতার জন্ম দেয়। মুক্তিলাভের আকাঙ্খা মানুষকে লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মগোপনে প্ররোচিত করে আর এইসমস্ত মানুষের স্বার্থপরতা সমাজ ও দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত মানুষদের জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে।

ভারতের প্রথম সারির চিন্তাবিদরা জীবনের প্রতি অবহেলিত থাকায় দ্বিতীয় সারির ক্ষুদ্র মানুষেরা প্রাধান্য পেতেন। বাহ্যত এঁরা দর্শনের প্রতি আনুগত্য প্রদান করলেও মূলত ঈর্ষা এবং বিবাদ নিয়েই এঁরা ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ভারতবাসী বিদেশি হানাদারের অধীনস্থ হল। তবে মুক্তিকামনাও এই সময় প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের থেকেও প্রাধান্য দিয়েছেন মানবকল্যাণকে।

ভারতের সমসাময়িককালে জাপানেও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তিত হয়। কিন্তু জাপান এখন কেবল আধুনিক রাষ্ট্রই নয়, তার অগ্রগমন সমগ্র বিশ্বের কাছে বিস্ময়। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ আয়োজিত আলোচনাসভার আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় যেসব পদার্থবিদ, গণিতজ্ঞ, দার্শনিকরা আমন্ত্রিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই জাপানি, কয়েকজন ছিলেন বিদেশি। সাধারণত এ জাতীয় আলোচনাসভা কোনো বিদেশি ভাষাকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইংরেজীর প্রচলন থাকলেও সমগ্র জাপান জুড়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি যেহেতু জাপানি ভাষাতেই হয়, কাজেই উক্ত আলোচনাসভার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে এক্ষেত্রে সকলের সুবিধার্থে একজন দোভাষী থাকবেন। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ক একটি জটিল আলোচনা জাপানের মত একটি আধুনিক রাষ্ট্রে অনায়াসেই চলল তাদের মাতৃভাষায় এবং আমন্ত্রিতদের চিন্তাসূত্রটিও তাঁরা অনায়াসে উপলব্ধি করে সেই সংক্রান্ত সমর্থন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক বক্তব্যও উপস্থাপিত করলেন।

এমনকি পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম আলোচনা ও গবেষণাও সম্পাদিত হচ্ছে জাপানী ভাষাতে। এক্ষেত্রে তাঁদের কিছু ঋণ শব্দ বা loan words ব্যবহার করতে হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা

দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর একটি ইংরেজী বই জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং বইটি ছ মাসে প্রায় তিন হাজারের মত বিক্রি হয়েছে। শুধু জাপানী পড়তে পারে এমন লোকেরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানার জন্য আগ্রহী। কিন্তু ভারতে ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের কারণে ৮০ শতাংশ ভারতবাসী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

আবার একথাও প্রচলিত যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বিজ্ঞানচর্চার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দ যদি ছাত্রদের বোধগম্য হয়, তবে ঋণ শব্দ হিসেবেই সেগুলি ভারতীয় শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। এমন বহু শব্দ আছে ভারতীয় ভাষায় যার উৎপত্তি বিদেশি শব্দ থেকে এবং সেগুলি ভারতীয়দের কাছে সহজেই বোধগম্য।

কিছু বিদেশি শব্দ, যেমন- রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, সেন্টিমিটার, থার্মোমিটার, ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির পরিভাষা নির্মাণ অনাবশ্যক কারণ এগুলি প্রায় সকলের কাছেই বোধগম্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিভাষার ব্যবহার করাই কাম্য। বিজ্ঞানীকে অনেকসময় শব্দকে হাতিয়ার করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়। কিন্তু তা সার্থকতা পায় তখন, যখন তাঁর যথাযথ পরীক্ষার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ ভারতীয় ভাষাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব চর্চা অগ্রসর হবে এমন একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিদ্যার্জন ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে তো বটেই, জাতি-ধর্ম-মতবাদ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ এক—এই শিক্ষা প্রচারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে তিনি বলছেন যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একটি যজ্ঞক্ষেত্রের মতো হতে হবে যেখানে শিক্ষক ঋষি এবং শিক্ষার্থী ঋত্বিকদের মিলিত প্রয়াসে প্রচারিত হবে মানবপ্রীতি, স্বদেশচেতনা এবং সমন্বয়ের বাণী।

৬.৬.৩ জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতির কারণ কী?

প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাপানে গিয়ে সেখানে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে আমাদের দেশে ছাত্রদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল সূত্রগুলি তারা হৃদয়োঙ্গম করে উঠতে পারেনি। অপরদিকে জাপানে বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে মোটেও অবহেলা করা হয়নি, বরং পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়গুলিও সেখানে তাদের মাতৃভাষাতেই পড়ানো হচ্ছে। পাঠদানের পাশাপাশি জাপানে বিজ্ঞান গবেষণারও মাধ্যম মাতৃভাষা। এমনকি বিশ্বে অনত্র বিজ্ঞানের যেসব গবেষণা ইংরেজি বা অন্য ভাষায় হয়েছে, সেগুলিকেও জাপানি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হচ্ছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে জাপানিরা একাধিক বিদেশি শব্দকে অনায়াসে ব্যবহার করছেন। ফলে আধিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি তাদের ছাত্রদের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য হয়ে উঠেছে এবং জাপানে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের পথ সুগম হয়ে উঠেছে।

৬.৬.৪ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান সমস্যা কী? কোন পথে সমাধান সম্ভব?

প্রচলিত মতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান সমস্যা হল উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসার যেহেতু অধিকাংশই বিদেশে এবং বিদেশি ভাষায় ঘটেছে, তাই আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ পরিভাষাই রচিত হয়েছে কোনও না কোনও বিদেশি ভাষায়। ফলে এরকম একটা মত প্রচলিত ছিল যে ভারতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

করতে গেলে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যেহেতু পাওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং ভারতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসাধনাও সম্ভব নয়।

এই সমস্যা থেকে সমাধানের পথ হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা না করে বরং সেগুলিকে অবিকৃতভাবে বিদেশি ভাষাতেই ব্যবহার করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি বিশুদ্ধবাদি নন। উদাহরণস্বরূপ জাপানের প্রসঙ্গ এনে তিনি জানিয়েছেন যে সেখানে বিদেশি ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলিকে ব্যবহার করে মাতৃভাষাতে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

৬.৬.৫ বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে

প্রাবন্ধিকের মতে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের মাধ্যম হবে ইংরেজি নয় বরং কোনও একটি ভারতীয় ভাষা। তবে প্রাবন্ধিক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সমাজবিদ্যা পাঠেরও স্থান থাকবে এবং বিজ্ঞানের পাশাপাশি সমাজতত্ত্ব পাঠের ওপরেও জোর দেওয়া হবে। কারণ প্রাবন্ধিকের মতে শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসারই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। বরং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মধ্যে মিলন ও ঐক্যের বাণী প্রচার করাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ এটাই ভারতের জাতীয় আদর্শ আর সেই জাতীয় আদর্শের প্রচার করাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৬.৬.৬ আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যত প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা বহুবিধ। তিনি বলেছেন ভবিষ্যতে আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত হতে হবে। এই যজ্ঞক্ষেত্রে শিক্ষক ঋষি এবং শিক্ষার্থী ঋত্বিকদের মিলিত প্রয়াসে প্রচারিত হবে মানবপ্রীতি, স্বদেশচেতনা এবং সমন্বয়ের বাণী। অর্থাৎ একটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বাণী প্রচার করা নয়। বরং দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ তৈরি করার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিশেষত ভারতের মতো দেশে, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণগত দিক থেকে এত বৈচিত্র্য, সেখানে বিবিধের মাঝে মিলনের বাণী প্রচার করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। প্রাবন্ধিকের মতে মানবতাবাদ প্রচারের সেই দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরই।

৬.৬.৭ ভারতবর্ষের পরাধীনতা প্রসঙ্গ

প্রাবন্ধিকের মতে ভারতের প্রথম সারির চিন্তাবিদরা মুক্তিকামনার দর্শকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবজীবনের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ সামাজিক জীবনে দ্বিতীয় সারির ক্ষুদ্র মানুষেরা প্রাধান্য পেতেন। এই দ্বিতীয় সারির চিন্তাবিদেরা বাহ্যিকভাবে মুক্তিকামী দর্শনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও মূলত ঈর্ষা এবং বিবাদ নিয়েই এঁরা ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ভারতবাসীর মধ্যে মিলন ও ঐক্যের আদর্শের প্রচার ও প্রসার বিঘ্নিত হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগে বহিরাগত শত্রুর এদেশে প্রবেশ ও আধিপত্য স্থাপনের রাস্তা অনেক বেশি সুগম ও নিষ্কন্টক হয়ে উঠেছিল। এর ফলস্বরূপ অচিরেই আমাদের দেশ বিদেশি হানাদারের অধীনস্থ হল। প্রাবন্ধিকের মতে এইভাবেই দেশের পরাধীনতা শুরু হয়েছিল।

৬.৭ অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। প্রাবন্ধিকের মত অনুসারে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার মূল সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

২। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই প্রবন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধানের কী কী পথ দেখিয়েছেন?

৩। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কী কী সুবিধা প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতির কারণ কী?

২। প্রচলিত মতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রধান সমস্যা কী? প্রাবন্ধিক সেই সমস্যা থেকে সমাধানের কী পথ দেখিয়েছেন?

৩। বিজ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কী বলেছেন?

৪। আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা কী?

৫। ভারতের পরাধীনতার কারণ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মত কী?

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় ছাত্ররা 'খুবই ত্রস্ত বোধ' করে কেন?

২। 'Academic medeitity' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৩। 'চিত্র যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির...' —কার লেখা?

৪। জাপানে সমগ্র দেশ জুড়ে কোন্ ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়?

একক : ৭ ❑ যে দেশে বহু ধর্ম, বহু ভাষা : অন্নদাশংকর রায়

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৭.৪ মূল প্রবন্ধ

৭.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ (প্রথম অংশ)

৭.৬ মূল প্রবন্ধের সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

৭.৭ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

৭.৭.১ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে প্রাবন্ধিকের অভিমত

৭.৭.২ রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত ও ইউরোপীয় দেশগুলির ভিন্ন প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে

৭.৭.৩ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গান্ধীজির নীতি

৭.৭.৪ রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্মার অবস্থান

৭.৭.৫ সহায়ক ভাষা বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?

৭.৭.৬ ইংরেজদের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ভাষানীতি কেমন হত বলে প্রাবন্ধিক আশঙ্কা করছেন?

৭.৭.৭ হিন্দি ও উর্দু কেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে?

৭.৮ অনুশীলনী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বহু ধর্ম ও বহু ভাষায় দেশ ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বহু ধর্মের দেশ ভারতের মূলনীতি কী হওয়া উচিত, বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতের রাষ্ট্রভাষা-ই-বা কোন্‌টি হওয়া উচিত—শিক্ষার্থীরা সেই বিষয়ে অবগত হতে পারে।

৭.২ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদাদানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাবন্ধিকের মত, রাষ্ট্রভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত, বর্মা, ইউরোপীয় দেশগুলির অবস্থান, ভারতবর্ষে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নীতি, সহায়ক ভাষা এবং হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠাসহ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় বর্তমান এককটি সজ্জিত।

৭.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

অন্নদাশংকর রায়ের জন্ম ১৫মার্চ ১৯০৪ সালে এবং মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ২০০২ সালে। ওড়িষার ডেংকানলে এক কায়স্থ রায় পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা নিমাইচরণ রায় ও মাতা হেমনলিনী। তাঁদের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার কোতরং গ্রামে, পারিবারিক পেশাগত সূত্রে তাঁর পূর্বপুরুষ ওড়িষায় বসবাস শুরু করেন। বাল্যকালের প্রশোনার সূত্রপাত ঘটে ঢেঙ্কানলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯২১ সালে ঢেংকানল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে কটকের রাভেনশ্ কলেজে ভর্তি হন। তখন এটি ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ১৯২৫সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এরপর এম.এ. পড়াকালীন তিনি আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ইংলণ্ডে যান প্রশিক্ষণের জন্য। লণ্ডনে তিনি কিংস্ কলেজ, ইউনিভার্সিটি কলেজ, 'স্কুল অব ওরিয়েন্তাল স্টাডিজে প্রাশোনা করে দেশে ফিরে আসেন। ১৯২৯সালে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যোগ দেন বহরমপুরের এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে। ১৯২৯ সালে থেকে ১৯৪৭সাল পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক কাজে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেও ছিলেন। ১৯৫০সালে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫১সালে বিচারবিভাগের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভ করেন। চাকরি থেকে অব্যহতি লাভের পর তিনি শান্তিনিকেতনে বসবাস করেন।

পেশাগত জীবনে ভারত সরকারের একজন সুদক্ষ উচ্চপদস্থ আমলা হলেও বাঙালির কাছে অন্নদাশংকর রায়ের অধিক পরিচিতি একজন কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ হিসেবেই। তিনি বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের একজন অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি-"তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর পরে রাগ করো/ তোমরা যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো/ তার বেলা"- এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দেশভাগের প্রেক্ষিতে নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে তাঁর অমোঘ পঙ্‌ক্তিটিও স্মরণীয়-" ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয়নিকো নজরুল"। প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যে অপরিসিম। ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজ, রাজনীতি তাঁর প্রবন্ধে চিন্তাশীল যুক্তিগ্রাহ্য গদ্যের প্রবহমান ধারায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার, বিজ্ঞানমনস্ক, আদর্শবান ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলঃ তারুণ্য (১৯২৭), আমরা (১৯৩৭), জীবনশিল্পী (১৯৪১), বিনুর বই (প্রথম পর্ব ১৯৪১), জীয়নকাঠি (১৯৪৯), দেশকালপাত্র (১৯৪৯), আধুনিকতা (১৯৫৩), সাহিত্যে সংকট (১৯৫৫), রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২), খোলা মন ও খোলা দরজা (১৯৬৭), আর্ট (১৯৬৮), গান্ধী (১৯৭০), বাংলার রেঁনেসাঁস (১৯৭৪), শিক্ষার সংকট (১৯৭৬), কাঁদ প্রিয় দেশ (১৯৭৬), লালন ও তার গান (১৯৭৮), চিত্ত যথা ভয়শূণ্য (১৯৭৮), বাংলাদেশে (১৯৭৯), স্বাধীনতার পূর্বাভাস (১৯৮০), শিক্ষার ভবিষ্যৎ (১৯৮১), সংহতির সঙ্কট (১৯৮৪), সংস্কৃতির বিবর্তন (১৯৮৪), যুক্তবঙ্গের স্মৃতি (১৯৯০), রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরি ও সবুজপত্র (১৯৯৯), আমার ভালোবাসার দেশ (২০০১) ইত্যাদি।

৭.৪ মূল প্রবন্ধ

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে

সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট; যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো উ নু ও তাঁর দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষারূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকে কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণৎ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি সে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা

একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনর বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তানে যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশংকা জাগে। এমন ককেয়টি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারামানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সবকটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরোজীকে যারা বিদায় করবে তারাকি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না? ভাগ করার নমুনা কি এই যে হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা? সব ক'টা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি কোন ভাষা, অহিন্দীভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে। ইংরোজীর অধিকারে না থাকলে সে সব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেণ্ট, আর্মি, নেভী, পুলিস, স্কুল, কলেজ, লেবরেটারি, রেল-ষ্টীমার, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা, খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ট্রাম, বাস, মোটর—কোনটিই বা বিদেশাগত নয়? এমনকি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী।

এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটি টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরোজী শিখতে হবে। অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে, ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যম কর তবে বাংলাকেও করতে হবে, তামিল, তেলুগু, কন্নাডিগ, মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মারাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরোজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটি ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী লজিকের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব ক'টা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। তগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপস রফা নাক রি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তাহলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধামতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক

স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দু বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। ত দূর যেতে হবে কেন? ধরুন, ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো, না হিন্দী উর্দুর যমজরূপ হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেস অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশে ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দী ও অন্যদিকে উর্দু একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দুভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দুর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষী। লেগে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দু ভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দুভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরোজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দুর বিরুদ্ধে নয়, উর্দুভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্বপাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে—ইংরেজীকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে দেশ বহুখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল, অসমীয়া, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইস্যু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছা করলে ইংরোজীর বদলে বাংলা, তামিল, মারাঠি ইত্যাদি চৌদ্দ পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি

ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে, হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরোজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে? 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে।

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হেঁকেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারতে যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দীভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ হওয়ামাত্র ভারতকে বলা যাবে হিন্দীরাষ্ট্র। তখন হিন্দীভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী, তামিলভাষী, পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরোজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরোজীর সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বলে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে। লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরোজী না হয়ে উর্দু কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরোজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলেই বা সে স্বদেশী।

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাব বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরোজীতে চান তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করার মতো ভাব থাকে। যদি

সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দুতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন কিন্তু জীবনের শেষদিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালিতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। রথীবাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তিনি ইংরোজীতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটিমাত্র ভাষায় হবে—হিন্দীতে—এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হলো—কোন্ ভাষায়, বলুন তো? ইংরোজীতে।

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুন বচসা বেধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হলো উর্দু সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দু। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়, উর্দু। যেখানে উর্দু উভয়ের জানা সেখানে ভাববিনিময়ের ভাষা উর্দু হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দুতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশো কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে অচলিত করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোলনয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেণ্টিমেণ্ট। বাংলাভাষাই হতো রাষ্ট্রেভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরোজীর প্রয়োজন ফুরতো না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। সৃষ্টির ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। আরো আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায় তা হলে অর্ধ শতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী

শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পশতাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পশতানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরাজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপাযায় না? রোমক লিপিতে ছাপা বলে হিন্দী বই কাগজে আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দীর দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের উপর জোরজুলুম করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দী বই কাগজ ছেপে। তারপর হিন্দীর ব্যাকরণ আরো সরল হওয়া চাই। পশুপাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরাতা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দীর দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফু দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপূজা হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

(১৯৬২)

৭.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ (প্রথম অংশ)

বহু ভাষা ও ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের মূলনীতি কী হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতানুসারে সেই রাষ্ট্র হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র। এই ধর্মীয় নীতি অবলম্বন করে ভারতও ধর্মীয় রাষ্ট্র হতে পারত, কিন্তু ভারত এর বিপরীত পথ আশ্রয় করল। ভারতবর্ষ অবলম্বন করল ধর্মনিরপেক্ষতাকে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ধর্ম বা নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখে, সকলের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং সম মনোভাব প্রদর্শনের নীতি।

ভারতের মত বর্মাও এই পথ গ্রহণ করেছিল বটে তবে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর উ নু ও তাঁর দল আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে বর্মাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করলেন। ফলস্বরূপ বর্মার সেকুলার স্টেটের তকমা বিনাশপ্রাপ্ত হল। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকাংশের ইচ্ছায় এই কাব্য সমাধান হলেও এর পরিণাম হল অশুভ। পার্বত্য জাতি শান, করেন প্রভৃতির পক্ষ থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী ঘোষিত হলে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা করায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে পাকিস্তানেও সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বৌদ্ধ রাষ্ট্রের মত ইসলামী রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়নি। গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই পাকিস্তানী জনগন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা উপলব্ধি করবে। অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সকলের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, সেখানে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নেই। যাঁরা কোনো বিশেষ ধর্মকে গুরুত্ব দেন তাঁদের কাছে অন্য ধর্মাবলম্বীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হন এবং ফলস্বরূপ দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে সৌভাগ্যবশত ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ায় এই দুর্দশা নির্মূল করে গণতন্ত্রের সুদৃঢ়করণে সক্ষম হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দৃঢ় ভিত্তির মধ্যে দিয়েই যে গণতন্ত্রের বলিষ্ঠ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সত্য আজ অনেকে

উপলব্ধি করলেও সকলে মানেননি। তাঁরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে চান। তা ফ্যাসিস্ট শাসিত হলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু তাঁদের এই বাসনাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে ভারতের দশাও যে পাকিস্তান কিংবা বর্মার মতো হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ধর্মীয় প্রসঙ্গের পরে অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের মূলনীতির বিষয়টি। বিষয়টি সম্পর্কে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যান্ড যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে, ভারত তার ভিন্ন মত প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত, ১৮৩০-এ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বেলজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় যার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। কিন্তু বছরদশেক পরেই বেলজিয়ামদের একাংশ ফ্লেমিশদের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের ভাষাকেও ফরাসীর সমমর্যাদা প্রদানের জন্য। অতঃপর, তাদের দীর্ঘকালব্যাপী এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে ১৮৯৮ সালে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাই বেলজিয়ামের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। কাজেই সেই দেশের সরকারি কাজকর্ম-ও এই দুই ভাষায় সম্পাদিত হয়।

একইভাবে সুইটজারল্যান্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্ধারিত হয় সেখানের তিনটি রাষ্ট্রভাষা-- জার্মান, ফরাসী ও ইতালিয়ান। কিন্তু এই তিনটি ভাষা মূলত উচ্চতর ক্ষেত্রের কর্মকার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিচুতলার কাজকর্ম প্রধানত বিভিন্ন জেলাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সম্পাদিত হয়। দুটি অতিরিক্ত ভাষার অস্তিত্ব জেলা স্তরে থাকলেও বেসরকারিভাবে সেখানে ইংরেজী ভাষা সর্বত্র গ্রহণীয়। একাধিক ভাষা শিখনের বিষয়টি সুইসদের স্বভাবগত।

একটা রাষ্ট্রে একটাই রাষ্ট্রধর্ম প্রাধান্য পাবে- এই নীতি ইউরোপেও প্রচলিত ছিল যার ফলশ্রুতিস্বরূপ সংখ্যালঘু ইউরোপিয়ানদের সহ্য করতে হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্যাতন; বিপুল রক্তপাতও হয়েছে। কিন্তু একটি দেশে একটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবে, এই ধারণা অধিক সুদূরপ্রসারী। এই কারণেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রভূত নিপীড়ন চলেছে, আলসাস লোরেনের লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জার্মান ও ফরাসীদের দ্বারা।

এবার আসা যাক ভারতের প্রসঙ্গে। যাঁরা একটা দেশে একটাই রাষ্ট্রধর্মের ধারণায় বিশ্বাসী নন, তাঁরা আবার একটি দেশের একাধিক রাষ্ট্রভাষার ধারণাটির বিরোধিতা করেন। বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যান্ডের থেকেও বৃহত্তর রাষ্ট্র, যার ভাষাসংখ্যা চোদ্দ- পনেরটির অধিক, সেই দেশও স্বাধীনতার প্রাক্কালে একটিমাত্র বিদেশী ভাষার সূত্র দ্বারা গ্রথিত ছিল। এর ফলস্বরূপ রাষ্ট্রভাষা যে একাধিক হতে পারেনা, এই সংস্কার জন্মলাভ করেছে। কিন্তু এই বক্তব্য প্রমাণ সাপেক্ষ কারণ তা সকলের সমর্থন, সুবিধা ও ন্যায়বোধের উপর নির্ভরশীল। ভোটনীতি প্রনয়ণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে তা সমগ্র রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে তার সমাধান নির্ণয় পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলার মতো অদূরদর্শীতার পরিচায়ক। কাজেই এ জাতীয় সমাধানকৌশল সুইটজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মতো ভারতেও স্থায়ীত্ব পেতে পারে না। অর্ধশতক অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তামিলরা স্বাতন্ত্র্যের দাবী জানিয়েছে। অতএব এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে, ভাষাগত বিরোধজনিত কারণেই ভারতের সংহতি বিনষ্ট হবে।

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেবার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বাদানুবাদ চলেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকে স্থান দেবার পক্ষে অনেকেরই সমর্থন নেই কারণ তার দ্বারা সকলের ন্যায়বোধ সাধিত হবে না। কিন্তু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকেই চায়। অতঃপর, ভারতে অধিকাংশের অভীপ্সা প্রাধান্য লাভ করল, যেমন পাকিস্তানে ধর্মীয় রাষ্ট্রের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। স্বভাবতই জন্মলাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সংশয়। বলপূর্বক বা ভোটনীতি প্রণয়ন করে যেসব মীমাংসা সম্ভব নয়, তাদের মধ্যে একটি হল ধর্ম, অপরটি ভাষা। কিন্তু ভারত যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও এই সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষের ভাষাগত যে সমস্যা, তা কিন্তু হিন্দি বনাম ইংরেজী নয়; হিন্দিকে না মানার প্রবণতা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাভাষ যেমন - তামিল, নাগা, কাশ্মিরী, বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যমান। ভারতে প্রধান ভাষারূপে হিন্দি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হবে - এটি গ্রহণযোগ্য নয়। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয়, তারা হিন্দিভাষী শিশুদের থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজি ভাষাকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ইংরেজদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই ইংরেজির উত্তরাধিকার হিসাবে হিন্দিকে ভারতের একচ্ছত্র ভাষার দাবীদার মানা চলে না।

ইংরেজির মতো হিন্দি নিজের অধিকার স্থাপন করলে ভারতে হিন্দি ভিন্ন বাকি ভাষাগুলি আঞ্চলিক ভাষার তকমা লাভ করবে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। কিন্তু এই সমস্যামুক্তির উপায় হিসেবে সবকটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানও যথার্থ নয়। সুতরাং, এমন একটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে যাকে হিন্দির সঙ্গে সমবন্ধনীভুক্ত করলে তা সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার ভাষারূপে ইংরেজিকে গ্রহণ করলে তার দ্বারা ন্যায়বোধ হিন্দি অপেক্ষা অধিক চরিতার্থ হয়। তবে বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজিকে গ্রহণে যদি দেশবাসী ছুঁৎমার্গ হন তবে সেই সমবন্ধনীভুক্ত ভাষা অহিন্দি ভাষাভাষীদের পক্ষে নির্বাচন করাই শ্রেয়, যা তাদের ন্যায়বোধের পক্ষে পীড়াদায়ক হবেনা।

তবে প্রকৃত সত্য এই যে, ইংরেজির মতো বহুল প্রচলিত ভাষা ভারতে আর নেই। অনেক জায়গায় হিন্দি প্রচলিত না থাকলেও সেখানে ইংরেজি প্রচলিত। ইংল্যান্ড হল এই ইংরেজি নামক সত্যটির উৎসস্থল। তেমনই ভারতীয় আইন, শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, পার্লামেন্ট, আর্মি, পুলিস, কলেজ, স্কুল, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা, থিয়েটার-- এই সমস্তই যে ইংল্যান্ড থেকে আগত তা বলাবাহুল্য। হিন্দ হিন্দু- এই শব্দগুলিও বিদেশী ভাষা থেকে আগত। কেবল বিদেশী ভাষা বর্জন-ই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদেশী শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত শব্দসমূহের স্বদেশী অনুবাদ করা হয়, তাতেও মূল যে বস্তু তার বস্তুসত্তা অবিকৃতই থাকে। যেমন টেলিফোন নামক বিদেশী যন্ত্রটির ওপর স্বদেশী পরিভাষা আরোপিত হলেও যন্ত্রটি যে বিদেশী, এই সত্য উপলব্ধি প্রয়োজন।

ভারতের সঙ্গে পরাধীনতার কালে ইংরেজির যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার অবসান হয়েছে, এমনকি ভবিষ্যতেও সেই সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রত্যেক ছাত্রকে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে- এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাহলে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ইংরেজি শিক্ষা আপত্তিজনক না হয় তবে শিক্ষার শেষ পর্যায়ে মূল্যায়নপদ্ধতি বা প্রতিযোগিতার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী গ্রহণে সমস্যা কোথায়? এক্ষেত্রে হিন্দিভাষীদের সঙ্গে বাঙালী বা তামিলদের যোগ্যতা সম্পর্কিত তুলনামূলক প্রসঙ্গটি চলে আসে অনিবার্য ভাবেই। উচ্চতর ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নির্বাচন করে যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি বা প্রতিযোগিতার দ্বারা, তার প্রধান মাধ্যম ইংরেজি। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মূল নীতি যদি হয় প্রত্যেকের সমসুযোগ লাভ, তবে সেক্ষেত্রে তার ভাষা একমাত্র ইংরেজী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজীর স্থলে হিন্দিকে গুরুত্ব প্রদান করলে তবে বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালমকেও হিন্দির সমকক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে।

সুতরাং, অভ্যন্তরীণ ন্যায় রক্ষার্থে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার ভাষারূপে ইংরেজীকে গ্রহণ করে জাতীয় স্বার্থে হিন্দিকে ভারতের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করলে কিছুটা সমতা বিধান হয়। আর মূল্যায়নের ভাষারূপে ইংরেজীকে গ্রহণে যদি সমস্যা থাকে তাহলে তার মাধ্যম বাংলা, উর্দু, তামিল ইত্যাদি ভাষা হতে হবে, কেবল হিন্দি নয়। বিরোধ যেহেতু হিন্দি ভাষাভাষীদের সাথে অহিন্দিভাষীদের, কাজেই সেক্ষেত্রে সর্বস্তরে সাম্য বজায় রাখতে হলে বিদেশী ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করাই সমীচীন। জাতীয়তা রক্ষার্থে এটুকু স্বার্থত্যাগ হিন্দিকে করতেই হত।

৭.৬ মূল প্রবন্ধের সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

একটা দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে একটাই—এটা কেবলমাত্র একভাষী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যাঁরা ইংরেজীকে বর্জন করার পক্ষপাতী, তাঁরাও ইংরেজীকেই মনে মনে দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে সেই একই পথ অনুসরণ করে ইংরেজীর মতই একটিমাত্র ভাষার একাধিপত্যে বিশ্বাসী, যা ভারতের মত বহুভাষী দেশে অসম্ভব। তাহলে বিদেশী যুক্তি মেনে একটি ভাষার একচ্ছত্র অধিকারে কোনো সমস্যা যদি না থাকে, তবে ইংরেজীকেই তো সেই অধিকার দেওয়া যেত। আর যদি কেবল বিদেশী ভাষা হওয়ার অপরাধে ভারতে ইংরেজীর স্থান না হয়, তাহলে শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্যের কারণে তাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে সেই পথ অনুসরণ অনর্থক।

কিন্তু ইংরেজী তো বিজাতীয় ভাষা, তাই পরাধীনতার মালিন্য ঘোচাতে তার বিদায় আগে নিশ্চিত করা দরকার এবং সেক্ষেত্রে তার নজিরও মুছে ফেলা প্রয়োজন। ভারতে যতগুলি ভাষা বর্তমান তাদের সবকটিকে হিন্দির সমমর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সকলকে সরকারী ভাষা করে ভারতীয় ঐক্যের সুদৃঢ়করণ সম্ভব - এই যুক্তি যদি কার্যকর না হয় তাহলে বহুভাষী দেশগুলোয় একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকবে এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজরা ওই নিয়ম প্রচলন করেছিল এবং তার দ্বারা কিছু শিক্ষিত ভারতীয় প্রভাবিত হয়েছিল। অতএব দেশে যতগুলি ভাষা থাকবে ততগুলি রাষ্ট্রভাষা হবে- এই সত্যকে সর্বতোভাবে না মেনে নিলে এই সমস্যা প্রকট হবে এবং ফলস্বরূপ বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইংরেজদের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে খণ্ডিত হত এবং তারা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক স্বদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিত। হিন্দি ও উর্দুর একাধিপত্য সব হিন্দু বা মুসলিম মেনে নিত না। যদি সবাই মিলে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলত, সেই সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি বা উর্দুকে নির্বাচন করলে সেক্ষেত্রে সকলের সম্মতিলাভ কঠিন হত। ১৯৪৭ সালে জিন্নসাহেব যদি ক্যাবিনেট মিশনের অভিসন্ধিতে রাজি হলে যদি অখন্ড ভারত ক্ষমতার অধিকারী হত তবে সেই সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষাও হত একাধিক। জিন্না বা গান্ধীজি কখনোই হিন্দির একচ্ছত্র অধিকার মেনে নিতেন না। সুতরাং, হয় ইংরেজীর একাধিপত্য শিরোধার্য করতে হত, নয়তো ঐক্য বজায় রাখতে কোনো যমজ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্থান দিতে হত।

দেশ এখন বিভক্ত বলেই হিন্দি ও উর্দু দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে। তবে এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারি বাঙালি মুসলমানরা টের পেয়েছে যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা আসলে উর্দুভাষী মুসলমানদের অত্যাচারের দলিল। সেজন্য সেই বাঙালি মুসলিমরা বাংলাকে উর্দুর সমকক্ষ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। বেলজিয়ামের ফ্লেমিশদের মত তারাও উর্দুর এই একাধিপত্যকে মান্যতা দেয়নি। তাদের আশা এই যে তাদের এই ক্রমাগত প্রচেষ্টায় তাদের মাতৃভাষা একদিন পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এতে উর্দুভাষীরা অস্বীকৃত হলে রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হবে। নতুবা ইংরেজিকেই চিরকাল বহাল রাখতে হবে একমাত্র প্রতিকার হিসাবে।

প্রকৃতপক্ষে উর্দুভাষীদের প্রচ্ছন্ন দম্ভ, আত্মাভিমানের বিরুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তানিদের সমস্ত ক্ষোভ, তাদের ভাষার প্রতি নয়। একইভাবে, ভারতের ক্ষমতাবান শ্রেণী হবে হিন্দিভাষী এমন একটা সম্ভাবনা হিন্দির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সীমিত ক্ষমতা দিয়ে বাকি প্রদেশে সব ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে। কিন্তু এই ধারণার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি কারণ শিল্পায়ন বিকেন্দ্রীকরণের পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু দেশ প্রাধান্য দিয়েছে শিল্পায়নকে। ক্ষমতাশালী ধনবান হিন্দিভাষীদের ভোটাধিক্যের উপর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তা আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র বলে মনে হলেও আসলে তা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা

ভারাক্রান্ত গণতন্ত্র। এর পরিণামে অসন্তোষ অনিবার্য এবং সেই ক্ষোভ যতটা না হিন্দি ভাষার প্রতি, তার চেয়ে অনেক বেশী হিন্দিভাষী শাসকশ্রেণীর আস্ফালনের প্রতি। এর মীমাংসা না হলে পুনরায় দেশভাগ নিশ্চিত। অতএব ইংরেজীকে সহচর ভাষা হিসাবে মর্যাদা প্রদান করা ভিন্ন এই সমস্যামুক্তির কোনো উপায়ান্তর নেই।

পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে দেশের খণ্ডিকরণে স্বাধীনতা রক্ষিত হয়না কারণ এতে সংহতি বিনষ্ট হয়। তাই কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকলে যেভাবে মিলিত হয়েছে তা ভেঙে গেলে দেশ পুনরায় পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু এই অটুট বন্ধন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে রাষ্ট্রভাষার সনদের কারণে। এই সমস্যায় মুক্তির পথ দুটি -- আপস নতুবা হিন্দিভাষী বা অহিন্দিভাষীদের স্বার্থকে পশ্রয়দান। কাজেই সহচর ভাষার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ভাঙন রোধের সহজ কোনো পথ আর নেই। অনেকের বিদেশী ইংরেজী ভাষাকে সহচর ভাষা করায় আপত্তি থাকলে তাঁরা তামিল, তেলেগু, বাংলা, মারাঠি ইত্যাদি চোদ্দ-পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষার মর্যাদা দিতে পারে তবে তাতে জটিলতা লাঘব হবে না।

প্রধান সমস্যার মূল যদি হয় "বিদেশী" এই বিশেষণটি, তবে তার পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক" বিশেষণটির ব্যবহার যথাযথ। স্বাধীন রাষ্ট্র কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হলে যদি সমস্যা না থাকে তবে আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহারে আপত্তি থাকা অযৌক্তিক। বিদেশী ভাষার মত স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও বর্তমানে বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। যেমন তামিলদের মতানুসারে হিন্দিও তাদের কাছে বিদেশী ভাষায় সমতুল্য। তাছাড়া হিন্দিতে শিক্ষণীয় বিষয় ইংরেজীর তুলনায় অল্প, কিন্তু সামর্থ্যের ব্যয় অধিক। হিন্দি শব্দ পরিচিত হলেও অর্থ বিভিন্ন এবং ব্যাকরণ আরবীর সমতুল্য।

তথাপি দেশের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম অবাধে করতে হলে ভারতের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হিন্দি শেখা আবশ্যক। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান সুখকর হলেও সমস্যা এখানেই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের নিরপেক্ষতা বজায় থাকলেও, ভাষার ক্ষেত্রে এর বিচ্যুতি ঘটল। হিন্দুধর্মকে সে রাষ্ট্রে সর্বাগ্রে স্থান না দিলেও হিন্দি ভাষাকে দিয়েছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হয়নি বটে, তবে ১৯৬৫ সালের পর থেকে হিন্দি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হওয়ায় ভারতকে হিন্দি রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। তখন পাকিস্তানের হিন্দুদের মতো ভারতের তামিল, বাংলা, পাঞ্জাবি ভাষীরা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আর হিন্দি ভাষীরা দেশে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব লাভ করবে। গণপরিষদের সদস্যদের সকলে সংবিধান গঠনের সময় হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানে সহমত পোষণ করেননি। তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলেন-- একপক্ষ হিন্দি এবং অপরপক্ষ ইংরেজীর সমর্থনে। যাঁরা বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের যে স্বদেশপ্রীতির ঘাটতি ছিল, তা নয়। অতঃপর ভোটগ্রহণের মাধ্যমে দেখা গেল হিন্দির সঙ্গে ইংরেজীর মাত্র একটি ভোটের পার্থক্য। সেক্ষেত্রে দুটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যথাযথ ছিল।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংবিধানে কোনো ভাষাকেই "রাষ্ট্রভাষা" বা "জাতীয় ভাষা"-র অভিধায় ভূষিত করা হয়নি। হিন্দি হল "সরকারী ভাষা" এবং সংবিধান সংশোধিত হলে ইংরেজী হবে "সহচর সরকারি ভাষা"। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সমস্ত ভাষারই "রাষ্ট্রভাষা", "জাতীয় ভাষা" প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্য। হিন্দি যদি এককভাবে সেই আখ্যা প্রাপ্ত হয় তবে তা আইন বিরুদ্ধ ভাবে, জনশ্রুতিতে। হিন্দির এই প্রতিপত্তিতে মন্ত্রীরাও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কিন্তু সংবিধানে যেহেতু রাষ্ট্রভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এক্ষেত্রে হিন্দির কিছু হারাবার বা ইংরেজীর কিছু লাভের কোনো সম্ভাবনাও নেই। জনতার মুখে প্রচলিত হয়ে হিন্দি থেকে যাবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আর তার একটি সহচর ভাষা থাকবে। সেই ভাষা যা-ই হোক না কেন, হিন্দু গোঁড়াদের তাতেও আপত্তি থাকত। ইংরেজীকে "বিদেশী" বলার মতোই অন্য কোনো অছিলায় বাকি যেকোনো ভাষাকেই তারা অস্পৃশ্য করে তুলতেন কারণ তাঁরা কোনো অংশীদার চান না।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের জন্য ভাষার অভাব হবে না। হিন্দি ও ইংরেজী দুই ভাষাই ভবিষ্যতের পথ সুগম করবে।

গান্ধীজী স্বয়ং হিন্দিকে সাধারণভাবে ভাববিনিময়ের মাধ্যম করলেও নোয়াখালিতে তিনি বাংলায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তামিল ভাষায় শিখে তামিলদের সঙ্গে তামিল ভাষায়, পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য উর্দুতে কথা বলতেন। আবার তিনি ইংরেজীতেও কথা বলতেন। স্পষ্টতই হিন্দি সম্পর্কে একরোখা মনোভাব তাঁর মধ্যেও ছিল না।

এমনকি স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতভাষীদের আয়োজিত আলোচনাসভাও অনায়াসেই চলেছিল ইংরেজীতে। লালা লাজপৎ রায়ের "বন্দে মাতরম" পত্রিকার ভাষা ছিল উর্দু। হিন্দি বা ইংরেজী নয়।

উর্দুকে সরকারি ভাষার মর্যাদা প্রদান করা না হলেও পশ্চিমা হিন্দু ও শিখরা উর্দুতেই স্বচ্ছন্দ ছিল। একইভাবে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি না পেলেও ইংরেজীর সমাদর এ দেশে চিরকাল থাকবে। কারণ ইংরেজীকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল যত সহজে, তাকে অচল করা ততটা সহজ নয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে মানুষের চাহিদা অনুসারে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুল। গড়ে উঠেছে কলেজ এবং সর্বত্রই বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে ইংরেজী।

হিন্দি ভাষার দ্বারা যে মানদন্ড নির্ধারণ সম্ভব হতো না, তা ইংরেজীর সাহায্যে ঠিক করা সম্ভব। সুদূর ভবিষ্যতেও ইংরেজীর এই প্রয়োজনীয়তা বজায় থাকবে, তা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা স্বীকৃতি পেলেও সেই বাংলার স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের জন্যেও জনগণ ইংরেজীকে মান্যতা দিত।

কিন্তু ইংরেজী যদি বাংলা বা হিন্দিকে এগিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় এবং অন্তঃসারশূন্য, ক্ষয়প্রাপ্ত, অতি সাধারণ বিশেষত্বহীন একটি ভাষায় পরিণত হয় তবে তার স্থায়ীত্ব অসম্ভব। ইংরেজীকে অবশ্যশিক্ষণীয় করে তোলা বা বলপূর্বক শেখানোর ধারণা যথার্থ নয়। ইংরেজী না শিখলে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুশোচনার শিকার হবে।

ইংরেজীর পশ্চাদগমন যেমন সম্ভব, তেমনই হিন্দির অগ্রগমনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। এমনকি হিন্দির অসাধারণত্ব উর্দুকেও গ্রাস করতে পারে। সংস্কৃত লিপি ব্যতীত রোমীয় লিপিতে মুদ্রিত হিন্দি পত্র-পত্রিকা অনেক বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আবার বাংলা লিপিতে প্রকাশিত হলে বাঙালিদের কাছে তা সহজবোধ্য হবে। বিষয়টি অবশ্যই পরীক্ষা সাপেক্ষ। বলপূর্বক জনগণকে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি পড়তে বাধ্য না করে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দি পত্রিকা প্রকাশ অনেক বেশি কার্যকরী। হিন্দি ব্যাকরণ-ও অপেক্ষাকৃত সরল হওয়া প্রয়োজন।

তবে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তা প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত যে, ইংরেজীর দীপ্তি নিষ্প্রভ হলেই হিন্দি, বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলি ভাস্বর হয়ে উঠবে। বরং হিন্দির প্রজ্জ্বলিত দীপের সহায়তায় নিজেদের প্রোজ্জ্বল করে তোলা দরকার। আর অকালে ইংরেজীর সেই প্রজ্জ্বলিত দীপ নির্বাপিত করলে নিজেদের ভাষার দীপও একদিন নিভন্ত হয়ে আঁধার ঘনিয়ে আসতে পারে।

৭.৭ প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

৭.৭.১ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে প্রাবন্ধিকের অভিমত

প্রাবন্ধিকের মতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্থান দেবার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বাদানুবাদ চলেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকে স্থান দেবার পক্ষে অনেকেরই সমর্থন নেই কারণ তার দ্বারা সকলের ন্যায়বোধ সাধিত হবে না। কিন্তু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দিকেই চায়। অতঃপর, ভারতে অধিকাংশের অভীপ্সা প্রাধান্য লাভ করল, যেমন পাকিস্তানে ধর্মীয় রাষ্ট্রের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। স্বভাবতই জন্মলাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সংশয়। বলপূর্বক বা ভোটনীতি প্রণয়ন করে যেসব মীমাংসা সম্ভব নয়, তাদের

মধ্যে একটি হল ধর্ম, অপরটি ভাষা। কিন্তু ভারত যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও এই সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ভারতবর্ষের ভাষাগত যে সমস্যা, তা কিন্তু হিন্দি বনাম ইংরেজী নয়; হিন্দিকে না মানার প্রবণতা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাভাষী যেমন - তামিল, নাগা, কাশ্মিরী, বাঙালীদের মধ্যে বিদ্যমান। ভারতে প্রধান ভাষারূপে হিন্দি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হবে - এটি গ্রহণযোগ্য নয়। যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয়, তারা হিন্দিভাষী শিশুদের থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরেজী ভাষাকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ইংরেজদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই ইংরেজীর উত্তরাধিকার হিসাবে হিন্দিকে ভারতের একচ্ছত্র ভাষার দাবীদার মানা চলে না।

ইংরেজীর মতো হিন্দি নিজের অধিকার স্থাপন করলে ভারতে হিন্দি ভিন্ন বাকি ভাষাগুলি আঞ্চলিক ভাষার তকমা লাভ করবে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। কিন্তু এই সমস্যামুক্তির উপায় হিসেবে সবকটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানও যথার্থ নয়। সুতরাং, এমন একটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে যাকে হিন্দির সঙ্গে সমবন্ধনীভুক্ত করলে তা সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার ভাষারূপে ইংরেজীকে গ্রহণ করলে তার দ্বারা ন্যায়বোধ হিন্দি অপেক্ষা অধিক চরিতার্থ হয়। তবে বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে গ্রহণে যদি দেশবাসী ছুঁৎমার্গ হন তবে সেই সমবন্ধনীভুক্ত ভাষা অহিন্দি ভাষাভাষীদের পক্ষে নির্বাচন করাই শ্রেয়, যা তাদের ন্যায়বোধের পক্ষে পীড়াদায়ক হবেনা। একটা দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে একটাই- এটা কেবলমাত্র একভাষী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যাঁরা ইংরেজীকে বর্জন করার পক্ষপাতী, তাঁরাও ইংরেজীকেই মনে মনে দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নিয়ে সেই একই পথ অনুসরণ করে ইংরেজীর মতই একটিমাত্র ভাষার একাধিপত্যে বিশ্বাসী, যা ভারতের মত বহুভাষী দেশে অসম্ভব।

তথাপি দেশের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম অবাধে করতে হলে ভারতের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হিন্দি শেখা আবশ্যক। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান সুখকর হলেও সমস্যা এখানেই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের নিরপেক্ষতা বজায় থাকলেও, ভাষার ক্ষেত্রে এর বিচ্যুতি ঘটল। হিন্দুধর্মকে সে রাষ্ট্রে সর্বাগ্রে স্থান না দিলেও হিন্দি ভাষাকে দিয়েছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হয়নি বটে, তবে ১৯৬৫ সালের পর থেকে হিন্দি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হওয়ায় ভারতকে হিন্দি রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। তখন পাকিস্তানের হিন্দুদের মতো ভারতের তামিল, বাংলা, পাঞ্জাবি ভাষীরা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আর হিন্দি ভাষীরা দেশে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব লাভ করবে। গণপরিষদের সদস্যদের সকলে সংবিধান গঠনের সময় হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানে সহমত পোষণ করেননি। তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলেন-- একপক্ষ হিন্দি এবং অপরপক্ষ ইংরেজীর সমর্থনে। যাঁরা বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের যে স্বদেশপ্রীতির ঘাটতি ছিল, তা নয়। অতঃপর ভোটগ্রহণের মাধ্যমে দেখা গেল হিন্দির সঙ্গে ইংরেজীর মাত্র একটি ভোটের পার্থক্য। সেক্ষেত্রে দুটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যথাযথ ছিল।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংবিধানে কোনো ভাষাকেই "রাষ্ট্রভাষা" বা "জাতীয় ভাষা"-র অভিধায় ভূষিত করা হয়নি। হিন্দি হল "সরকারী ভাষা" এবং সংবিধান সংশোধিত হলে ইংরেজী হবে "সহচর সরকারি ভাষা"। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সমস্ত ভাষারই "রাষ্ট্রভাষা", "জাতীয় ভাষা" প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্য। হিন্দি যদি এককভাবে সেই আখ্যা প্রাপ্ত হয় তবে তা আইন বিরুদ্ধ ভাবে, জনশ্রুতিতে। হিন্দির এই প্রতিপত্তিতে মন্ত্রীরাও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কিন্তু সংবিধানে যেহেতু রাষ্ট্রভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এক্ষেত্রে হিন্দির কিছু হারাবার বা ইংরেজীর কিছু লাভের কোনো সম্ভাবনাও নেই। জনতার মুখে প্রচলিত হয়ে হিন্দি থেকে যাবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আর তার একটি সহচর ভাষা থাকবে।

৭.৭.২ রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত ও ইউরোপীয় দেশগুলির ভিন্ন প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে

রাষ্ট্রের ধর্ম প্রসঙ্গ আলোচনার পরে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রের ভাষা নির্ধারণের মূলনীতির বিষয়টি। বিষয়টি সম্পর্কে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যান্ড যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে, ভারত তার ভিন্ন মত প্রদান করেছে। প্রসঙ্গত, ১৮৩০-এ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বেলজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় যার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসি। কিন্তু বছর দশেক পরেই বেলজিয়ামদের একাংশ ফ্লেমিশদের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের ভাষাকেও ফরাসির সমমর্যাদা প্রদানের জন্য। অতঃপর, তাদের দীর্ঘকালব্যাপী এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে ১৮৯৮ সালে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাই বেলজিয়ামের রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা লাভ করে। কাজেই সেই দেশের সরকারী কাজকর্ম-ও এই দুই ভাষায় সম্পাদিত হয়।

একইভাবে সুইটজারল্যান্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্ধারিত হয় সেখানের তিনটি রাষ্ট্রভাষা-- জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। কিন্তু এই তিনটি ভাষা মূলত উচ্চতর ক্ষেত্রের কর্মকার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিচুতলার কাজকর্ম প্রধানত বিভিন্ন জেলাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সম্পাদিত হয়। দুটি অতিরিক্ত ভাষার অস্তিত্ব জেলা স্তরে থাকলেও বেসরকারিভাবে সেখানে ইংরেজী ভাষা সর্বত্র গ্রহণীয়। একাধিক ভাষা শিখনের বিষয়টি সুইসদের স্বভাবগত।

একটা রাষ্ট্রে একটাই রাষ্ট্রধর্ম প্রাধান্য পাবে- এই নীতি ইউরোপেও প্রচলিত ছিল যার ফলশ্রুতিস্বরূপ সংখ্যালঘু ইউরোপিয়ানদের সহ্য করতে হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্যাতন; বিপুল রক্তপাতও হয়েছে। কিন্তু একটি দেশে একটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ করবে, এই ধারণা অধিক সুদূরপ্রসারী। এই কারণেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে প্রভূত নিপীড়ন চলেছে, আলসাস লোরেনের লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জার্মান ও ফরাসিদের দ্বারা।

এবার আসা যাক ভারতের প্রসঙ্গে। যাঁরা একটা দেশে একটাই রাষ্ট্রধর্মের ধারণায় বিশ্বাসী নন, তাঁরা আবার একটি দেশের একাধিক রাষ্ট্রভাষার ধারণাটির বিরোধিতা করেন। বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যান্ডের থেকেও বৃহত্তর রাষ্ট্র, যার ভাষাসংখ্যা চোদ্দ- পনেরটির অধিক, সেই দেশও স্বাধীনতার প্রাক্কালে একটিমাত্র বিদেশী ভাষার সূত্র দ্বারা গ্রথিত ছিল। এর ফলস্বরূপ রাষ্ট্রভাষা যে একাধিক হতে পারেনা, এই সংস্কার জন্মলাভ করেছে। কিন্তু এই বক্তব্য প্রমাণ সাপেক্ষ কারণ তা সকলের সমর্থন, সুবিধা ও ন্যায়বোধের উপর নির্ভরশীল। ভোটনীতি প্রণয়নের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে তা সমগ্র রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে তার সমাধান নির্ণয় পাকিস্তানের ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলার মতো অদূরদর্শীতার পরিচায়ক। কাজেই এ জাতীয় সমাধানকৌশল সুইটজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মতো ভারতেও স্থায়ীত্ব পেতে পারে না। অর্ধশতক অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তামিলরা স্বাতন্ত্র্যের দাবী জানিয়েছে। অতএব এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে, ভাষাগত বিরোধজনিত কারণেই ভারতের সংহতি বিনষ্ট হবে।

৭.৭.৩ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গান্ধীজির নীতি

প্রাবন্ধিকের মতে গান্ধীজী স্বয়ং হিন্দিকে সাধারণভাবে ভাববিনিময়ের মাধ্যম করলেও নোয়াখালিতে তিনি বাংলায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তামিল ভাষায় শিখে তামিলদের সঙ্গে তামিল ভাষায়, পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য উর্দুতে কথা বলতেন। আবার তিনি ইংরেজীতেও কথা বলতেন। স্পষ্টতই হিন্দি সম্পর্কে একরোখা মনোভাব তাঁর মধ্যেও ছিল না। বরং ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে ভাববিনিময় করতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন।

৭.৭.৪ রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্মার অবস্থান

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন ভারতের মত বর্মাও রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ গ্রহণ করেছিল। তবে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর উ নু ও তাঁর দল আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে বর্মাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করলেন। ফলস্বরূপ বর্মার সেকুলার স্টেটের তকমা বিনাশপ্রাপ্ত হল। কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকাংশের ইচ্ছায় এই কার্য সমাধা হলেও এর পরিণাম হল অশুভ। পার্বত্য জাতি শান, করেন প্রভৃতির পক্ষ থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবী ঘোষিত হলে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা করায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৭.৭.৫ সহায়ক ভাষা বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?

প্রাবন্ধিকের মতে রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকলে যেভাবে মিলিত হয়েছে তা ভেঙে গেলে দেশ পুনরায় পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু এই অটুট বন্ধন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে রাষ্ট্রভাষার সনদের কারণে। এই সমস্যায় মুক্তির পথ দুটি -- আপস নতুবা হিন্দিভাষী বা অহিন্দিভাষীদের স্বার্থকে প্রশ্রয়দান। কাজেই সহচর ভাষার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া ভাঙন রোধের সহজ কোনো পথ আর নেই। অনেকের বিদেশী ইংরেজী ভাষাকে সহচর ভাষা করায় আপত্তি থাকলে তাঁরা তামিল, তেলেগু, বাংলা, মারাঠি ইত্যাদি চোদ্দ-পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষার মর্যাদা দিতে পারে তবে তাতে জটিলতা লাঘব হবে না।

৭.৭.৬ ইংরেজদের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ভাষানীতি কেমন হত বলে প্রাবন্ধিক আশঙ্কা করছেন?

প্রাবন্ধিকের মতে ইংরেজদের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে খণ্ডিত হত এবং তারা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক স্বদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিত। হিন্দি ও উর্দুর একাধিপত্য সব হিন্দু বা মুসলিম মেনে নিত না। যদি সবাই মিলে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলত, সেই সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি বা উর্দুকে নির্বাচন করলে সেক্ষেত্রে সকলের সম্মতিলাভ কঠিন হত। ১৯৪৭ সালে জিন্নসাহেব যদি ক্যাবিনেট মিশনের অভিসন্ধিতে রাজী হলে যদি অখন্ড ভারত ক্ষমতার অধিকারী হত তবে সেই সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষাও হত একাধিক। জিন্না বা গান্ধীজি কখনোই হিন্দির একচ্ছত্র অধিকার মেনে নিতেন না। সুতরাং, হয় ইংরেজীর একাধিপত্য শিরোধার্য করতে হত, নয়তো ঐক্য বজায় রাখতে কোনো যমজ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্থান দিতে হত।

৭.৭.৭ হিন্দি ও উর্দু কেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে?

প্রাবন্ধিকের মতে দেশ এখন বিভক্ত বলেই হিন্দি ও উর্দু দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে। তবে এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানরা টের পেয়েছে যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠা আসলে উর্দুভাষী মুসলমানদের অত্যাচারের দলিল। সেজন্য সেই বাঙালী মুসলিমরা বাংলাকে উর্দুর সমকক্ষ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। বেলজিয়ামের ফ্লেমিশদের মত তারাও উর্দুর এই একাধিপত্যকে মান্যতা দেয়নি। তাদের আশা এই যে তাদের এই ক্রমাগত প্রচেষ্টায় তাদের মাতৃভাষা একদিন পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। এতে উর্দুভাষীরা অস্বীকৃত হলে রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত হবে। নতুবা ইংরেজীকেই চিরকাল বহাল রাখতে হবে একমাত্র প্রতিকার হিসাবে।

৭.৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে প্রাবন্ধিকের অভিমত কী?

২। ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের কী কী সুবিধা প্রাবন্ধিক লক্ষ করেছেন?

৩। রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত ও ইউরোপীয় দেশগুলির প্রেক্ষিত ভিন্ন-এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের মত কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ইংরেজদের আগমন না ঘটলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ভাষানীতি কেমন হত বলে প্রাবন্ধিক আশংকা করছেন?

২। হিন্দি ও উর্দু কেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছে?

৩। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গান্ধীজির নীতি কিরূপ ছিল?

৪। রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্মার অবস্থান কী ছিল?

৫। সহায়ক ভাষা বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১। 'কিন্তু এর পরিণাম হল অশুভ।' —কোন্ অশুভ পরিণামের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২। 'বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিলে কাজকর্মের ভাষা।' —কোন্ তিনটি ভাষার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

৩। কোনো একটি দেশে রাষ্ট্রভাষায় সংখ্যা কটি হওয়া উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন?

৪। প্রাবন্ধিক কেন একটি দেশে 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন'-এর পক্ষপাতী?

৫। ভারতীয় সংবিধানে হিন্দি-কে কোন্ ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

একক - ৮ ❑ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক - বুদ্ধদেব বসু

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৮.৪ মূল প্রবন্ধ

৮.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ

৮.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

৮.৬.১ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতার সমস্যা কী কী?

৮.৬.২ কল্লোল যুগ ও পরবর্তী আধুনিক কবিরা

৮.৬.৩ স্বভাব-কবি কারা

৮.৬.৪ জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অভিমত

৮.৬.৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিমত

৮.৬.৬ বিষ্ণু দে-র কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিমত

৮.৬.৭ বাংলা কবিতার সমস্যা ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর লেখনীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের বিরোধী গোষ্ঠী কীভাবে তাঁর বিপক্ষে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসারী হয়ে উঠেছিলেন, সেই ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীরা।

৮.২ প্রস্তাবনা

মূল প্রবন্ধ পাঠের পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা কবিতার সমস্যাচিহ্নিতকরণ, কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ, আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-র কবিতা। স্বভাবকবির প্রসঙ্গ এবং বাংলা কবিতার সমস্যা ও ভবিষ্যতের নানা অনুষঙ্গে বর্তমান এককটি সজ্জিত।

৮.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনাপর্বের অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে, মৃত্যু ১৯৭৪

সালে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এই কবি কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্য, নাটক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। লেখালেখির সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা একাধিক বাঙালি আধুনিক কবিকে সযত্নে লালন করেছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই সাহিত্যিক ও অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রবর্তন করেন। সমসাময়িক তীব্র বিরূপ সমালোচনা থেকে রক্ষা করে জীবনানন্দ দাশকে সমর্থন করে তাঁকে বাংলা কবিতার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে দিয়েছেন স্বীকৃতি। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত মর্মবাণী তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও প্রথম যে কাব্যগ্রন্থটি তাঁকে পাঠকের দরবারে জনপ্রিয় করে তোলে, তার নাম বন্দীর বন্দনা। প্রকাশকাল ১৯৩০ সাল। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য হলেও প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরে নিজের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করার মোটেও প্রচেষ্টা করেননি। বরং 'বন্দীর বন্দনা'র মতো কবিতা লিখে নিজের কবিতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন রবিচ্ছায়ার বাইরে। বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, যে আঁধার আলোর অধিক, মরচে পড়া পেরেকের গান, দ্রৌপদীর শাড়ি, প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-কালের পুতুল, An Acre of Green grass, মহাভারতের কথা প্রভৃতি। প্রথম পার্থ ও অনাম্নী অঙ্গনা তাঁর লেখা দুটি কাব্যনাট্য। তাঁর রাত ভ'রে বৃষ্টি নামক উপন্যাসটি একসময় অশ্লীলতার দায়ী অভিযুক্ত হয়েছিল। যদিও পরে তিনি সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হন। তাঁর পত্নী প্রতিভা বসু ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক।

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তাঁর লেখনীতে গদ্যের বিস্তার ও ভাবনার যুক্তিনিষ্ঠ বয়ন, তন্ময়তার সঙ্গে বস্তুগত আশ্চর্য মেলবন্ধন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদিকে ব্যক্তিগত গদ্যের ধারা অন্যদিকে চিন্তাশীল, অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের মন ভাষা পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। এগুলির পাঠমাধুর্যে মজে থাকা বাঙালি পাঠকের সংখ্যা আজও ঈর্ষনীয়। বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ গ্রন্থ হল হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৯৬১), রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৩), আমি চঞ্চল হে (১৯৩৭), উত্তর তিরিশ (১৯৪৫), মহাভারতের কথা (১৯৭৪), কবিতার শত্রু মিত্র (১৯৭৪)।

৮.৪ মূল প্রবন্ধ

স্বভাবকবি কথাটা বোধহয় প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ ক'রে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মূক-মিল্টনি কুসংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টিকে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনোরকম শিল্প-রচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেক তার ব্যতিক্রম—বা বিপরীত—যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এ-রকম কোনোসহজ সংজ্ঞার্থ তৈরি হয়নি। এই অর্থ 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সে কথা না-বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যার মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিন সম্বন্ধ। এ কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না-থাকলে কিছুই থাকে না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে

পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হ'য়ে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তা-ই; কেননা হার্দ্যরসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ, উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বসুদ্ধ অনুভব করেননি। অথচ এ কথাও নিশ্চিত বলা যায় না। যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা ঃ রবি-রাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম নয়।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবি-কিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে বিধিলিপি? কেন? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে দিনে, আর যদিও সেই আলোকে কালো ব'লে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায়; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো ক'রে জানি না—কিংবা বুঝি না—সে কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তাঁর সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে—কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে—দ্বিতীয় দশকেও কী অবস্থা ছিলো? অপরিসর, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য—তার মধ্যে এস বহ্নিবীজ, আগ্নেয় সত্তা ঃ এ কি সহ্য করা যায়? না; দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়াপাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমন কি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি—আগে যখন এর বেশি আর-কিছু নেই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি—সেই প্রথম সংঘাতের সময়—গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায় ঃ সমালোচনার মহলে নিন্দার অবিরাম উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতিরোধহীন আত্মবিলোপে। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প—তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প; আর যারা বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পাব্লিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথে নয়, তাঁরই দুই তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণে ঃ গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে উদ্‌গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষ পর্যন্ত শুদু 'ছান্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা এঁরা অনেকেই লিখেছেন—সে-মীমাংসা এই যে তাঁা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে

অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী'; আর তার পরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'—সেই মায়ার না-ম'জে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের;—সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের বরণীয় হ'লো; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হ'লো আত্মচেতনা; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে, রিনিঠিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হলেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিকরূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত ও কুটিল; স্রোতে প্রতিস্রোতে আবর্তে নিত্যমথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো—এমনকি—খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন নীড়। যে-আশ্রমে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই করেননি। এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ; —শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে; আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল কলেন তাঁরা;—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবি-তাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন।

২

আবার বলি, এরকম না হ'য়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ কথাটা বাড়াবাড়ির মতোশোনাতে পারে। কিন্তু রবি-প্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের—দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয়; তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেন নি; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা—তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক-বিন্যাসের নমুনা—সব তৈরি আছে, আর কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলোনা সেটা—কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলোনা; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হটে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক—তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গ্যেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক-ব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে, নেই শেক্সপীয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের ব্যূহরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক—আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন

মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই; কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তা-ই মনে হয়; একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু—তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান-ইতিহাস লুঠ করেননি, পারাপার করেননি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দমনীয়। 'মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি-ঝুড়ি', এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও না—এতই সহজে তা ব'য়ে চলে, হ'য়ে যায়—মনে হয় ওরকম লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যেতে পারে—একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্তত পক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা—কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; এই নির্ভরতা, এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায়; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হতে পারে যে, ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'—রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলীকে লক্ষ্য করে, যে-সব কবিতার দুষ্যতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাতসঙ্গীতে'র সধর্মী, এমনকি সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিসেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হলো, তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারিদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে-দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তাই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা—তাই ধ'রে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ-বিমুখ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়। কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু;—শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য—আর কোনোই কারণ নেই তার।

এই রকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই সোজাসুজি', তার পিছনে কোনো আয়োজন আছে ব'লে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো রকম অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা—খাঁটি বস্তুটির অভাবে—নিজেরাই তাঁরা নিজের মন উশকে তোলেন। আর তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে;

সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী-রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো, কেন রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয়, তা বলাই বাহুল্য; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা; আবার বড়ো কবি ছোট কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোট কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি—সমালোচনার কোন-এক প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর; ইনি খাঁটি কবি কি না সেইটেই হ'লো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, সেটাকে তো প্রায় অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ-সরঞ্জাম—সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম; কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এইরকম প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে-বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা পড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা। যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে, যে-ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা' হ'য়ে উঠলো শৌখিন খেলেনা,ভাবুকতা হ'লো ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরী নীল পরীর আমোদ-প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে-মধুরতা, যে-মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে-ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর, ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ। শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর-কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে; তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দোঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিসটা সাহিত্য-রচনায় অনুমোদনযোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে; সেটি না-থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হয়ে পড়ে।* আর এই উদ্দেশ্যহীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা। এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো-এক সময়ে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিলো বাংলা

---

* এই উদ্দেশ্য মানে সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে, অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই লক্ষ্য পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক/টুকটুক তুলতুল/কোন ফুল তার তুল/তার তুল কোন ফুল/টুকটুক রঙ্গন/কিংশুক ফুল্ল/নয় নয় নিশ্চয়/নয় তার তুল্য', আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী/তুমি মধুমঞ্জরী/পুলকিত চম্পার/লহো অভিনন্দন/স্বর্ণের পাত্রে/ফাল্গুন রাত্রে/মুকুলিত মল্লিকা/মাল্যের বন্ধন। এ-দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায় একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শ হিসেবেও অতুলনীয়রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয়নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে প্রাণের যে স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হতে পেরেছে, তার ছন্দনৈপুণ্যেরও মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে, ভালো কবি না হলে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে—শেষ পর্যন্ত—ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

কাব্যে; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি, তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসারশূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধরে বাংলা ভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সত্যেন্দ্রনাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো পদ্যরচনায় পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেল যে ওদিকে আর পথ নেই—এবার ফিরতে হবে।

৩

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের সপক্ষে যাকিছু বলবার আছে তা আমি জানি; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে। সময়টা প্রতিকূল ছিল তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল বলেই প্রতিকূল ছিলো; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা—এ ছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দু-জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা—প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাত; কিন্তু কবিতার রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময়; রবীন্দ্রনাথের প্রথম, এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন— অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ-বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ— তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না— যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম* এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি; সে-কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যও কিছু বেশি; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন, কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে

* অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী। যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত গুণ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিনিচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেননি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্য-সাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই; কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন, আবার সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন করে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, মফঃস্বলে, স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না ক'রে, উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো, সে-পরিমাণে পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না। কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানাদিকে, এলেন 'স্বপন-পসারী'র সত্যেন্দ্র-দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর—কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য—বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা; বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

৪

নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে-অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে দিলেন অন্যদের মনে; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্য প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলোতা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য ব'লে উড়িয়ে দেয়াযাবে না এটাকে, কেননা চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো

ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাস দেবো—'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য বলে ধরা যায়। *অর্থাৎ রবীন্দ্রেতর হ'তে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র হ'তে হয় এই কথাটি ধরা পড়লো এতদিনে;—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো রবীন্দ্রেতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন 'কল্লোলের' ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তায় স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে' আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো; এদিকে, নজরুলের চড়া গলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিল সংহিত, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম পরিবর্তন কালপ্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দাকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দু'জনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনেরে স্বাদ এনেছেন; এদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না-ক'রে, তাকে সাধ্যমত সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিসটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো—অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে; কোনোকবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রেগেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে—'সংগ্রামই' বলা যায় এটাকে—এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে, দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবন-ভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন; আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই

* এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ-কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা। কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো-একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে, যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মান্দ্রাজি আম অথবা আম্রগন্ধী সিরাপের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতাফল, যেমন ভালো, মধুসূদনের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিকে 'কল্লোল'-কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা ফেঁসে গেলো শেষ পর্যন্ত।

জগতের অধিবাসী হ'য়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গদ্য বিষয়ের আমদনি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী কাঁখে লয়ে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'—এই রকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো, এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই; দশ বছর আগে এ-রকমটি হতেই পারতো না। সত্যেন্দ্র গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা' না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে; আর এই কবিরা সম্পূর্ণ রূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক-না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হবনে অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয়, এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য দুটো একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে; যেমন জীবনানন্দের পাক, কিংবা বিষ্ণু দে'র বা অন্য কারো-কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা। এতে অবাক হবার বা মন খারাপ করার কিছু নেই; এই রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত;—সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ বলে মনে না-ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা 'খসড়া' লেখার সময় যে-সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়—যেমন চলতিকালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে—তখনই বুঝতে হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নাই। আমি এ-কথা ব'লে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখাহয়—স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবারই জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ, প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় নতুন ক'রে স্বাচ্ছন্দ্য সাধনার সময় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হ'তে পারেন, এ-কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধ থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই, রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা

ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে; এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে এইখানে।

৮.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' বুদ্ধদেব বসু রচিত একটি দীর্ঘ সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু 'স্বভাবকবি'র সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টা করেছেন। এপ্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসকে তিনি স্বভাবকবি হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন এবং কাকে স্বভাব কবি বলা হবে, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যিনি হৃদয়ের প্রেরণায় লিখে যান কিন্তু লেখালেখি নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেন না, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তিকে মেলাতে অক্ষম- তিনিই স্বভাবকবি। প্রবন্ধিকের মতে কোনও নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কারণে যেমন বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের মতো স্বভাবকবির আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনই আবার রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেও বাংলা সাহিত্যে অনেক স্বভাবকবির জন্ম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের কথা বলেছেন এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের কবিদের কথা। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে দাশরথি রায়, রামপ্রসাদ সেন, ঈশ্বর গুপ্ত এবং মধুসূদনের বিভিন্ন একমাত্রিক কাব্যবৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক।

পরবর্তীকালে যতই খ্যাতির শিখরে থাকুননা কেন, আবির্ভাবপর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে প্রচুর বিরূপ সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন প্রাবন্ধিক। গদ্যে শরৎচন্দ্র আর কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথের দুই 'তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণ' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের কবিদের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কথা আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করে কবিতা লেখা এইসব কবিদের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলেই এঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করাই অনিবার্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের কবিত্বশক্তির এতটাই পার্থক্য ছিল যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুকরণ এঁদের সাধ্যের বাইরে ছিল। ফলত এঁরা রবীন্দ্রকবিতার বাহ্যিক অনুকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেছেন কিংবা খুব বেশি হলে রবীন্দ্রনাথের কোনও 'ছেলেমানুষী সংস্করণ' এ পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির তুলনা করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ কতটা পিছিয়ে।

এরপর নজরুল ইসলামের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উত্তাপে পুড়ে না গিয়ে নজরুলই রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রথম মৌলিক কবি যিনি বাংলা কবিতায় নিজের স্বকীয় প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে যেতে পেরেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে নজরুলের হাতেই প্রথম বাংলা কবিতায় 'রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল' ভেঙেছিল। নজরুলের উত্থানের পশ্চাতে প্রাবন্ধিক যে কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ-

সমকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নজরুলের কবিতার বিদ্রোহের সুরের সঙ্গে পাঠককে একাত্ম হতে সাহায্য করেছিল।

যেহেতু তাঁর শৈশব শহরে কাটেনি এবং তিনি কোনওদিনই শহুরে ভদ্রলোক হবার বাসনা পোষণ করেননি, বরং অনায়াসে মিশে গেছেন যাত্রাগান, লেটোগানের দলে কিংবা সৈনিকদের মধ্যে ফলত তাঁর কাছে কবিতা রচনার অভিনব কিছু প্রেক্ষাপট ও আকার সঞ্চিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের হাত ধরেই প্রথম বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের সুর জেগেছিল।

নজরুলের কবিতায় উত্তেজনাজনিত ত্রুটি থাকলেও তিনি নতুন সুর সৃষ্টি করে নিজস্ব পাঠকসমাজ তৈরি করতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রাবন্ধিক কল্লোল যুগের কবিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সমকালীন জীবনের যন্ত্রণার চিহ্ন অনুপস্থিত। সেই কারণে তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া থেকে নিজেদের এরা সরিয়ে রাখতে পারেননি। দিনের বেলা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে মন্তব্য লিখলেও রাতে এরাই রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যগ্রন্থ আওড়াতেন। অর্থাৎ কল্লোল যুগের এইসব কবিসাহিত্যিকদের রবিদ্রোহ ব্যক্তিগত নয় বরং সাহিত্যিক প্রয়োজনেই ছিল, ছিল নিজেদের আত্মপ্রকাশ করার তাগিদে। বুদ্ধদেবের মতে নজরুলের বিদ্রোহ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তরিকতার ভাব পাঠকদের মন থেকে মুছে যাবার পর মূলত 'পরিচয়' এবং 'কবিতা' পত্রিকার হাত ধরে বাংলা কবিতায় উঠে এলেন একঝাঁক নতুন কবি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলা কবিতাকে নতুন পথে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাই ভেতরে ভেতরে রবীন্দ্র-পাঠক হয়েও নিজেদের কবিতায় রবীন্দ্ররোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধাচারণ ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না। এদের কবিতার মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্যের বদলে দেখা দিল গভীর বৌদ্ধিক ছাপ। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মতো এরা বাহ্যিক অর্থে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে যেতে চাননি, বরং রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার সেই ফজলিতর আমের বদলে আতার খোঁজ নেওয়াটাই তারা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে বাংলা কবিতায় নতুন সুরের ধারা আনতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তনকে বুদ্ধদেব সময়ের দাবি হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন। এই আধুনিক কবিদের নিজেদের কাব্যবৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, সে দিকেও পাঠকদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক।

আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। নিজে এই সময়েরই একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি নিজেই প্রাবন্ধিক তাই স্বাভাবিক কারণেই নিজের কবিতাকে এই আলোচনা থেকে সরিয়ে রেখেছেন তিনি। নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে নির্লিপ্তভাবেই তিনি এই কবিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিবিড় আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন জীবনানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিন্নতা গুণগত নয়, বরং পরিমাণগত। রবীন্দ্রনাথও জীবনানন্দের মতোই যান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং প্রেম ও নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে তার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন নতুন মূল্যবোধ। জীবনানন্দের কাব্যের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন এই ইতিহাসচেতনা একদিকে যেমন সমসাময়িকতার সচেতক হয়ে উঠেছে, তেমনই আবার তা জীবনের প্রতি আরোপ করেছে এক সুগভীর সংশয়ী জিজ্ঞাসা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি রবীন্দ্রোত্তরণের পথের অন্যতম প্রধান কান্ডারী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর কাব্যে মননশীলতা এবং অবক্ষয়চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা আছে বলে লিখেছেন। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে উভয়ের মাঝখানে তিনি রেখেছেন অমিয় চক্রবর্তীকে। প্রাবন্ধিকের মতে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র ভাবধারায় অবিশ্বাসী না হয়েও কাব্যের প্রকরণগত পরিবর্তন করেছিলন এবং এনেছিলেন নতুনত্বের

ইঙ্গিত। তাঁর কবিতায় সমগ্রতার স্বাদ পাওয়া যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তিনি আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার কবিতাকে স্পষ্ট, অকপট এবং শিল্পস্বভাবে মসৃণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাকে প্রাবন্ধিক আধুনিক যুগের কর্মমত্ত মানুষের চারণকবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রাবন্দিকের মত তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজমুখী মনের অধিকারী। বাস্তব জগৎ তার কাব্যেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টি.এস.এলিয়টের সঙ্গে তুলনা করে প্রাবন্ধিক বিষ্ণু-দে কে আধুনিক সময়ের মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র অঙ্কনের সার্থক শিল্পী বলে মন্তব্য করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত সচেতন শব্দকুশল কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্র-অনুকরণেও যে সার্থক আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হতে পারে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে সে কথাই বলেছেন প্রাবন্ধিক। এ জন্য উদাহরণস্বরূপ এনেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' আর রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতার প্রসঙ্গ। তাঁর মতে 'আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো'।

পরিশেষে বাংলা কবিতার একটি সমস্যার দিকে বুদ্ধদেব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন। সেটি হল, টেকনিকসর্বস্বতা একজন নতুন কবির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের রূপ ও রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাতে গিয়ে অনেক নতুন কবিরাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। বলার ভঙ্গি নয় বরং কাব্যের আত্মাই একটি কবিতার প্রাণস্বরূপ- এওকথা স্মরণ করিয়ে প্রবন্ধের শেষে বুদ্ধদেব পুনরায় পাঠককে রবীন্দ্রনাথের আদিগন্ত ব্যপ্তির কথা মনে করিয়ে আশা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির ওপরেই পরবর্তী কালের বাঙালি কবিকে বিকশিত হতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই সূচিত হবে বাংলা কবিতার পরবর্তী বাঁক বদলের ইঙ্গিত।

৮.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

৮.৬.১ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতার সমস্যা কী কী?

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের কবিদের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কথা আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে এই কবিরা যখন লিখছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রভিভার শিখরে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক প্রভাবশালী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করে কবিতা লেখা এইসব কবিদের পক্ষে এককথায় অসম্ভব ছিল। সে কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই এঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করাই অনিবার্য ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের কবিত্বশক্তির বিরাট পার্থক্য ছিল। ফলত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুকরণ এঁদের সাধ্যের বাইরে ছিল। তাঁরা যেটা করতে পারতেন, সেটি হল রবীন্দ্র-কবিতার রূপ, রীতি, শব্দ, ছন্দ, প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়ের অনুকরণ। কিন্তু এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা লেখা যায় না। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাইরের রূপের কাছাকাছি কবিতা লিখলেও তা দিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি বড়ো গুণ যে তা কোনও অতিরিক্ত সহায়তা ছাড়াই সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে। সেই সাবলীলতা, চিন্তনের স্বচ্ছতা, বোধের গভীরতা এইসব রবীন্দ্রানুসারী কবির ছিল না। তাই এঁরা রবীন্দ্রকবিতার বাহ্যিক অনুকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেছেন কিংবা খুব বেশি হলে রবীন্দ্রনাথের কোনও 'ছেলেমানুষী সংস্করণ' এ পরিণত হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির তুলনা করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ কতটা পিছিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার উদাহরণ টেনে দেখিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কতখানি অগভীর। গদ্যে শরৎচন্দ্র আর কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথের দুই'তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণ' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সুতরাং প্রাবন্ধিকের মতে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ করার জন্য বাংলা কবিতায় কোনও নতুন সুর সৃষ্টি হয়নি এবং বাংলা কবিতা স্থবির হয়ে পড়েছিল।

প্রাবন্ধিকের মতে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের হাত ধরেই প্রথম বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের সুর জেগেছিল। নজরুলের কবিতায় উত্তেজনাজনিত ত্রুটি থাকলেও তিনি নতুন সুর সৃষ্টি করে নিজস্ব পাঠকসমাজ তৈরি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উত্তাপে পুড়ে না গিয়ে নজরুলই রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রথম মৌলিক কবি যিনি বাংলা কবিতায় নিজের স্বকীয় প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে যেতে পেরেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মতে নজরুলের হাতেই প্রথম বাংলা কবিতায় 'রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল' ভেঙেছিল। নজরুলের উত্থানের পশ্চাতে প্রাবন্ধিক যে কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল- সমকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নজরুলের কবিতার বিদ্রোহের সুরের সঙ্গে পাঠককে একাত্ম হতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া, যেহেতু তাঁর শৈশব শহরে কাটেনি এবং তিনি কোনওদিনই শহুরে ভদ্রলোক হবার বাসনা পোষণ করেননি, বরং অনায়াসে মিশে গেছেন যাত্রাগান, লেটোগানের দলে কিংবা সৈনিকদের মধ্যে ফলত তাঁর কাছে কবিতা রচনার অভিনব কিছু প্রেক্ষাপট ও আকর সঞ্চিত হয়েছিল।

৮.৬.২ কল্লোল যুগ ও পরবর্তী আধুনিক কবিরা

প্রাবন্ধিকের মতে কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ধারণা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সমকালীন জীবনের যন্ত্রণার চিহ্ন অনুপস্থিত। সেই কারণে তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া থেকে নিজেদের এরা সরিয়ে রাখতে পারেননি। দিনের বেলা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে মন্তব্য লিখলেও রাতে এরাই রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যগ্রন্থ আওড়াতেন। অর্থাৎ কল্লোল যুগের এইসব কবিসাহিত্যিকদের রবিদ্রোহ ব্যক্তিগত নয় বরং সাহিত্যিক প্রয়োজনেই ছিল, -ছিল নিজেদের আত্মপ্রকাশ করার তাগিদে। বুদ্ধদেবের মতে নজরুলের বিদ্রোহ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তরিকতার ভাব পাঠকদের মন থেকে মুছে যাবার পর মূলত 'পরিচয়' এবং 'কবিতা' পত্রিকার হাত ধরে বাংলা কবিতায় উঠে এলেন একঝাঁক নতুন কবি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলা কবিতাকে নতুন পথে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাই ভেতরে ভেতরে রবীন্দ্র-পাঠক হয়েও নিজেদের কবিতায় রবীন্দ্ররোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধাচারণ ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না। এদের কবিতার মধ্যে হৃদায়াবেগের আতিশয্যের বদলে দেখা দিল গভীর বৌদ্ধিক ছাপ। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মতো এরা বাহ্যিক অর্থে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে যেতে চাননি, বরং রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার সেই ফজলিতর আমের বদলে আতার খোঁজ নেওয়াটাই তারা ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে বাংলা কবিতায় নতুন সুরের ধারা আনতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তনকে বুদ্ধদেব সময়ের দাবি হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন। এই আধুনিক কবিদের নিজেদের কাব্যবৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, সে দিকেও পাঠকদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক।

আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। নিজে এই সময়েরই একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হওয়া

সত্ত্বেও যেহেতু তিনি নিজেই প্রাবন্ধিক তাই স্বাভাবিক কারণেই নিজের কবিতাকে এই আলোচনা থেকে সরিয়ে রেখেছেন তিনি। নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে নির্লিপ্তভাবেই তিনি এই কবিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিবিড় আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন জীবনানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিন্নতা গুণগত নয়, বরং পরিমাণগত। রবীন্দ্রনাথও জীবনানন্দের মতোই যান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং প্রেম ও নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে তার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন নতুন মূল্যবোধ। জীবনানন্দের কাব্যের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন এই ইতিহাসচেতনা একদিকে যেমন সমসাময়িকতার সচেতক হয়ে উঠেছে, তেমনই আবার তা জীবনের প্রতি আরোপ করেছে এক সুগভীর সংশয়ী জিজ্ঞাসা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি রবীন্দ্রোত্তরণের পথের অন্যতম প্রধান কান্ডারী হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর কাব্যে মননশীলতা এবং অবক্ষয়চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা আছে বলে লিখেছেন। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে উভয়ের মাঝখানে তিনি রেখেছেন অমিয় চক্রবর্তীকে। প্রাবন্ধিকের মতে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র ভাবধারায় অবিশ্বাসী না হয়েও কাব্যের প্রকরণগত পরিবর্তন করেছিলন এবং এনেছিলেন নতুনত্বের ইঙ্গিত। তাঁর কবিতায় সমগ্রতার স্বাদ পাওয়া যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে তিনি আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার কবিতাকে স্পষ্ট, অকপট এবং শিল্পস্বভাবে মসৃণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাকে প্রাবন্ধিক আধুনিক যুগের কর্মমত্ত মানুষের চারণকবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মত তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজমুখী মনের অধিকারী। বাস্তব জগৎ তার কাব্যেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের সঙ্গে তুলনা করে প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে-কে আধুনিক সময়ের মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র অঙ্কনের সার্থক শিল্পী বলে মন্তব্য করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত সচেতন শব্দকুশল কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্র-অনুকরণেও যে সার্থক আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হতে পারে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে সে কথাই বলেছেন প্রাবন্ধিক। এ জন্য উদাহরণস্বরূপ এনেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' আর রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতার প্রসঙ্গ। তাঁর মতে 'আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো'।

এইভাবে নিজে একজন আধুনিক কবি হয়েও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্লিপ্তভাবে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু কল্লোল যুগ এবং তার পরবর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিবিড় এবং মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন।

৮.৬.৩ স্বভাব-কবি কারা

প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু 'স্বভাবকবি'র সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টা করেছেন। এপ্রসঙ্গে গোবিন্দ দাসকে তিনি স্বভাবকবি হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন এবং কাকে স্বভাব কবি বলা হবে, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যিনি হৃদয়ের প্রেরণায় লিখে যান কিন্তু লেখালেখি নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেন্না, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তিকে মেলাতে অক্ষম-তিনিই স্বভাবকবি। প্রবন্ধিকের মতে কোনও নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কারণে যেমন বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের মতো স্বভাবকবির আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনই আবার রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেও বাংলা সাহিত্যে অনেক স্বভাবকবির জন্ম হয়েছিল।

৮.৬.৪ জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অভিমত

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে কল্লোল যুগ ও তার পরের কবিদের কথা বলতে গিয়ে

জীবনানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। জীবনানন্দকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জীবনানন্দের মতোই যান্ত্রিক সভ্যতার অবক্ষয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং প্রেম ও নবজীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে তার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন নতুন মূল্যবোধ। জীবনানন্দের কাব্যের ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে বলা যায় এই ইতিহাসচেতনা একদিকে যেমন সমসাময়িকতার সচেতক হয়ে উঠেছে, তেমনই আবার তা জীবনের প্রতি আরোপ করেছে এক সুগভীর সংশয়ী জিজ্ঞাসা।

৮.৬.৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিমত

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে কল্লোল যুগ ও তার পরের কবিদের কথা বলতে গিয়ে সব শেষে এসে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত সচেতন শব্দকুশল কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্র-অনুকরণেও যে সার্থক আধুনিক কবিতার সৃষ্টি হতে পারে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে সে কথাই বলেছেন প্রাবন্ধিক। এ জন্য উদাহরণস্বরূপ আনা যেতে পারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ' আর রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতার প্রসঙ্গ। তাঁর মতে 'আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো'।

৮.৬.৬ বিষ্ণু দে-র কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিমত

প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে কল্লোল যুগ ও তার পরের কবিদের কথা বলতে গিয়ে বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মত তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজমুখী মনের অধিকারী। বাস্তব জগৎ তার কাব্যেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় বিষ্ণু দে আধুনিক সময়ের মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণু চিত্র অঙ্কনের একজন সার্থক শিল্পী।

৮.৬.৭ বাংলা কবিতার সমস্যা ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

পরিশেষে বাংলা কবিতার একটি সমস্যার দিকে বুদ্ধদেব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন। সেটি হল, টেকনিকসর্বস্বতা একজন নতুন কবির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের রূপ ও রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখাতে গিয়ে অনেক নতুন কবিরাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না। বলার ভঙ্গি নয় বরং কাব্যের আত্মাই একটি কবিতার প্রাণস্বরূপ- এওকথা স্মরণ করিয়ে প্রবন্ধের শেষে বুদ্ধদেব পুনরায় পাঠককে রবীন্দ্রনাথের আদিগন্ত ব্যপ্তির কথা মনে করিয়ে আশা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির ওপরেই পরবর্তী কালের বাঙালি কবিকে বিকশিত হতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই সূচিত হবে বাংলা কবিতার পরবর্তী বাঁক বদলের ইঙ্গিত।

৮.৭ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা কবিতার কী কী সমস্যার কথা প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন?

২। নজরুল ইসলামের কবিতা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মত কী?

৩। কল্লোল যুগ ও তারপরের আধুনিক কবিদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণ কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। স্বভাব-কবি বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?

২। রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মূল সমস্যা কী ছিল?

৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মত কী?

৪। প্রবন্ধের শেষে এসে প্রাবন্ধিক আধুনিক কবিতার কোন সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন?

৫। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের অভিমত কী?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। প্রাবন্ধিকের মতে 'স্বভাবকবি' শব্দটি প্রথম কাকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত হয়েছিল?

২। রবীন্দ্রনাথের দুই 'তরলিত আরামদায়ক সংস্করণ' বলতে প্রাবন্ধিক কী নির্দেশ করেছেন?

৩। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি কে?

৪। প্রাবন্ধিকের মতে, কোন্ গোষ্ঠীর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রেতর হওয়া?

৫। 'বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল' পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতার অন্তর্ভুক্ত?

একক : ৯ ❑ সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব — বিনয় ঘোষ

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

৯.৪ মূল প্রবন্ধ

৯.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ

৯.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ ১

৯.৭ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ ২

৯.৮ অনুশীলনী

৯.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বিনয় ঘোষের একটি প্রবন্ধের সূত্রে প্রাবন্ধিকের লিখনশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। কীভাবে একটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে সাংস্কৃতিক দূরত্ব গড়ে ওঠে, সেই দূরত্ব দূরীকরণের সম্ভাব্য পন্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে ঋদ্ধ হবে শিক্ষার্থীরা।

৯.২ প্রস্তাবনা

প্রবন্ধের মূল পাঠের পাশাপাশি কোনো একটি জাতির সংস্কৃতিধারার বিশ্লেষণ, সংস্কৃতির প্রসারণ, ভৌগোলিক প্রান্তিকতার কারণে কীভাবে একই সমাজে সাংস্কৃতিক দূরত্ব রচিত হয়। কীভাবে গড়ে ওঠে অনুন্নত সমাজগোষ্ঠী, কীভাবে-ই-বা সেই সমস্যার সমাধানে গড়ে উঠতে পারে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ—ইত্যাদির সুচিন্তিত আলোচনায় এককটি সজ্জিত।

৯.৩ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

১৯১৭ সালের ১৪ জুন কলিকাতার মনোহরপুকুরে বিনয় ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ ছিলেন একজন সামান্য কেরানি, যিনি পরবর্তীতে সততা ও কর্মকুশলতার জোরে উচ্চপদে উঠেছিলেন। মাতা ছিলেন সরসীবালা দেবি। তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছিল যশোর জেলার গোরাপাড়া গ্রামে। মাট্রিকুলেশ পরিক্ষায় উত্তির্ন হবার পর তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে আই.এ. এবং অর্থনীতিতে স্নাতক হন। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ন হন। তাঁর কর্মজীবনের সুত্রপাত ঘটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে তিনি 'যুগান্তর', দৈনিক বসুমতী', সাপ্তাহিক 'অরণি' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছিলেন। ১৯৪১ সালে সিলেটের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কণ্যা বীণা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বীণা দেবী আজীবন ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বিনয় ঘোষ 'কালপেঁচা'

ছদ্মনামে লিখতেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসি একজন সমাজ সচেতন মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেন নি। মাত্র তেষট্টি বছর বয়সে ১৯৮০সালের ২৫জুলাই কলকাতায় এই অসামাণ্য প্রাবন্ধিক ও সমাজ-গবেষকের মৃত্যু হয়।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বিনয় ঘোষ এক অনন্য প্রতিভা। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা এবং গভীর জ্ঞান তাঁকে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একজন যথার্থ শিল্পী করে তুলেছে। বিনয় ঘোষের প্রবন্ধের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল আবেগবিহীন ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও বিষয় নিয়ে সুগভীর বিশ্লেষণ। তাঁর প্রবন্ধের শরীর সুঠাম, মেদবিবর্জিত। তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের পাঠ্যপ্রবন্ধটির মধ্য দিয়েও বিনয় ঘোষের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিবৃত হয়েছে।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ' (১৯৪০), 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' (১৯৬১), 'জনসভার সাহিত্য' (১৯৫৫), 'ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ' (১৯৪২), 'নবজাগৃতি' (১৯৪৮), মানব সভ্যতার ধারা (১৯৫৪), পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭), 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' (১৯৫৭, ১৯৫৯), সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৯৬৮), বরণীয় বাঙালি (১৯৫০), 'মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' (১৯৭৩), বাংলার বিদ্বৎসমাজ (১৯৭৩), বাদশাহী আমল (১৯৭৮) ইত্যাদি।

৯.৪ মূল প্রবন্ধ

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের কয়েকটি এই ধরনের রীতির এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় আমরা বিচার করবো। কিন্তু তা করার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার।

যে-কোনো জাতির যে-কোনো দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞজনীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (Persistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। অতীতকালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমনকি সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধ্যানধারণা, উৎসব পার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে, অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, যেখানে অতীতকালের বহু মৃত ধ্যানধারণার ভূতপ্রেত যে-কোনো সময় দৌরাত্ম্য করার জন্য যেন ওৎপেতে রয়েছে। যেমন 'গুরুবাদ' বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও, আধুনিককালে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই কমেছে ও কমছে, কিন্তু আজও তার কেন একেবারে লোপ পায়নি ভাবলে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে-যুগে সমাজের তাগিদ নূতন-নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু

হয়। নূতন-পুরাতন উপাদানের মিল-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন-নূতন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সঙ্গে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায় এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়, এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এই জন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে, কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু'একটি উপকরণের যোগবিয়োগ হয় না। নূতন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতিরই একটা বড়ো দিগক হল 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। তা ছাড়া, সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে 'ডিফিউসন' বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনের গতি কালিক বলে 'ভার্টিক্যাল', এবং 'ডিফিউসনের' গতি ভৌগোলিক বলে 'হরাইজন্টাল'। সংস্কৃতির গভীরতা হল 'ট্র্যাডিশন', এবং প্রসারতা হল 'ডিফিউসন'। একটির গতিকাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল 'ডিফিউসনের' বা প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-বণিক-গোপ-সদগোপ-মাহিষ্য-কৈবর্ত, অথবা হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানিরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusion-ক বলেন 'inter-societal transmission of culture in space', এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা tradition-কে বলেন 'intra-societal transmission of culture in time'.

উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য যখন নূতন কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়, তখন তার প্রসারের গতিপথ যদি কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, অথবা সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে না প্রসারিত হতে পারে, তাহলে সংকট দেখা দেয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য নব্যসংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়, এবং কেন্দ্রবহির্ভূত কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সেই কারণে অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা 'মার্জিন্যাল কালচার' বা 'প্রান্তীয় সংস্কৃতি' বলেন।

Cultures are retarded because of their peripheral or marginal position in gewography. (Kroeber)

সংস্কৃতির ডিফিউসন বা প্রসারণের গতি হল, কেন্দ্র বা 'সেন্টার' থেকে 'মার্জিন' বা প্রান্তের দিকে। কিন্তু এই গতির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসার হতেও যে তত বিলম্ব হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাধারণত তাই হবার কথা, কিন্তু তা নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি অঞ্চল দূরের অঞ্চলের তুলনায় অনেকবেশি অনগ্রসর। যেমন, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক বেশি অনুন্নত। তাছাড়া, কলকাতা শহরের মধ্যেই এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পড়েনি দেখা যায়। কোনো উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে এই ধরনের কোনো অনুন্নত অঞ্চল থাকলে তাকে 'ইন্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। কারণ—

Some cultures remain retarded even though they are situated within the sphere of higher productive centres, and therefore they are called *internally marginal*.

সংস্কৃতির এই 'internal marginality' বা আন্তর্প্রান্তিকতা যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থত্রার অসুবিধার জন্য ঘটতে পারে, আবার সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং জাতিবর্ণগত দুরত্বের জন্যও ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তীয়তার বা মার্জিন্যালিটির সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাইরের ও ভিতরের, দুই ধরনের প্রান্তীয়তাই বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব (Spatial isolation and distance) এবং ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান (Social isolation and distance)। এই দুই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দুর করতে না পারলে, বাংলা দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরেও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না. এবং তা না প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় উন্নয়রেণর কাজকর্ম পদে-পদে ব্যাহত হবে।

কমবেশি সব যুগেই দেখা যায়, যুগসংস্কৃতির কতগুলি বড়-বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রদান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলা দেশে যেমন ছিল গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি। তার বাইরে ছিল চিরপ্রবাহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট-কালচার' এবং এই গ্রামীণ সংস্কৃতি, যা প্রধানত 'ফোক-কালচার', দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হত। রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোর্ট-কালচার যে কদাচ বিচ্ছুরিত হত না তা নয়। হত বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ প্রায় দৈবঘটনার সামিল ছিল বলা যায়। তার কারণ, একালের মতো সেকালে যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আদৌ কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই যোগাযোগের অভাবজনিত বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা। আধুনিককালেও দেখা যায়, সেই রাজধানীই যুগসংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্র বা হেডকোয়ার্টার হয়ে রয়েছে, তবে যানবাহনের ও যোগাযোগের প্রসারের ফলে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বাইরে। এইসব উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতিধারা শাখাপ্রশাখা মেলে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং গত প্রায় একশো বছরের উপর রেলগাড়ি ও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অটোমোবিলের চলাচলের পরেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় সংস্কৃতি-অঞ্চল এত বেশি সংখ্যায় আজও রয়েছে, যা বাস্তবিকই ভয়াবহ বলে মনে হয়। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখনও এমন সব গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন চিঠি বিলি হয়, এবং ডুলিতে করে লোকে চলাফেরা করে। হাওড়া জেলাতেই এরকম বহু গ্রাম আজও রয়েছে। এইসব গ্রামের অতি-বৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনে হয় যেন সভ্যতার আদিকালের কোনো প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কলকাতা বা হাওড়া শহর কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল 'রেডিয়াস' নিয়ে যদি একটা বৃত টানা যায়, তাহলে বড় বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যেই এই ধরনের কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। অটোমোবিলের যুগে এই প্রান্তীয়তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হবার কথা, কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অচলতা আজও অটোর স্বতঃস্ফূর্ত গতি একেবারে ভাঙতে পারেনি। তা ভাঙতে না পারলে, এবং গ্রাম শহর-নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে, জাতির সংস্কৃতি কখনও জনসাধারণের সম্পদ হবে না, মুষ্টিমেয়র ভৌগবিলাসের সামগ্রী হয়ে তাকবে। তার চেয়েও ক্ষতিকর ফল হবে এই (এবং যা অধিকাংশ প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে হয়েছে দেখা যায়) যে নগর-শহরের পাঁচমিশালির সংস্কৃতির তলানিটুকু চুঁইয়ে এসে প্রান্তীয় অঞ্চলের জড়ত্বকে আরও বেশি বিষিয়ে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতির ভালো টুকুর বদলে মন্দটুকুই তার ভাগ্যে জুটবে, এবং সেই মন্দের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে উঠবে তার জড়জীবন। বাংলাদেশের প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতির ভিতরের প্রান্তীয়তা কম নেই। বাইরের তুলনায় ভিতরের এই ব্যবধান আরও অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু কোনো সংস্কৃতিবৃত্তের ভিতরের প্রান্তীয়তার প্রধান কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (Social distance)। ভৌগোলিক দূরত্ব যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে অপসারিত করা সম্ভব ও সহজ, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে এবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণের বা 'হরাইজন্টাল ডিফিউসনে'র গতি বাড়লে, বিভিন্ন লোকস্তরের সামাজিক দূরত্বও ধীরে-ধীরে কমতে থাকে, কিন্তু সেই কমা না কমার ব্যাপার অনেকাংশে নির্ভর করে দূরত্বের ধরনের উপর। বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার উর্ধ্বাব বা 'ভার্টিক্যাল' গভীরতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিলম্বিত তালে করে, কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিবর্ণ বিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাব প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নূতন সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মানসিক উপাদান যখন কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই যুগের সমাজের সচেতন উপরের জনস্তরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ তাকে, তার নিচে খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই 'সমসাময়িক' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

The fact is that only a handful of people in any age are its true contemporaries, Only sluggishly do the mass of people respond to the currents that are sweeping through the ruling classes or the intellectual elite; if this is mainly true even today, it was more so before universal literacy had quickened the space of communication. (Lewis Mumford).

প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকই তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির মুখপাত্র হন, এবং তাঁদেরই কেবল সেই যুগের বিচারে 'সমসাময়িক' বলা যায়। নূতন যুগের আবির্ভাবকালে সংস্কৃতিকর্মের বেশিরভাগ উদ্যম তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাকে, তার শতাংশের একাংশও বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তার কারণ, সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ইনি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। যুগে-যুগে যুগ-সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তকশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান তাই ক্রমে দুস্তর হয়েছে। প্রাচীন যুগের চেয়ে মধ্যযুগে ব্যবধান বেড়েছে, এবং তার চেয়ে আরও অনেকবেশি বেড়েছে আধুনিক যুগে। তার কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দূরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সেই অনুপাতে অবসান হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যত বেড়েছে, সামাজিক গবীরতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতিসম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ তাই ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, স্বাভাবিক গতিতে সংস্কৃতির টেক্‌নোলজিক্যাল উপাদানের বিকাশের পথে (যেমন যানবাহন, কলকারখানা, শহর-নগর ইত্যাদি) তাঁরা নানারকমের অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে একালের নাগরিক সমাজের ব্যবধান ক্রমে বেড়েছে, এবং বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃতি, অবনতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। 'ট্রাইবাল' যুগ থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আধুনিক যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যেও স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে রয়েছে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ হল, মনের বিকেন্দ্রণ (delocalisation of

mind)। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের স্বাভাবিক গতি এই বিকেন্দ্রণের দিকে, কিন্তু এর কোনও চিহ্ন বাংলার গ্রাম্যসমাজে আজও বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য বা অন্য কোনো সমাজে বিরল বলা চলে। সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে এই প্রবল অন্তরায় যতদিন না অপসারিত করা সম্ভব হবে, ততদিন কেবল সংস্কৃতির 'হরাইজন্টাল' প্রসারে সমস্যার সমাধান হবে না। বঙ্গ সংস্কৃতির রূপায়ণে জাতিবর্ণসম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে কাজ করেছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো, বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হল সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে (Social de-distantiation)। সংস্কৃতিবিচারের দিক থেকে এই সামাজিক স্তরীয় দূরত্বের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত হল,

Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals... This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies...In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance. (Karl Mannheim).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোনো নিটোল রূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পরাবিরোধী ধারা-উপধারা ও উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। জাতিবর্ণ-ভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের তারতম্য আছে দেখা যায়। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য তো আছেই। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বোঝায়, এরকম একটা কেতাবী ধারণা আমাদের অনেকের মনে আছে। কিন্তু সরজমিনে যাঁরা সেই সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই তার জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হবেন। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম্য-সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শ্রেণী দূরত্বকেও এই সামাজিক দূরত্ব ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে যেখানকার বসতিবিন্যাসের মধ্যে বর্ণপ্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণীপ্রাধান্য (যা শহরে দেখা যায়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতিবিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেকবেশি দুস্তর। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে একটা দুস্তর মানসিক দূরত্বও রচিত হয়েছে। গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের বাইরের মেলামেশায়, অথবা গ্রাম্য জীবনের সরল প্রীতির সম্পর্কের আবরণে অনেক সময় এই সামাজিক দূরত্ব ঢাকা থাকে। কিন্তু হাজার মেলামেশাতেও যে গ্রামের বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব ঘুচে যায়নি তা যে-কেউ গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বুঝতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই সামাজিক দূরত্বকে 'মানসিক ব্যবধান'

বললেও ভুল হয় না। একজন বিখ্যাত মানস-বিজ্ঞানী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই 'সামাজিক দূরত্বে'র প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাহাজ ক্রমে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দরের শহরটিও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এমন সময় গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। মনে হল, শহরটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। একেই বলে 'ডিস্ট্যান্টিয়েশন'।

This is 'distantiation', for the town remains spatially near; it becomes more distant only in a psychological sense. (E. Bullough).

কুলগত বর্ণগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্যসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজেরও) এটা একটা কঠিন জটিল সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব না থাকলেও যে এই মানসিক দূরত্ব সহজে ঘুচবে, তা মনে হয় না। তা যদি ঘুচত, তাহলে একই গ্রামে ও অঞ্চলে উন্নত জাতিবর্ণের পাশাপাশি অসংখ্য অনুন্নত উপজাতি-বর্ণের অস্তিত্ব থাকত না।

এখানে সংস্কৃতিবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি বড় প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে। প্রশ্নটি হল: সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর? এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল: সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসনে'র প্রত্যয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণই 'ডিভিউসন'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞনের প্রগতির উপর এই ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূর প্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে, কিন্তু যে সমাজের 'ভার্টিক্যাল মোবিলিটি' কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি, সেই সমাজে তার দূরপ্রসারী কোনো প্রতিক্রিয়া না হবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং কেবল যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপকরণ জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে চলবে না। তার ফলে সমাজের ঊর্ধ্বাধ গতি খানিকটা বাড়বে ঠিকই, কিন্তু এতটা বাড়বে না যাতে দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটতে পারে। সেই ব্যবধান দূর করতে হলে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। যান্ত্রিক যানবাহনের সঙ্গে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তার হতে থাকে, যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের আলোক শহর-নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামের সর্বনিম্ন জনস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাহলে সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ গতিও বাড়তে পারে এবং তার সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপায়ণও সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও মানসিক দূরত্বের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক আছে, যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সেই দিকটা হল, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বাহক দুটি বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে, দুই সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও মিলন-মিশ্রণের দিক। দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন'।

> We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long-continued contact, but without complete blending of the two cultures. (Gillin and Gillin : *Cultural Sociology*)

'অ্যাকালচারেশনে'র সঙ্গে 'ডিফিউসনে'র সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু 'ডিফিউসনে'র জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নূতন আইডিয়া বা আদর্শ, অথবা সংস্কৃতির কোনো নূতন টেকনোলজিক্যাল উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহুদূর কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতিমিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমের হতে পারে: ১। দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে; ২। ভিনদেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩। বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। সাধারণত এই তিন উপায়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকালচারেশনে'র গুরুত্ব খুব বেশি। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। প্রাগৈতিহাসের দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ডাচ্-ফরাসী-ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। তা ছাড়া, নানা উপজাতির ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের নিদর্শনও বাংলার সংস্কৃতিতে কম নেই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল বাঙালি খ্রিস্টানরা। বাঙালি মুসলমানদের সাধারণ জনস্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি লোকায়ত স্তরে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। বাংলার বহু লোকদেবতা ও পীরগাজী এই 'অ্যাকালচারেশনে'র সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে বিরাজ করছেন। বাংলাদেশের সাঁওতাল, মুন্ডা, বাউরী প্রভৃতি অনেক উপজাতির সংস্কৃতির মধ্যে উন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এমনকি বৈষ্ণব-শাক্ত, শৈব-তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মপন্থীরা এক-একটি অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশি পরিমাণে বাংলা দেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে তেমন অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকালচারেশনে'র ধর্মই তাই। যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক 'প্যার্ন' ও 'কম্প্লেক্সে'র উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হতে থাকে, তাহলে সে-দেশের সংস্কৃতি সহজে জড়ত্ব লাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে, জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সজীবতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার দেনাচক্রবৃদ্ধি হারে তাকে শুধতে হবে। অতীতের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর উন্নতি-প্রগতির আওয়াজ, কোনো কিছুতেই তার অনিবার্য স্থবিরত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। কেবল ফাঁকা আওয়াজ এবং তার সঙ্গে দিকভ্রান্ত ব্যর্থ প্রয়াসই সার হবে। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে নানারকমের অসঙ্গতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দেবে, যা বর্তমানে কিছু কিছু দেখা দিচ্ছে, এবং সমাজ শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। সমাজকল্যাণের জন্য তাই বাংলার যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও ঊর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য এবং সেই প্রসারের পথে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্ত অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তা না হলে অনিবার্য সংস্কৃতিসংকট সমগ্র বাংলার সমাজকে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।

৯.৫ মূল প্রবন্ধের সারাংশ

যেকোনও জাতির সাংস্কৃতিক ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি অতীতকাল থেকে জাতির জীবনধারার সঙ্গে মিশে আছে এবং মনের মধ্যে লাভ করেছে এক দীর্ঘস্থায়ী আসন, যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা সুদূরকাল থেকে বংশপরম্পরায় বহন করে আসি এবং সহজে পরিত্যাগ করতে পারি না,- সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই স্থিতি হিসেবে মনে করা যেতে পারে। 'সৃষ্টি' হল সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে নতুন কিছু উদ্ভাবন, আবিষ্কারের যে তাগিদ, তাকেই বলা যেতে পারে 'সৃষ্টি'। কালের নিয়মে সামাজিক কারণে সংস্কৃতিতে নতুন উপাদানসমূহের আবির্ভাব হয়। তখন নতুন ও পুরাতন উপাদানের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়। সেই সংঘাতের ফলে অনেক পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন ও পুরাতন উপাদানের মিলিত ক্রিয়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতিকে এইকারণে 'কনফিগারেসন' বলা হয়। এই নতুন ও পুরাতন সাংস্কৃতিক উপাদানের সংঘর্ষকে সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'লয়' বলা হয়। উল্লেখ্য যে সংস্কৃতির প্রথম উপাদান 'স্থিতি'র তুলনায় তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'সৃষ্টি' ও 'লয়' অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। আর তাই এই দুটি উপাদানের প্রভাব 'স্থিতি'র থেকে অনেক বেশি।

সংস্কৃতির উপাদানের প্রথম বৈশিষ্ট্য 'স্থিতি'র একটা বড়ো দিককে ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। এই ঐতিহ্যের বিকশিত হবার প্রধান আশ্রয়স্থল সংস্কৃতির ভেতরে থাকা ভাল গুণগুলি। সংস্কৃতির কালগত প্রবাহকে ঐতিহ্য বলা হয়। সংস্কৃতির যেমন কালগত প্রবাহ রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভৌগোলিক প্রবাহও। অর্থাৎ স্থান এবং কাল উভয়ের পরিবর্তনেই সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহকে বলা হয় 'ডিফিউসন'। অর্থাৎ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতির ধারার যে ভিন্নতা দেখা যায়, তা হল 'ডিফিউসন'। যেমন বাংলাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম বা উত্তর থেকে দক্ষিণে যে সংস্কৃতির ধারা, তাকে 'ডিফিউসন' বলা হবে। আবার, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সময়ের নিরিখে সংস্কৃতির যে ধারা পরিলক্ষিত হয়, তাকে ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব সাংস্কৃতিক সংস্কার দেখা যায়, তাকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। এই কারণে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক প্রসার বা ডিফিউসন-কে বলেছেন—Inter-societal transmission of culture in space আর ঐতিহ্যকে বলেছেন Intra-societal transmission of culture in time.

সংস্কৃতির ধর্ম যদি উদ্ভাবন শক্তি হয়, তবে তার প্রাণশক্তি হল ডিফিউসন বা প্রসার। তাই সামাজিক বা ঐতিহাসিক কারণে প্রসারের পথ বন্ধ হলে সংস্কৃতিতে সংকট দেখা দেয়। যদি সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে কোনও স্থানের সংস্কৃতির প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাকে প্রান্তীয় সংস্কৃতি বা মার্জিন্যাল কালচার বলা হয়।

প্রসারের স্বাভাবিক গতিপথ কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে। তাই কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দূরত্ব যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসারের গতিবেগ ততই ধীর এবং বাধাপ্রাপ্ত হবে এরকমটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর বিপরীত ঘটনা দেখা যায়। অর্থাৎ দেখা যায় কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনও অঞ্চলের সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী কোনও অঞ্চলের সংস্কৃতির তুলনায় অধিক অনুন্নত। কোনও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিসীমার মধ্যেই কোনও অনুন্নত অঞ্চল উপস্থিত থাকলে তাকে 'ইন্টারন্যালি মার্জিন্যাল' বা 'আন্তর্পান্তিক' বলা হয়। এই আন্তর্পান্তিকতার

কারণ যেমন যানবাহনের অসুবিধা হতে পারে, তেমনই হতে পারে সামাজিক শ্রেণিগত জাতিগত বা বর্ণগত পার্থক্যের কারণেও।

সব যুগেই শাসকের দরবার ও রাজধানীগুলি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হত। আর এই কেন্দ্রের বাইইরে প্রান্তে অবস্থান করত গ্রামীণ সংস্কৃতি। একটা সময় পর্যন্ত যোগাযোগ মাধ্যম এবং যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে এইসব গ্রামীণ প্রান্তিক সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হলেও কেন্দ্র থেকে খুব দূরবর্তী নয়, এরকম অনেক অঞ্চলেও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেনি এবং ফলত প্রান্তিক সংস্কৃতিই বজায় আছে। কলকাতা বা হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করে তিরিশ চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যেই এরকম বেশ কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যায় যেগুলি ভৌগোলিক প্রান্তিকতার নিদর্শন। এই অচলাবস্থা কাটাতে না পারলে সংস্কৃতির ক্ষতি হবে। জাতির সংস্কৃতি ও সম্পদ কোনওদিন জনগণের সংস্কৃতি ও সম্পদে পরিণত হতে পারবে না। তার ওপর কেন্দ্রের সংস্কৃতির যৎসামান্য অংশ চুঁইয়ে চুঁইয়ে যদি প্রান্তীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর পড়ে, তাতে গ্রামীণ সংস্কৃতির ক্ষতিসাধন হবে। শহুরে নাগরিক জীবনের সংস্কৃতির ভালো অংশের বদলে খারাপ অংশটাই সেক্ষেত্রে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গৃহীত হবে।

সংস্কৃতি-কেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও অনেক সময় সংস্কৃতিকেন্দ্রের ভেতরেও অনুন্নত সাংস্কৃতিক অঞ্চল দেখা যায়। এই ধরনের ঘটনার কারণকে সংস্কৃতির 'সামাজিক দূরত্ব' বলা যেতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্রস্থ প্রান্তীয়তা ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার থেকে অনেক বেশি বিপদজনক। কারণ ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা যানবাহনের আধিক্য দিয়ে দূর করা সম্ভব কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজ উপায়ে দূর করা যায় না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সংস্কৃতির ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেএবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের গতিবেগ বাড়লে সামাজিক দুরত্বও কমে কিন্তু তা নির্ভর করে সামাজিক দূরত্ব আসলে কী ধরনের, তার ওপর। বিজ্ঞানীরা বলেন সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার তার ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার বা গভীরতাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সেই নিয়ন্ত্রণের বেগ খুবই ধীর। কারণ সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং জাতিবর্ণের ওপর ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার নির্ভরশীল। ফলে ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার হলে তা সমাজের ওপরতলার মধ্যেই প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। তা খুব বেশগি গভীরতা লাভ করতে পারেনা। এজন্য দেখা যায় বিভিন্ন যুগে খুব কম সংখ্যক মানুষই সমকালীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে সক্ষম হন। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাদের বিরাট ব্যবধান থাকে। সংস্কৃতির প্রসারের প্রভাব কোনও যুগেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগসাধারণের কাছে পৌঁছায়নি। বরং সংস্কৃতির এই সমসাময়িক মুষ্টিমেয় প্রবর্তক অংশের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান যুগে যুগে ক্রমশ বেড়েছে।সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে এসে এই ব্যবধান সবচেয়ে প্রকট হয়েছে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক দূরত্ব কমলেও সামাজিক দূরত্ব কমেনি এবং সামাজিক গভীরতা বাড়েনি। ফলে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার ব্রিটিশ আমলে বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নাগরিক সংস্কৃতির ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি সংস্কৃতির কালগত প্রবাহ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে হতে একসময় বিকৃতি, অবনতি এবং বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য মনের বিকেন্দ্রিকরণের কোনও চিহ্ন বর্তমান গ্রামীণ সমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল প্রসারের পথে প্রধান বাধা হল জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। এই বৈষম্যই ভারতে সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বের প্রধান কারণ। এর সঙ্গে আদুনিক যুগে সংযুক্ত হয়েছে শ্রেণিগত বৈষম্য। উভয় বৈষম্য মিলে এমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে যার সন্ধান পাশ্চাত্যের কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ভার্টিক্যাল প্রসারের এই প্রধান বাধা দূর না করলে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার অসম্ভব। বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণের পথে সামাজিক দূরত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণ এই জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সংস্কৃতি প্রবাহের স্বাভাবিক গতিমুখ সামাজিক দূরত্ব কমানোর দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের জাতি-বর্ণ গত এতটাই পার্থক্য যে গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কোনও নিটোল, সমসত্ত্ব সংস্কৃতিকে বোঝায় না। বর্ণ ও জাতিভেদে একই উৎসবের পৃথক সামাজিক তাৎপর্যও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদে সামাজিক দূরত্ব এতটাই বেশি যে অনেক ক্ষেত্রে তা আধুনিক শ্রেণিবৈষম্যকেও ছাপিয়ে গেছে। এই সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা সম্ভবপর নয় এবং জাতিবর্ণগুলির মধ্যে এই সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিক দূরত্বও তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে বসত করা অসংখ্য সংস্কারের কুয়াশা তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

সংস্কৃতি বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রশ্ন তোলা যায় যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি সেই সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আরেকটি প্রশ্নকে প্রথমে বুঝতে হবে। সেটি হল- সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে ঊর্ধাধ প্রসারের কী সম্পর্ক? এ বিষয়ে বলা যায় সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসন' বিষয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তারই আসলে 'ডিফিউসন'। যানবাহনের আধিক্য, যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতির সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে সহজে ছড়িয়ে দিয়ে অনুভূমিক প্রসার বাড়ানো গেলেও যেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি দৃঢ় অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বেশি, সেসব ক্ষেত্রে অনুভূমিক প্রসার বাড়লেও ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার সেভাবে বাড়েনা। ফলত, সামাজিক দূরত্বও খুব বেশি কমে না। সামাজিক দূরত্ব কমানোর উপায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো। জনশিক্ষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে চেপে বসে থাকা বহুদিনের সংস্কারের বাধা দূরীভূত হতে পারে।ে র ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে স্তরীয় ব্যবধান কমবে এবং সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল প্রসার বা গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক দূরত্বও কমবে এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলি জনসাধারণের কাছে লভ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে সাংস্কৃতিক প্রসারের গভীরতা বাড়ানোর উপায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো।

বাংলার সংস্কৃতি রূপায়ণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। তা হল 'অ্যাকালচারেশন'। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতিধারার বাহক দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠী একে অপরের কাছাকাছি বা সান্নিধ্যে এলে উভয় সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত বা সংঘর্ষে নতুন যে সংস্কৃতির জন্ম হয়, তাকে অ্যাকালচারেশন বলে। এর সঙ্গে ডিফিউসনের অনেক মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ডিফিউসনের জন্য দুটি সংস্কৃতি ধারার বাহককে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসাটা আবশ্যিক নয়। কারণ কোনও নতুন ধারণা একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র থেকে অনেক দূরের কোনও কেন্দ্রে এমনকি অন্য দেশেও স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু অ্যাকালচারেশনের ক্ষেত্রে উভয় সংস্কৃতির বাহককে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসাটা আবশ্যিক।

অ্যাকালচারেশন বা সাংস্কৃতিক মিশ্রণ তিনভাবে হতে পারে-

প্রথমত, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির বাহক জনগোষ্ঠী দীর্ঘসময় পাশাপাশি বাস করে একে অন্যের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে আসা মানুষজন এদেশে স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন বাস করে নিজেদের সংস্কৃতি দ্বারা এদেশের জনতাকে বা নিজেরা এদেশের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, উপনিবেশকারী কোনও দেশ উপনিবেশিত দেশের ওপর নিজেদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে পারে।

ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে এই অ্যাকালচারেশন বা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের প্রভাব খুব বেশি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই পর্তুগিজ, ডাচ, পাঠান, মোগল, ফরাসি, ইংরেজদের মতো একাধিক ভিন্ন সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী এদেশে এসেছে এবং তাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে। বাঙালি খ্রিস্টানরা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের পরিচয় মেলে। এছাড়া, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘসময়পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে সামাজিক দূরত্বের সমস্যাকে অতিক্রম করে বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে সজীবতা রক্ষিত হয়েছে। তবে এটা কোনও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। দীর্ঘস্থায়ী ফল পেতে গেলে সামাজিক দূরত্ব কমানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

৯.৬ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ ১

• সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব বলতে কী বোঝো?

সংস্কৃতি-কেন্দ্রের বাইরের ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও অনেক সময় সংস্কৃতিকেন্দ্রের ভেতরেও অনুন্নত সাংস্কৃতিক অঞ্চল দেখা যায়। এই ধরনের ঘটনার কারণকে সংস্কৃতির 'সামাজিক দূরত্ব' বলা যেতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্রস্থ প্রান্তীয়তা ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার থেকে অনেক বেশি বিপদজনক। কারণ ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা যানবাহনের আধিক্য দিয়ে দূর করা সম্ভব কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজ উপায়ে দূর করা যায় না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সংস্কৃতির ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেএবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের গতিবেগ বাড়লে সামাজিক দূরত্বও কমে কিন্তু তা নির্ভর করে সামাজিক দূরত্ব আসলে কী ধরনের, তার ওপর। বিজ্ঞানীরা বলেন সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার তার ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার বা গভীরতাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সেই নিয়ন্ত্রণের বেগ খুবই ধীর। কারণ সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং জাতিবর্ণের ওপর ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার নির্ভরশীল। ফলে ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার হলে তা সমাজের ওপরতলার মধ্যেই প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। তা খুব বেশিগি গভীরতা লাভ করতে পারেনা। এজন্য দেখা যায় বিভিন্ন যুগে খুব কম সংখ্যক মানুষই সমকালীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে সক্ষম হন। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাদের বিরাট ব্যবধান থাকে। সংস্কৃতির প্রসারের প্রভাব কোনও যুগেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগসাধারণের কাছে পৌঁছায়নি। বরং সংস্কৃতির এই সমসাময়িক মুষ্টিমেয় প্রবর্তক অংশের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান যুগে যুগে ক্রমশ বেড়েছে।সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে এসে এই ব্যবধান সবচেয়ে প্রকট হয়েছে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক দূরত্ব কমলেও সামাজিক দূরত্ব কমেনি এবং সামাজিক গভীরতা বাড়েনি। ফলে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার ব্রিটিশ আমলে বাধাপ্রাপ্ত হবার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নাগরিক সংস্কৃতির ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি সংস্কৃতির কালগত প্রবাহ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে হতে একসময় বিকৃতি, অবনতি এবং বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে

আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য মনের বিকেন্দ্রিকরণের কোনও চিহ্ন বর্তমান গ্রামীণ সমাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল প্রসারের পথে প্রধান বাধা হল জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। এই বৈষম্যই ভারতে সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বের প্রধান কারণ। এর সঙ্গে আদুনিক যুগে সংযুক্ত হয়েছে শ্রেণিগত বৈষম্য। উভয় বৈষম্য মিলে এমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে যার সন্ধান পাশ্চাত্যের কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ভার্টিক্যাল প্রসারের এই প্রধান বাধা দূর না করলে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার অসম্ভব। বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণের পথে সামাজিক দূরত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণ এই জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সংস্কৃতি প্রবাহের স্বাভাবিক গতিমুখ সামাজিক দূরত্ব কমানোর দিকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের জাতি-বর্ণ গত এতটাই পার্থক্য যে গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কোনও নিটোল, সমসত্ত্ব সংস্কৃতিকে বোঝায় না। বর্ণ ও জাতিভেদে একই উৎসবের পৃথক সামাজিক তাৎপর্যও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদে সামাজিক দূরত্ব এতটাই বেশি যে অনেক ক্ষেত্রে তা আধুনিক শ্রেণিবৈষম্যকেও ছাপিয়ে গেছে। এই সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা সম্ভবপর নয় এবং জাতিবর্ণগুলির মধ্যে এই সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিক দূরত্বও তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে বসত করা অসংখ্য সংস্কারের কুয়াশা তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

● **'অ্যাকালচারেশন' কী? ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব কী?**

দুটি ভিন্ন সংস্কৃতিধারার বাহক দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠী একে অপরের কাছাকাছি বা সান্নিধ্যে এলে উভয় সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত বা সংঘর্ষে নতুন যে সংস্কৃতির জন্ম হয়, তাকে অ্যাকালচারেশন বলে। এর সঙ্গে ডিফিউসনের অনেক মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ডিফিউসনের জন্য দুটি সংস্কৃতি ধারার বাহককে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসাটা আবশ্যিক নয়। কারণ কোনও নতুন ধারণা একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র থেকে অনেক দূরের কোনও কেন্দ্রে এমনকি অন্য দেশেও স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু অ্যাকালচারেশনের ক্ষেত্রে উভয় সংস্কৃতির বাহককে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসাটা আবশ্যিক। অ্যাকালচারেশন বা সাংস্কৃতিক মিশ্রণ তিনভাবে হতে পারে-

প্রথমত, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির বাহক জনগোষ্ঠী দীর্ঘসময় পাশাপাশি বাস করে একে অন্যের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে আসা মানুষজন এদেশে স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন বাস করে নিজেদের সংস্কৃতি দ্বারা এদেশের জনতাকে বা নিজেরা এদেশের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, উপনিবেশকারী কোনও দেশ উপনিবেশিত দেশের ওপর নিজেদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে পারে।

ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে এই অ্যাকালচারেশন বা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের প্রভাব খুব বেশি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই পর্তুগিজ, ডাচ, পাঠান, মোগল, ফরাসি, ইংরেজদের মতো একাধিক ভিন্ন সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী এদেশে এসেছে এবং তাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে। বাঙালি খ্রিস্টানরা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের পরিচয় মেলে। এছাড়া, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘসময়পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে সামাজিক দূরত্বের সমস্যাকে অতিক্রম করে বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে সজীবতা

রক্ষিত হয়েছে। তবে এটা কোনও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। দীর্ঘস্থায়ী ফল পেতে গেলে সামাজিক দূরত্ব কমানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

- **প্রান্তীয় সংস্কৃতি বা মার্জিন্যাল কালচার এবং 'ইন্টারন্যালি মার্জিন্যাল' বা 'আন্তর্পান্তিক' সংস্কৃতি বলতে কী বোঝো?**

সংস্কৃতির ধর্ম যদি উদ্ভাবন শক্তি হয়, তবে তার প্রাণশক্তি হল ডিফিউসন বা প্রসার। তাই সামাজিক বা ঐতিহাসিক কারণে প্রসারের পথ বন্ধ হলে সংস্কৃতিতে সংকট দেখা দেয়। যদি সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে কোনও স্থানের সংস্কৃতির প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাকে প্রান্তীয় সংস্কৃতি বা মার্জিন্যাল কালচার বলা হয়।

প্রসারের স্বাভাবিক গতিপথ কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে। তাই কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দূরত্ব যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসারের গতিবেগ ততই ধীর এবং বাধাপ্রাপ্ত হবে এরকমটা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর বিপরীত ঘটনা দেখা যায়। অর্থাৎ দেখা যায় কেন্দ্রের কাছাকাছি কোনও অঞ্চলের সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী কোনও অঞ্চলের সংস্কৃতির তুলনায় অধিক অনুন্নত। কোনও সংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিসীমার মধ্যেই কোনও অনুন্নত অঞ্চল উপস্থিত থাকলে তাকে 'ইন্টারন্যালি মার্জিন্যাল' বা 'আন্তর্পান্তিক' বলা হয়। এই আন্তর্পান্তিকতার কারণ যেমন যানবাহনের অসুবিধা হতে পারে, তেমনই হতে পারে সামাজিক শ্রেণিগত জাতিগত বা বর্ণগত পার্থক্যের কারণেও।

সব যুগেই শাসকের দরবার ও রাজধানীগুলি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হত। আর এই কেন্দ্রের বাইইরে প্রান্তে অবস্থান করত গ্রামীণ সংস্কৃতি। একটা সময় পর্যন্ত যোগাযোগ মাধ্যম এবং যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে এইসব গ্রামীণ প্রান্তিক সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হলেও কেন্দ্র থেকে খুব দূরবর্তী নয়, এরকম অনেক অঞ্চলেও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেনি এবং ফলত প্রান্তিক সংস্কৃতিই বজায় আছে। কলকাতা বা হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করে তিরিশ চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যেই এরকম বেশ কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যায় যেগুলি ভৌগোলিক প্রান্তিকতার নিদর্শন। এই অচলাবস্থা কাটাতে না পারলে সংস্কৃতির ক্ষতি হবে। জাতির সংস্কৃতি ও সম্পদ কোনওদিন জনগণের সংস্কৃতি ও সম্পদে পরিণত হতে পারবে না। তার ওপর কেন্দ্রের সংস্কৃতির যৎসামান্য অংশ চুঁইয়ে চুঁইয়ে যদি প্রান্তীয় গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর পড়ে, তাতে গ্রামীণ সংস্কৃতির ক্ষতিসাধন হবে। শহুরে নাগরিক জীবনের সংস্কৃতির ভালো অংশের বদলে খারাপ অংশটাই সেক্ষেত্রে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গৃহীত হবে।

৯.৭ মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণাত্মক পাঠ ২

- **যে-কোনও জাতির সাংস্কৃতিক ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে কোন তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?**

যে-কোনও জাতির সাংস্কৃতিক ধারাকে পর্যবেক্ষণ করলে তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি অতীতকাল থেকে জাতির জীবনধারার সঙ্গে মিশে আছে এবং মনের মধ্যে লাভ করেছে এক দীর্ঘস্থায়ী আসন, যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা সুদূরকাল থেকে বংশপরম্পরায় বহন করে আসি এবং সহজে পরিত্যাগ করতে পারি না, —সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই স্থিতি হিসেবে মনে করা যেতে পারে। 'সৃষ্টি' হল সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে নতুন কিছু উদ্ভাবন, আবিষ্কারের যে তাগিদ, তাকেই বলা যেতে পারে 'সৃষ্টি'। কালের নিয়মে সামাজিক কারণে সংস্কৃতিতে নতুন উপাদানসমূহের আবির্ভাব হয়। তখন নতুন ও পুরাতন উপাদানের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হয়। সেই সংঘাতের

ফলে অনেক পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন ও পুরাতন উপাদানের মিলিত ক্রিয়ায় নতুনতর সাংস্কৃতিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতিকে এইকারণে 'কনফিগারেসন' বলা হয়। এই নতুন ও পুরাতন সাংস্কৃতিক উপাদানের সংঘর্ষকে সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'লয়' বলা হয়। উল্লেখ্য যে সংস্কৃতির প্রথম উপাদান 'স্থিতি'র তুলনায় তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 'সৃষ্টি' ও 'লয়' অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। আর তাই এই দুটি উপাদানের প্রভাব 'স্থিতি'র থেকে অনেক বেশি।

• ঐতিহ্য ও ডিফিউশন্ বলতে কী?

সংস্কৃতির উপাদানের প্রথম বৈশিষ্ট্য 'স্থিতি'র একটা বড়ো দিককে ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। এই ঐতিহ্যের বিকশিত হবার প্রধান আশ্রয়স্থল সংস্কৃতির ভেতরে থাকা ভাল গুণগুলি। সংস্কৃতির কালগত প্রবাহকে ঐতিহ্য বলা হয়। সংস্কৃতির যেমন কালগত প্রবাহ রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভৌগোলিক প্রবাহও। অর্থাৎ স্থান এবং কাল উভয়ের পরিবর্তনেই সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহকে বলা হয় 'ডিফিউসন'। অর্থাৎ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতির ধারার যে ভিন্নতা দেখা যায়, তা হল 'ডিফিউসন'। যেমন বাংলাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম বা উত্তর থেকে দক্ষিণে যে সংস্কৃতির ধারা, তাকে 'ডিফিউসন' বলা হবে। আবার, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সময়ের নিরিখে সংস্কৃতির যে ধারা পরিলক্ষিত হয়, তাকে ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব সাংস্কৃতিক সংস্কার দেখা যায়, তাকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। এই কারণে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক প্রসার বা ডিফিউসন-কে বলেছেন— Inter-societal transmission of culture in space আর ঐতিহ্যকে বলেছেন Intra-societal transmission of culture in time.

• বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল (উল্লম্বন) প্রসারের পথে প্রধান বাধা কী?

বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল প্রসারের পথে প্রধান বাধা হল জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। এই বৈষম্যই ভারতে সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্বের প্রধান কারণ। এর সঙ্গে আধুনিক যুগে সংযুক্ত হয়েছে শ্রেণিগত বৈষম্য। উভয় বৈষম্য মিলে এমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে যার সন্ধান পাশ্চাত্যের কোনও দেশে পাওয়া যায় না। ভার্টিক্যাল প্রসারের এই প্রধান বাধা দূর না করলে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার অসম্ভব। বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণের পথে সামাজিক দূরত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণ এই জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সংস্কৃতি প্রবাহের স্বাভাবিক গতিমুখ সামাজিক দূরত্ব কমানোর দিকে।

• সামাজিক দূরত্ব কমানোর উপায় কী?

সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসন' বিষয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তারই আসলে 'ডিফিউসন'। যানবাহনের আধিক্য, যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতির সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে সহজে ছড়িয়ে দিয়ে অনুভূমিক প্রসার বাড়ানো গেলেও যেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি দৃঢ় অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব বেশি, সেসব ক্ষেত্রে অনুভূমিক প্রসার বাড়লেও ঊর্ধাধ বা ভার্টিক্যাল প্রসার সেভাবে বাড়েনা। ফলত, সামাজিক দূরত্বও খুব বেশি কমে না। সামাজিক দূরত্ব কমানোর উপায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো। জনশিক্ষার মাধ্যমেই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে চেপে বসে থাকা বহুদিনের সংস্কারের বাধা দূরীভূত হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে স্তরীয় ব্যবধান কমবে এবং সংস্কৃতির ভার্টিক্যাল প্রসার বা গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক দূরত্বও কমবে এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলি জনসাধারণের

কাছে লভ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে সাংস্কৃতিক প্রসারের গভীরতা বাড়ানোর উপায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো।

- **কেন্দ্রস্থ প্রান্তীয়তা ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার থেকে অনেক বেশি বিপদজনক কেন?**

সংস্কৃতি-কেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও অনেক সময় সংস্কৃতিকেন্দ্রের ভেতরেও অনুন্নত সাংস্কৃতিক অঞ্চল দেখা যায়। এই ধরনের ঘটনার কারণকে সংস্কৃতির 'সামাজিক দূরত্ব' বলা যেতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্রস্থ প্রান্তীয়তা ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার থেকে অনেক বেশি বিপদজনক। কারণ ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা যানবাহনের আধিক্য দিয়ে দূর করা সম্ভব কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজ উপায়ে দূর করা যায় না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সংস্কৃতির ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেএবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের গতিবেগ বাড়লে সামাজিক দূরত্বও কমে কিন্তু তা নির্ভর করে সামাজিক দূরত্ব আসলে কী ধরনের, তার ওপর।

৯.৮ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করে বিনয় ঘোষের বক্তব্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণ করুন।

২। সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব মোচনের উপায়গুলি কী কী ? এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষের অভিমত কী।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। আকাল্‌চারেশন কি?

২। প্রান্তীয় সংস্কৃতি কী?

৩। ঐতিহ্য ও ডিফিউশন বিষয়ে টীকা লিখুন।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। যে-কোনো জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে কোন্ তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়?

২। কোন্ সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে 'Internally marginal' বলা হয়?

৩। সাংস্কৃতিক সাম্য বজায় রাখতে গেলে কোন্ দুই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূরীকরণ প্রয়োজন?

৪। মনের বিকেন্দ্রণ কোন্ যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ?

৫। সাংস্কৃতিক ট্রাডিশনের গতি কেন 'ভার্টিক্যাল'?

৯.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন,' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

২। 'একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন,' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৩। 'বাংলা সমালোচনার ইতিহাস,' অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

একক - ১০ ❑ চড়ক : কালীপ্রসন্ন সিংহ

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ লেখক পরিচিতি

১০.৪ মূল পাঠ

১০.৫ সারাংশ

১০.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

১০.৭ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র অন্তর্গত 'চড়ক' নিবন্ধের ভাষা

১০.৮ অনুশীলনী

১০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সম্পর্কে জানা যাবে।

- কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনারীতি সম্পর্কে জানা যাবে।
- বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের স্থান কোথায় তা জানা যাবে।
- তৎকালীন জীবনের সঙ্গে বর্তমান সমাজ-জীবনের পার্থক্য বোঝা যাবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

ভারতে ইংরেজ আগমন এবং তার অর্ধশতকের মধ্যে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন বাংলা করল। গদ্যরচনার যাত্রা এতে মসৃণ হল এবং এর বিস্তারক্রমে এল প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি গদ্যসাহিত্যের বিচিত্র ধারা। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালি-জীবনে বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের যে প্রচেষ্টা চলছিল তাতে সাহায্য করল সাময়িক পত্রগুলির প্রকাশ। সাময়িক পত্রের সাহায্যে বাঙালি তার মেধা ও মনন শক্তির উৎকর্ষের সীমা স্পর্শ করল। গদ্যরচনা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমশ আধুনিক হতে শুরু করল। কাব্যসাহিত্যে যেমন মধুসূদন, তেমনি প্রবন্ধ সাহিত্যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ এল।

'প্রবন্ধ' শব্দটি বহু পূর্ব থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত। এর প্রত্যয়গত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। যে কোনো একটি প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। এই প্রকৃষ্ট বন্ধন নানা রকমের হতে পারে। এই প্রকৃষ্ট বন্ধন নানা রকমের হতে পারে। 'বিষয় বস্তুর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ-রূপ বন্ধন। হইতে পারে, বর্ণনার পারস্পরর্যরূপ বন্ধন হইতে পারে আবার বহু বাক্যাদির ভিতরকার যুক্তিতর্কের নৈয়াকি অন্বয়রূপ বন্ধন ও হইতে পারে।' এই রকম সুসংবদ্ধ সব রচনাই সংস্কৃত আলংকারিকদের কাছে 'প্রবন্ধ'। 'কাব্যপ্রবন্ধ', 'নাট্যপ্রবন্ধ' ইত্যাদি নাম আমরা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেই পাই।

এই ধরনের রচনার আর একটি নাম হল 'সন্দর্ভ'। সম্‌পূর্বক দৃভ্‌ ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন। দৃভ্‌ ধাতুর অর্থ, গ্রন্থন রচনা, সংগ্রহ পরসপ্র অন্বিত করে সাজানো। 'সন্দর্ভ' শব্দটি সম্যকরূপে, গ্রন্থন, রচনা বা গ্রহণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। জীব গাস্বামী 'ষট্‌সন্দর্ভ' শব্দটি ক্রমযুক্ত সুসংবদ্ধ রচনা হিসাবেই ব্যবহার করেছিলেন। আবার 'গূঢ়ার্থ' অর্থে 'সন্দর্ভ' শব্দের ব্যবহার 'চৈতন্যভাগবতে' আছে। সংগ্রহ হিসাবেও সন্দর্ভ শব্দটি বহু—ব্যবহৃত 'নিবন্ধ' শব্দটিও সমার্থক। গ্রন্থের বৃত্তি বা টীকা হিসাবেও 'নিবন্ধ' শব্দটির ব্যবহার ছিল। কোনো কোনো স্মৃতি গ্রন্থ সম্বধীয় রচনা নিবন্ধ নামে খ্যাত। দীর্ঘ প্রস্তাব হিসাবে 'রচনা' শব্দটি শব্দটির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক। গদ্য বা পদ্য যে কোনো সাহিত্যিক সৃষ্টিকেই 'রচনা' বলা যেতে পারে। ''অলঙ্কারকৌস্তুভে' কবিকর্মপূর বলিয়াছেন, 'অসাধারণচমৎকারিণী রচনা হি নমিতি : শব্দবিন্যাস বা শব্দ গ্রস্থন—পারিপাট্য, পদযোজনা, প্রভৃতি বিশেষ অর্থেও 'রচনা' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়।'' ইংরাজী Essay-এর প্রতিরূপ হিসাব বাংলায় 'রচনা' শব্দের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'প্রবন্ধ' শব্দটির বহুপ্রচলন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমার্ধে খনন তর্কমূলক রচনা বা বিবৃতিমূলক রচনা লেখার ক্ষেত্রে 'প্রস্তাব' শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিরা নিজেদের ছোট সব লেখাকেই 'প্রস্তাব' নাম দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রবন্ধ' ও 'প্রস্তাব' দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন। মোহিত লাল মজুমদার বলেছেন, ''ইংরাজী Essay কথাটির ধাতুগত অর্থ হল 'প্রয়াস' একটা কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া। তাহার একটা সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার যে 'প্রয়াস' তাহাই (বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি। মোহিতলাল মজুমদার) Eassy. "Eassay' শব্দটি মূলতঃ ফরাসী শব্দ। ...১৮৫০ খ্রিস্টাবদে মনটেইনের 'Essies' প্রকাশিত হয়। মন্‌টেইন একে একটি নূতন জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা (Attempt) বা এই ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experiment) এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেকনই এই শব্দটিকে একটি বিশেষ জাতীয় সাহিত্যিক রচনা অর্থে গ্রহণ এবং প্রচলন করেন। মনটেইনের আদর্শে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজিতে রচনাসাহিত্যের স্রষ্টা।'' (বাঙলা-সাহিত্যের একদিক-শশিভূষণ দাশগুপ্ত) প্রবন্ধের মধ্যে বিচার, যুক্তি এবং অবশ্যই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকা দরকার।

বাংলা গদ্যের প্রথম অবস্থায় শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করে। এরপর খৃটেধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংঘাতের মধ্য প্রবন্ধ এগিয়ে চলে এবং ক্রমশ প্রবন্ধ সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে থাকে। প্রবন্ধ সাহিত্যে দুটি মূল বিভাগ — প্রথমটি জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ বা objective বা তন্ময় প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয়টি শুধু রচয়িতার মনোভাব প্রধান প্রবন্ধ বা আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ বা subjective প্রবন্ধ বা মন্ময় প্রবন্ধ। সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি — প্রবন্ধ সাহিত্যেরও একই উদ্দেশ্য। যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে যুক্তিনির্ভর, জ্ঞাননির্ভর — বিজ্ঞান দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি তত্ত্বমূলক আলোচনা করা হয়। আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধের একমাত্র বিষয়বস্তু লেখক। পাঠকের কাছে অনেক সময় বস্তুভাবের চেয়ে এ ধরণের প্রবন্ধের রম্যতা অর্থাৎ হৃদয়কে স্পর্শ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই এগুলি রম্যরচনা নামেও অভিহিত। সৃষ্টির আনন্দই এই জাতীয় রচনার মূল কথা। প্রজাপতি ব্রহ্মার মত কাব্যসংসারের প্রজাপতি কবি বা লেখকেরা। লঘু-রচনা, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন সবই রচনাসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে যদি তা পাঠকের মনে রসানুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্রমবিকাশ সাময়িক পত্রের হাত ধরে। ধর্মমূলক বা জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক বা, দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা মূলক রচনা সবকিছুরই বাহক হয়ে ওঠে এই সাময়িকপত্রগুলি। আবার এক একজন প্রথিতযশা চিন্তাবিদের প্রতিভারও বাহন হয় এই সাময়িকপত্রই। প্রথম যুগের 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচারদর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'সংবাদ প্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইত্যাদির যুগ ছাড়িয়ে যখন বঙ্গদর্শনের যুগে আমরা প্রবেশ করলাম তখন প্রকৃত সাহিত্যনির্ভর আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধের রূপটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। অবশ্য ইতিপূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি রচনাকার এর পূর্বরূপ প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আমরা আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধের পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করি। রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর 'Essays of Elia' গ্রন্থে যেভাবে নিজেকে উনোচন করেছেন — সেই বিষণ্ণতা, আত্মপ্রক্ষে, সরস ও উজ্জ্বল রচনার সূত্র ধরে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক অসামান্য রচনা, যার মূলে রয়েছে ইংরাজ প্রাবন্ধিক DC Quincey' বা 'Confessions of an English Opeum Eater'-এর অবদান। তবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রচনাটির পুরোপুরি অনুকরণ করেন নি। তাঁর সমাজচেতনা, দেশানুরাগ, ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'ও এ জাতীয় রম্যরচনার একটি দৃষ্টান্তমূলক সৃষ্টি।

'রম্যরচনা' ও 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' একই জাতীয় রচনা, তবু দু-একটি জায়গায় সামান্য পার্থক্য আছে। যেমন, রম্যরচনায় নিজের কল্পনাপ্রবণ হৃদয়কে প্রকাশ করা, তথ্যের দাসত্ব না করা, সর্বোপরি রমণীয়তা গুণসম্পন্ন হওয়া প্রাথমিক শর্ত। ব্যক্তিগত রচনা বস্তু — আশ্রয়ীও হতে পারে — বস্তুকে অবলম্বন করেও তা ভাবকল্পনার বিস্তার ঘটাতে পারে। তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান এসবেরও ভূমিকা এখানে থাকে। উপন্যাস বা ছোটগল্পের সঙ্গেও রম্যরচনার ফারাক বিস্তর। এই দুই ধারার সাহিত্যে একটা গতি, আরম্ভ-মধ্য-পরিণামযুক্ত একটা কাহিনী থাকে। রম্যরচনাতেও একটা পরিণাম ও রসোপলব্ধি থাকলেও তা কথার কোনো সীমা রাখে না। বাজে কথাই সেখানে প্রধান — আড্ডার ছলে হাল্‌কা চালে হয়তো কিছু সেখানে বলা হয় কিন্তু তার মেজাজ আলাদা। ব্যক্তি-মানুষ যেমন অন্য শিল্প-মাধ্যমে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেন, এখানে তা না করে তিনি নিজেকেই মেলে ধরেন।

রম্যরচনা কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বর্তমান কালের জটিল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে নিজে ডুব দেওয়ার অবকাশ কম তাই রম্যরচনায় গদ্যশিল্পী যেভাবে আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে তা আমাদের পরম প্রাপ্তি। এ বিষয়ে ড. যেন জনসন ও বুদ্ধদেব বসু যে দুটি মন্তব্য করেছেন, তা পাশাপাশি আনা যেতে পারে — "... Loose sally of mind which is an irregular undigeested piece and not regular or orderly composition." এবং "যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনী শক্তি বা কলানৈপুণ্য...তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না রম্যরচনা শব্দটির সৃষ্টি হত।" ইউরোপীয় রচনা-সাহিত্যের জনক মন্‌টেইন তাঁর রচনাগ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টতঃই বলেছেন যে তাঁর রুচি মর্জির কতকগুলি দিক তাঁর রচনা থেকে উদ্ধার করা যাব এবং কৃত্রিমতা বাদ দিয়ে এতে তিনি সাধাসিধাভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। "...হে পাঠক, এইরূপে আমার পুস্তকের বিষয়বস্তু আমিই।"

বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই এসেছে। Essay-র সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকার হয়েছিল। এই সভা কেবল সাহিত্য আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্বর্ধনা দ্বারা সাহিত্যিকদের উৎসাহিতও করত। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে এই সভা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য মধুসূদন দত্তকে সম্বর্ধিত করেছিল। সমাজ সংস্কার বা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সঙ্গেও 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র যোগ ছিল। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে যখন আন্দোলন শুরু করলেন, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী পাঠাগার', 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫)-র প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পত্রিকায় সমাজ, সমাজসংস্কার, ইতিহাস, দেশপ্রেম, ইত্যাদি বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হত। এরপর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বাবু' নাটক রচনাকারেন। ১৮৫৭তে 'বিক্রমোর্ব্বশী', ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'সাবিত্রী সত্যবান', ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'মালতী মাধব' নাটক রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের গদ্যানুবাদ — এ কাজ বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে তিনি সম্পন্ন করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে এটি আংশিক

প্রকাশিত হয়, ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে এর শেষভাগ প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না, কিন্তু কিছুদিন পরে বুজ্‌তে পারবেন হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয়ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।' ১৯৬৪ সালে বইটির দুই ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী' রূপে চালর্স ল্যাম্বের কথা অনেকেই বলেছেন। বেকন চিন্তাশীল ও প্রাজ্ঞ হলেও পাঠকের সঙ্গে নৈকট্য ল্যাম্বের বেশি। পরে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের Oscar Wilde এই জাতীয় প্রবন্ধের উচ্চশিখরে উঠেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের প্রাবন্ধিকেরা বেশির ভাগই ইংরাজী রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর', রবীন্দ্রনাথের 'বাজে কথা' এবং পঞ্চভূতের প্রবন্ধগুলি এ জাতীয় প্রবন্ধের উদাহরণ। পরবর্তীকালে বীরবল (প্রথম চৌধুরী), অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ রচনাকারেরা এই জাতীয় প্রবন্ধের (রম্যরচনার) ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আমাদের আলোচ্য 'চড়ক' নকশাটি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ। চলিত ভাষায় রচিত গ্রন্থের নিদর্শন হিসাবে ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসধর্মী রচনা 'আলালেরঘরের দুলাল' (১৮৫৪)। তারও পূর্বে চলিত গদ্যরচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে উইলিয়াম কেরী রচিত 'কথোপকথন'-এ চলিত গদ্যের কিছুটা নদর্শন আছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাসে কিছুটা হলেও কথ্য গদ্যের নিদর্শন আছে। যাইহোক, খুব সচেতনভাবে কলকাতার কথ্য ভাষাকে সুতীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ ব্যবহার করলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা গ্রন্থে।

১০.৩ লেখক পরিচিতি

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলকাতার এক ধনী জমিদার বংশ — জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মলাভ করেন। তাঁর মাত্র দু-বছর বয়সে তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহ পরলোকগমন করেন। প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন — যার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার অনুশীলন। এই সভা প্রতিষ্ঠার বিবরণ সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন তখন খ্যাতকীর্তি। তাঁর সত্যবাদিতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। সাহিত্য, সংগীত, আভিনয়, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, সভা, সংবাদপত্র প্রকশ ও পরিচালনা, সমাজসংস্কার, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির ফলে সাধ্যাতিরিক্ত ও বেহিসাবী ব্যয় (স্মর্তব্য, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদকের জরিমানা কালীপ্রসন্ন সিংহই দিয়েছিলেন) এসবের কারণে শেষজীবনে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বিচারক হিসাবেও কালীপ্রসন্ন কাজ করেছিলেন। যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, তাতেই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান বাংলার মানুষ ও সাহিত্যের পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি।

১০.৪ মূল পাঠ : 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" : চড়ক

কলিকাতায় চড়ক পার্ব্বন

'কহই টুনোয়া _____

সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি ___________ টুনোয়ার টপ্পা।

____

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিত! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে - দুষিবে জগৎ - হাঁসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার সে সময় মনে য্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ সাল। কলকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, ও চড়কির পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে,—সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ের নূপুর, মাথায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসী হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেী বড়মানুয কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে, বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোতিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত — বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে। আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আক্‌ম্বরী মোহরপোরাা লক্ষীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে, বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নুপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীর-ব্রতের মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েচে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী করে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে, কখন বলে "ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে; কখন ঢাকের পেছনটা দুম দুম করে বাজাচ্চে-বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যয়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুঠো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকতে ধুঁতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কল্লেন, মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,-বাবা তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো; পাছে লোকে জান্‌তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সইস-কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকপবাদ তৃণজ্ঞান বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্তক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিট্‌চ্চে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে। বাড়ীর ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষন্ন বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এইসব হয়" এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু পুরুত ও গিন্নীর ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয় বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান করে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিদ মনে করে বিষন্ন বদনে বাবুর পোচোনে পেচোনে যেতে লাগলো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, অজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র ক'রে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, ফুল দাও', বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে একঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে একবোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো "না হবে কেন—কেমন বংশ!"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আনলে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে ব'সে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য"! কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু'একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জানতে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন—"গিন্নীরা বলে দিয়েচেন—"ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুম যে, ধরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থামেলো। সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই!' চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গ-ঢাকা হয়ে এলো; সে সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুন আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্চেন। এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তারে চিনতে পারবে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের চোট চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়চে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে, স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোনার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গাবাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গাম্‌চাকাঁধে, ভাল মাচ নিবে"? "ও খেংরা-গুপো মিন্সি, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘোঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বর শিবো।" চীৎকার হতে লাগলো, গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল-সন্ন্যাস। বাড়ীর সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েছে; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো। ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাসী সমাপন হলো; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজতে লাগলো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গ্যালো।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে সহর বড় গুলজার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন; কোথাও একটা দাঙ্গ হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারিদিকে চার পাঁচজন হাস্‌চে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর; ওদের মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা; ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতলায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো। মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রী হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুন্‌বেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না," "পালেদের একধামা পেতলের বাসন গেছে' ও গন্ধবেণেদের সর্বনাশ হয়েছে।"

আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়— থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি সন্ন্যাসীরা হর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখো হচ্চে। উড়ে বামুনেরা ময়দানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারান্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে; এখনও মহানগর যন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন, —"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা" "মাগী যে জক্কী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের তার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রৌদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন। সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়া ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ — হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গম্ গম্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দবনি ও ক্যারামত জাহির করবেন-সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব সাদা লোক, কোর, কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেন্ড নিয়তই কাচে থাকে, হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান-সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি।

গুপুস ক'রে তোপ প'ড়ে গ্যালো। কাকগুলো কা কা ক'রে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো — মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে — মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের বেগুন বাজরা আস্‌চে, দিঁশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি ক'রে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাকটিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের ওষুধ চমৎকার; কেউ-মতন রোগীর নাক ফুড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে — সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এককাটি সরেশ; সকল রোগেই সদ্য মৃত্যুশর ব্যবস্থা করে থাকেন — অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও কর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরা কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেচে, আজ বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিকস, একসচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায়—হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ দেখা না হলে গ্রাহেকরা পান না-ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলী হলো, পাগড়ী বাঁধা প্রথম ইনষ্টলমেন্টে-শিপ সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেন্টের অফিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেতাম না। আজকাল ইংরাজী লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে অফিসে যান—পাগ্‌ড়ী প্রায় উঠে গ্যাল-দুই একজন সেকেলে কেরাণীই চিরপরিচিত পাগড়ীর মনে রেখেচেন; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগ্‌ড়ী দেখতে পাব না;

পাগ্‌ড়ী মাথায় দিলে আলবার্ট ফেশনের বাঁকা সিঁথেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ী প্রায় থাকে না থাকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে? হাতে কাজ কিছু নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা, বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে", কার বাগানের দরকার, "কে টাকা ধার করবে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটোখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবু দালাল চাকর থাকেন; দালালেরা শিকার ধ'রে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন।

দালালী কাজটা ভাল "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায়। অনেকে "রেস্তহীন মুচ্ছদী" চারবার "ইন্সালভেষ্ট" নিয়ে এখন দালালী অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন এঁরা বর্ণচোরা আঁক এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই পসাদার চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ-জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান সাড়া দেন, সুতরাং মনের মত কোটাল হলেঁ চুলেনাপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারিদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতো, শোনো, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একেবারে মোরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সুখের দলের পাঁচালী ও হাপ-আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্ডেনের মেম্বরই অধিক — এঁরা গাজন দেখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও — "সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজোপিসে বর্ত্তমান — আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেক চড়ক, বাণ ফোঁড়া তলোয়ার ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পোক্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান খেতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপী, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর — ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে ভাবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়া-গাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে — অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁতকে পড়েন; ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখলেই চেনা যায় ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ — বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধে খুনী মামলায় গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ী চলে বেড়ান।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাছিতে বাসা ক'রেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না। তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্যা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাছিতেই কাটান। লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যাটা, খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয় — পেড়াপীড়ি হলে দেশে স'রে পড়েন — সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নুতন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই দালাল-পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম-বালির ব্রিজ, বাগবাজারের খলের কলের দরজা — রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদ যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্ম্মে মক্‌রর হয়।

আজকাল সহরে ইংরেজী কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট্ দ্বিতীয় "ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ"; প্রথম দলের সকলি ইংরাজী কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া, হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্‌স সামনে থাকে, পলিটিক্‌স ও 'বেষ্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মত খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস — উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবার হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ডা ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে-বাগম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক বাঘের চেয়ে হিংস্র বলতে গেলে এঁরা এরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ-সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড়লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা — পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহবার — চার আনারক বেশী দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন-চারিটি "ইকুটি", দুটি "কমন লা" আদালতে ঝুল্‌চে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উটনোওয়ালা মহাজন খাতা বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁট্‌চে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। 'শমন', 'ওয়ারিন', 'উকিলের চিঠি' ও সপিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছল না মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা" অঙ্কিত আংটী আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি-লাভ করতে পাচ্চেন না

কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুড়ীর মত ঘুরচেন। পরশুদিন "বউ বউ", "লুকোচুরি", "ঘোড়াঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে

হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বসতে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত! ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার; — কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু", কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতে ভাই" পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, "উমেদার", কন্যাদায় (হয়ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটেছেন, আসল মতলব দ্বৈপয়ান হ্রদে ডোবা রয়েছে, সময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে ভরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ — কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায়; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই না : রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল সেক্‌সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজমেনে বামুনই অধিক — কারু কোলে দুটি মেয়ে — কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন — কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া — সূবর্ব্বন চৌকীদারের মত পোষাক — পেনটুলেন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত-মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন — হঠাৎ দেখলে বোধ হয়ে যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুঠে পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে সাদা হয় — ধুলোয় ধুলো; তার মধ্যে চাকের — গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড়া পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে — কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে বাজাতে চলেছে — তার পেচোনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণী। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হর্‌করা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুসী মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী-সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলছে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধ। সেট্‌কে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে ছোট ভাই — পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন — তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, টাক লাল টকটক্ কচ্চে মাথা ভাবানীপুরে, কালীঘেটে ধুলোয় ভ'রে রয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেঁপচ্ছে হুড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে — তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়াচড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন — দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখে যুবকযুবতীরা বিষন্ন হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দিষ্টকালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের চারিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদেয় নিলেন — যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা — কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি — আগামীর মুখ চেয়ে, —আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল — আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন — বর্ত্তমান বৎসর স্কুল-মাস্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন — আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মত! — পুরাণ হাকিম বদলী হ'লে নীলপ্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাস্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে — মুড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে, হ'লে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ ক'রে ন্যান — নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালীরা বছরটি ভাল রকমেই যাক্ আর খারাবেই শেষ, হোক্, সজনেখাঁড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্‌সী উচ্চুগ্‌গুকর্ত্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন!

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন — আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্চুগ্‌গু করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে মড়াকান্না কাঁদ্‌তে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না — আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন; কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পাল্কীগাড়ীর ছাদের উপর ব'সে চলেচেন। ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ-বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই — বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কোব সেন জন্মাতে লাগলো — সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাব্‌ড়ানের বদলে ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রাডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বা নাক বেঁধান চলিত হলো দে'খে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকু, ঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগলো। সবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে ক'রে টেনা ধুতি প'রে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কাল কৌশলে বেণেত বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নাযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন — প্রায় অনেকেরই এক-একটি

পাশবালিশ আচে — "যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমুর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইকে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভকর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা। কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে — চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়রি পুজার প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও, বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে— সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা-চড়ক টাটকা-টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের বারঘুরী টিনের মুহুরী দেওয়া তল্‌তাবাঁশের বাঁশী, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেচে। "ড্যানাক্, ড্যনাক, ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বেল বাজচে। গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচতে নাচতে এসেল চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে মেয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চনকীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখচেন।

পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নকসার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জানলে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েচে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি"।

১০.৫ সারাংশ

১২০২ সালের চড়কের পূর্বদিন। সারা কলকাতা শহর জুড়ে চারিদিকে তার প্রস্তুতি চলছে। যত ছুতোর, পয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নেই কারণ— 'আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন।' ইংরেজ সংশ্রবে যে 'বাবু' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি তারা ক্রমশঃ বন্দী বড়লোকে পরিণত হয়েছে। এরা পুরোনো কেতা ছাড়তে পারেনি আবার আধুনিকও হওয়া চাই। অন্যদিকে রয়েছে মোসাহেব সম্প্রদায়। বাবুদের ভদ্রাসন আছে, শালগ্রামশিলাও লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্যপূজা হয়। আবার এরাই ধর্মকর্মের তোয়াক্কা না করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করে। মদ্যপান ও বারনারীগমন অধিকাংশেরই নিত্যকর্ম। গাজনতলা লোকে লোকারণ্য সব জাতের বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই উপস্থিত। শিবের পুজো কিন্তু শিবের মাথার ফুল কিছুতে পড়ে না তাই বাবুকে পূজাস্থানে আসতে হল, কিছু কৌশলের পর ফুল পড়ল। সেদিন কাঁটাঝাঁপের দিন। বঁইচির ডাল পুকুরে পচিয়ে তার কাঁটা নিকেশ করে গাজনতলায় এনে সন্ন্যাসীরা তার উপর ঝাঁপ দিয়ে 'কাঁটা ঝাঁপ' পালন করল। সন্ধ্যা বাবুরা বেরোলেন বেলফুলের গন্ধে শহর মাতিয়ে। মদ, গাঁজা অবিরাম বিক্রী হচ্ছে। শহরের যত হুজুগে লোক কেউ মজা দেখার জন্য কেউ দু-পয়সা রোজগারের জন্য নানা ধান্দায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পুলিশ-দারোগারোও কিছু রোজগার হচ্ছে। 'গুপুস ক'রে তো প'ড়ে গ্যালো।' সেদিনের মত সব শেষ। আমোদ বন্ধ।

'চড়ক' বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখকের বক্র দৃষ্টিপাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। মোসাহেব পরিবৃত জমিদার, মাতাল, উমেদার, ব্রান্দ, পাদ্‌রী, ইয়ংবেঙ্গল বাবু, পুরুত যজমান, বৈষ্ণব, ভিখারী, কেরানী, পুলিশ, দোকানী, বাইজীবাড়ী গমনরত বাবু, শহরে অনুষ্ঠিত যাত্রা, হাফ্-আখড়াই, দেবতা, পালপর্বণ সবই শ্লেষ এবং বিদ্রূপ রঞ্জিত হয়ে এসেছে

তৎকালীন কলকাতার একটি পূর্ণ চিত্রপট হয়ে। 'কলিকাতা সহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই।" বছরের শেষদিনে সবাই আমোদে মত্ত। আবার নতুন বছর আসছে, তা নিয়েও সংশয়।

অবশেষে চড়ক সংক্রান্তি এল। চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে ঘি কলা মাখিয়ে খাড়া করা হল। লোকেরা চড়কী ঘোরানো হচ্ছে দেখে 'দে পাক দে পাক' বলে মজা দেখতে লাগল — যে ঘুরছে তার কষ্ট কেউ বুঝল না — "কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ"। তবে, সব মজারই শেষ আছে। বাসি পচা চড়কের বিবরণ লেখক লিখতে চান না। তাঁর শেষ বক্তব্য এই রচনাটি লেখার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার — "তৎকালীন সমাজের ইন্সাইড জানলে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে 'সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি'।

১০.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথম খণ্ডের আরম্ভে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে রচিত একটি কবিতা ছিল — [হে শরদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে? কোন অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?] কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে একটি টপ্পা গানর দুটি পংক্তি রাখা হয়— "কহই টুনোয়া/সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালি।" — যা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক কলকাতার বাবু কাল্‌চার এবং ব্যাপকভাবে সমাজের চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়েছে। 'সমাচার-দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' এই ধারার সূচনা হয়েছে এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ইত্যাদি প্রহসনের মধ্যে এবং এরপর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'তে এই ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে। পরবর্তীকালেও এই ধারা চলেছে হুতোমকে ব্যঙ্গ করে এবং অনুসরণ করে। যেমন, 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে' (১৮৬৩) আপনার মুখ আপনি দেখ — এ দুটি ভোলানাথ ঘোষের রচনা। 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী', 'নিশাচর' — ক্ষেত্রমোহন ঘোষ রচিত, 'সমাজকুচিত্র' — ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত, ইত্যাদি। এগুলিতেও পণপ্রথা, মদ্যপান, বারাঙ্গনাবিলাস, লাম্পট্য ইত্যাদি চিত্রত হলেও এদের সাহিত্যমুল খুব বেশি নেই। এগুলি রুচিশীলতার গণ্ডিও মানেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত কৌতুক রচনাগুলির বিষয় সমাজের সর্বস্তরেই বিচরণশীল ছিল এবং এ বিষয়ে হুতোমের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। চাটুকার পরিবৃত জমিদার, মাতাল, উমেদার, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভিখারী কেরানী ইয়ংবেঙ্গল ছোকরা, ব্রাহ্ম, দোকানী, স্টেশন মাস্টার কলকাতার সঙ্, যাত্রা, হাফ্-আখড়াই এর আসর, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, নগরের বারাঙ্গনা, মদের আসর সর্বত্রই লেখকের তির্যকদৃষ্টি বিচরণ করেছে। সমাজের যাবতীয় কপটতা ও ভণ্ডামি নিপুণ চিত্রকরের মত হুতোম এঁকেছেন।

'চড়ক' প্রবন্ধের প্রথমেই চড়কের আয়োজনও 'আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন'। বলে জমিদার বাড়ীর চিত্র দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যতা দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, নন্দকুমারের ফাঁসী হওয়ার কিছু পূর্বে নুনের ব্যবসা করে বাবুর প্রপিতামহ বড়লোক হয়েছিলেন ও পরে বনেদী বড়লোকে পরিণত হন। বড়মানুষ 'কবলাতে' যা যা প্রয়োজন সবই বাবুর আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ ও শ্রোত্রীয়, কায়স্থ এবং নিম্ন সম্প্রদায় সবার মিলিত একটি দল আছে। বাড়ীতে সব ক্রিয়াকর্ম হয়। "ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকস্বরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুচীর নিত্যসেবা হয়ে থাকে।'

চড়কের পরিবেশ প্রস্তুত। কাঁটা ঝাঁপের দিন — সর্বত্র সাজো সাজো রব। মূল সন্ন্যাসী জাতে কাওরা কিন্তু আজ কাদা পায়ে ফরাসের উপর দিয়ে হেঁটে বাবুকে আশীর্বাদ করল। গাজনতলা লোকারণ্য — শিবের মাথার ফুল পড়ছে না, অবশেষে বাবু এলে ফুল পড়ল। 'বলে ভদ্দেশ্বর শিবো' বলে সবাই চীৎকার করতে লাগল। দুদিন আগে জলে ফেলা বৈঁচির ডাল তুলে পেটানো হল — কাঁটাগুলি নষ্ট করার জন্য — তারপর দুজন দুদিকে থেকে 'ডবল গামছা বেঁদে' টানা ধরল তার উপর সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ খেতে লাগল। ঝাঁপ শেষ হল। বেলফুল, বরফ, সানাই শব্দের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নামল। রাস্তায় ভদ্রলোক ছোটলোক চেনার উপায় নেই, সকলেরই পায়ে জুতো পরনে ধুতি উড়ুনি। অনেকেরই গন্তব্য বারাঙ্গনাগৃহ, কেউ প্রকাশ্যে যাচ্ছে, কেউ গোপনে। এই ভাবে লেখকের ক্যামেরা ঘুরে বেড়িয়েছে সৌখীন কুঠিওয়ালার বাড়ী, রাস্তার দোকান শোভাবাজারের মাছের বাজার, তার পর আবার বাবুদের গাজনতলায় ঝুল-সন্ন্যাদের আসবে। সন্ন্যাসীরা গুড় আর ধুনো জ্বালিয়ে উপরে একজনকে ঝোলাতে শুরু করল — প্রত্যক্ষ বর্ণনা, যেন আমরা চোখে দেখলাম। চোর, পুলিশ, গাঁজাখোর, দালাল কে উপস্থিত নেই, এই আসরে! বাবু বুঝে বড়লোকদের বাড়ীতে লোকসমাগম হচ্ছে। বাবুরা, কেউ সিকিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন, কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও "সাত পুরুষের ক্রিকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন, বাস্তাবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজপিসে বর্তমান — আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তী হয় নাই।" চড়কের বাণ ফোঁড়া দেখতে অনেকেই ভালোবাসে। তাদের বিচিত্র ধান্দা এবং মনোভাব লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন। জমিদারের কাছে যে সব উমেদাররা আসে, তাদের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়িয়ে দেয়। ধর্মান্তরিত 'ক্যাটিকুষ্ট'র দুর্দশা দেখে লেখক খৃষ্টান হতেও ভয় পেয়েছেন। সরকারী তোপ পড়ার পর সেদিনের আমোদ বন্ধ হল আর পরের দিন নতুন উৎসাহে শুরু হল। চড়ক পাকে কিছু লোক মজা পেল, কিছু লোক কষ্ট পেল। "একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখচেন।"

প্রাবন্ধিকের উপলব্ধির সঙ্গে আধুনিক কলকাতার আমোদের চেহারা প্রায় এক — 'কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্‌রির ফুরোয় না, বারোইয়ারি পূজার প্রতিমা পূজা শেষ হলেও বারো দিন প্রতিমা ফ্যালা হয় না।' লেখক অল্পবয়সী হলেও যে বহুজ্ঞতা সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা এই নিবন্ধের বিরল সংযোজন। কলকাতার লেকাচরিত্র এবং বাঙালির এই 'আমোদ গেঁড়ে' স্বভাবের পরিচয় শুধু সেকালীন নয়, চিরকালীন। 'চড়ক ও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে'-এর নিদর্শন বিভিন্ন উৎসবে আমরা আজও পাই। লেখক চোখ কান খোলা রেখে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপেই বক্তব্য শেষ করে দেন নি, নিজেকেও এর অন্তর্গত করে রেখেছেন। কলকাতার বিলাসিতাপূর্ণ এবং নীতিবিবর্জিত মানুষদের আত্মচেতনাকে বিদ্রূপের কশাঘাতে প্রাবন্ধিক ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তাদের সুবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যমূলক রচনাও সাহিত্যধর্ম বিবর্জিত নয়। যেমন, 'কলকাতা সহর রত্নবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই' বা, 'আজ বুড়োটি বিদায় নিলেন — যুবাটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীন আমরা — কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি আগামীর মুখ চেয়ে — আমার মন্ত্রণায় আমরা সেসব মন থেকেই তার সঙ্গে বিসর্জন দিলেম। —ভূতকাল আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন...' ইত্যাদি। পরম উপভোগ্য ও বাস্তব এই বর্ণনা। আবার, মৃদু বিদ্রূপ ও ততোধিক হিউমার সম্পৃক্ত এই অংশ —"অজাকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না — আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।" ব্যক্তিবিশেষ মৃদুভাবে এই ব্যঙ্গে লক্ষিত হলেও এর রসবোধ

বা ঐতিহাসিক গুরুত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। বরং সাময়িকতাকে অতিক্রম করে এর স্থায়ী হিউমার উপভোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

নক্‌শা এক ধরণের সাহিত্যরীতি যার উল্লেখ J. A. Cuddon তাঁর 'A Dictionary of Literary Terms' গ্রন্থে বলেছেন এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন 'A well known example is Dicken's 'Sketch by Boy (1836-37) a series of sketchess of life and manners'. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'The Calcutta Review' পত্রিকায় হুতোমকে ডিকেন্সের স্কেচের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং টেকচাঁদ স্টাইলের সবচেয়ে সার্থক লেখক বলেছেন কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও বলেছেন, '... but as the author of Hotom Pyancha, a collection of sketches of city life, some thing, after the manner of Dickens'. Sketch by Boy, "in which the follies and pecularities of all classes and not seldom of men actually living — are described in very vigorous language, hot seldom disfigured by obsecenity." বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে আরও বলেছেন, "পরদ্বেষী, পরিনন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত।" কিন্তু নীতিবাগীশ শিবনাথ শাস্ত্রী একে এমনটা মনে করেননি বরং তিনি একে বলেছেন 'সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী।" বিদ্যাসাগর এই ভাষার আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বড়মানুষদের উমেদারদের বিবরণে বোধহয় সচেতনভাবে হুতোমকে অনুসরণ করেছেন। আবার, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতেও কিছুটা অনুসরণও করেছেন বলা যায়।

১০.৭ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ভাষা

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর ভাষা। সচেতনভাবে ভাষা নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। যেহেতু মধুসূদনের ভাষা কাব্যের — তাই তা অলংকৃত। প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্যভাষাকে অবলম্বন করলেও সাধুভাষার ঠাযকে বজায় রাখলেন। হুতোম পুরোপুরিই কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করলেন। ড. সুকুমার সেনের মতে — "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার ভাষা বিশুদ্ধভাবে 'কলকেতাই' কথ্য ভাষা আশ্রিত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথ্যভাষায় কলকাতার স্ল্যাং অর্থাৎ অভব্য শব্দপ্রয়োগ এড়াইয়া চলা বড় কঠিন।" বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন প্যারীচাঁদ মিত্রই ভাষাকে সংস্কৃতের কঠিন নিগড় থেকে মুক্ত করেছিলেন, বস্তুতপক্ষেই আলালে কথ্য শব্দের প্রয়োগ ও রীতির প্রতি একটা প্রবল ঝোঁক ছিল এই মাত্র — রীতির সার্থক প্রয়োগ সেখানে নেই। হুতোমী ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই—

(১) কলকাতার চলিত মুখের বুলি (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী শব্দ) এবং বাংলা নিজস্ব প্রবাদ প্রবচনের প্রাধান্য। যেমন, (ছেলেরা) আহার নাই নিদ্রা নাই ঢাকের পেচোনে পেচোনে রোদে রোদে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্ছে।' 'রমাল', 'ফিটন', 'সেল্‌ফ ড্রাইভিং', 'সইস-কোচম্যান' 'খাতির নদারৎ' ইত্যাদি শব্দের একত্র ব্যবহারও দেখতে পাই।

(২) শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ও সর্বনাম পদের চলিতরূপের ব্যবহার। 'গামচা কাঁদে' 'মাচ', 'নিবে', 'কচ্চে', 'কত্তে' ইত্যাদি।

(৩) শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার — 'পেচু পেচু' 'রপ্টে রপ্টে' 'গুপুস্' 'কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব' ইত্যাদি।

(৪) চলিত রীতির আধারে ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্তি।

(৫) বর্ণনীয় বিষয়ের চিত্রধর্মিতা।

(৬) ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিময়তা — 'পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে এমন কোনো কথা নাই। কারণ দুই একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতাকে এসে বিলুক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান।"

নতুন ছন্দের ক্ষেত্রেও হুতোমের অবদান সামান্য নয়। গ্রন্থের প্রথমেই যে অমিত্রাক্ষর ভাঙা কবিতা গুলি আছে, তা গৈরিশ ছন্দের পূর্বরূপ। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ কথা স্বীকার করেছেন।

হুতোমে ব্যবহৃত চলিত ভাষা মানে উত্তর কলকাতার ভাষা — যা কথাবার্তা, যাত্রা-পাঁচালি-নাটকে ব্যবহৃত হত। শিষ্ট গদ্য ব্যবহৃত হয় লেখার ক্ষেত্রে। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ সর্বনাম মাত্র ছেঁটে দিয়ে হুতোম চলিতে পরিণত করেননি। এর সাহিত্যিক প্রকাশরীতি একেবারে ভিন্ন। বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, 'আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়া বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটানো যায়, ফুল ফুটানো যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম আমাদের মাতৃভাষা, সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮২৭ 'বঙ্গদর্শনে' ফাল্গুন সংখ্যায় বলছেন 'হুতোম প্যাঁচাও এই পরিবর্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।" প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "এরকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।... যাঁরা এ পুস্তক পড়েননি তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি।"

হুতোমের বর্ণনায় যে রসবোধের পরিচয় আছে, তাকে নিছক অশ্লীলতা বলে উড়িয়ে দেবার কোনো উপায় নেই। স্যাটায়ার এবং উইটের প্রাচুর্য এই রচনাকে জীবন্ত করে তুলেছে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রধান হলেও এতে হিউমারও কম নেই কারণ লেখক নিজেকে এই চলমান কলকাতার অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। এবিষয়ে অবশ্য মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী প্রহসনকার দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে ব্যঙ্গের চেয়ে হিউমারের প্রাধান্য এবং এই সবকিছুর সংশ্লেষ যাঁর মধ্যে ঘটেছে সেই বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) শুধুই চতুর তাঁর রচনায় অশ্লীলতার কোনো স্থান নেই। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শলা' তথা 'চড়ক' নিবন্ধ বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য সৃষ্টি এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

১০.৮ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র অন্তর্গত 'চড়ক' নিবন্ধটিকে রম্যরচনা হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে আপনার যুক্তি বিশদ করে বলুন।

২। তৎকালীন কলকাতার সমাজ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 'চড়ক' নিবন্ধ অনুসারে বিবৃত করুন।

৩। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে 'চড়ক' নিবন্ধ তথা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র স্থান নির্ণয় করুন।

৪। 'চড়ক' উৎসব উপলক্ষে কী কী করা হয় 'চড়ক' নিবন্ধ অবলম্বনে বর্ণনা করুন।

৫। পাঠ্য 'চড়ক' নিবন্ধ অনুসারে কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতির পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বাংলা সাহিত্যে হুতোমের আবির্ভাবের পটভূমিটি স্পষ্ট করুন।

২। 'চড়ক' নিবন্ধকে সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে কী অশ্লীল বলাচলে? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৩। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার রচনা? এই গ্রন্থটির সঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৪। কোথাকার ভাষাকে 'চড়ক' নিবন্ধে আশ্রয় করা হয়েছে, দৃষ্টান্তসহ বিবৃত করুন।

৫। হুতোমকে পরবর্তীকালে কে অনুসরণ করেছেন? তাঁর সঙ্গে হুতোমের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বিদ্যোৎসাহিনী সভা-র মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

২। 'চড়ক'-এ কোন্ সময়কালের কলকাতা বর্ণিত হয়েছে?

৩। প্রাবন্ধিকের মতে, কোন রাত্রে কলকাতা শহর 'বড় গুলজার' থাকে?

৪। ইংরেজরা বছরের কোন্ সময়ে 'বড় আমোদ' করেন?

৫। প্রাবন্ধিকের মতে, ইংরেজি কেতার বাবুরা কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত?

১০.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'

৩। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' —সম্পাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

৪। 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' — অজিত ঘোষ

৫। 'বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি' — মোহিতলাল মজুমদার

মডিউল - ৩
রম্যরচনা

একক ১১ ❑ কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'একা কে গায় ওই'

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য
১১.২ প্রস্তাবনা
১১.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা
১১.৪ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১১.৫ প্রবন্ধের মূলপাঠ
১১.৬ মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার
১১.৭ বিশ্লেষণী পাঠ
১১.৮ সারাংশ
১১.৯ অনুশীলনী
১১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে জানা যাবে।
- 'কমলাকান্তের দপ্তর' সম্পর্কে পাঠক কৌতূহলী হবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি ও হাস্যরস স্রষ্টা হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১১.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রমবিকাশ মান গদ্যরীতির বিভিন্ন ধারাগুলি যেমন একটা লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে সমাহিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে একটা বিশেষ পরিণত রূপ লাভ করিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন রচনাসাহিত্যের ধারাও আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তেমনি একটি বিশেষ পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল। (বাঙলা সাহিত্যের একদিক — শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের গদ্যরচনাগুলি সবই ছিল উদ্দেশ্যমূলক এবং খুব কম রচনাই নিজ উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে উঠতে পেরেছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষায় কিছু স্বচ্ছতা ও প্রয়োগের সাবলীলতা দেখা গেলেও তাকে পুরোপুরি সাহিত্যিক রচনা বলা চলে না। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা সাহিত্যে এলেন এবং বাংলা গদ্যকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাহন করে তুললেন কিন্তু তাঁর রচনাতেও সাহিত্য গুণের অভাব। সমসময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগরের রচনা বরং অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। বাংলা ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিদ্যাসাগর সার্থকভাবে শৃঙ্খলিত করলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার বাঙালীর সামনে উন্মোচিত করে তার সাহিত্য গুণও বাংলা ভাষায় নিয়ে এলেন। মৌলিক রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বরং সে অর্থে সাহিত্যরসান্বিত নয়। এতে 'সাহিত্যিক মাত্রা ও সংযত কলাকৌশলের একটু

অভাব আছে বলা যায়।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (স্বরচিতজীবনচরিতী-১৮৯৪) বর্ণনাগুণে সাহিত্যরসাক্রান্ত হয়ে উঠলেও তা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা (১৮৭২) প্রকাশের বহু পরবর্তীকালের রচনা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের একটি মাইলফলক। যা 'সব্যসাচী' বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র প্রতিভাকে ধারণ করে রেখেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ উপন্যাসিক হলেও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তিনি সমভাবে সফল। 'বঙ্গদর্শন' 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্দসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য-সমালোচনা, তত্ত্ব-দর্শন, সমাজভাবনা, ইতিহাস অনুসন্ধান, দেশহিত-চিন্তা তাঁর প্রবন্ধে সবই আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম তিনিই শুরু করেন। একা বঙ্কিমচন্দ্র নন, তাঁর সহযোগীদেরও চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি উন্নত মনে উপনীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরস্পরবিরোধী ভারতরঙ্গের আপাতবিরোধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে পা রাখলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে — 'এ জীবন এইয়া করিব' এই তাড়না তাঁকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর করে দিল এবং একমাত্র প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতির উপকার তিনি করতে পারেন এই উপলব্ধিতে তিনি স্থিত হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে তাঁর প্রবন্ধকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে আছে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন, তর্ক-বিতর্ক, অন্যদিকে আছে ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক রচনারীতির মাধ্যমে, কখনো বা গীতিকাব্যিক ভাষায় নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করা। প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসবিদ্, সমাজতাত্ত্বিক, সমালোচক, সাহিত্যতত্ত্ববিদ। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনি তাঁর ধ্যানচিন্তাকে সংহত করেছেন অন্তর্লোকে। তুচ্ছ নগণ্য বস্তুও এখানে তাঁর কল্পনার রঙিন আলোকে মোহময়–ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিহৃদয়ের কথা, সমাজতত্ত্ব, দেশপ্রেম — কল্পনা এবং ব্যক্তিক রঙে ভিন্ন সাদযুক্ত রচনাতে পরিণত হয়েছে। প্রথম ধরণের প্রবন্ধের ভাষাশৈলী যুক্তিনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণধার, সুসংবদ্ধ। দ্বিতীয় ধরণের রচনার প্রকাশভঙ্গি কাবিক। ভাষাও এখানে হয়ে উঠেছে ভাবকল্পনার উপযুক্ত বাহন্। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিনিষং প্রবন্ধরীতি অনুসৃত হয়েছে 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'সাম্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থে এবং দ্বিতীয় ধরণের রচনার উদাহরণ, 'মুচিরাম গুনের জীবনচরিত' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'। এদের মধ্যে 'কমলাকানতের দপ্তর' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

১১.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮শে জুন ১৮৩৮, মৃত্যু ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা কাঁঠালপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতামহ বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মকালে তাঁর পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে আসেন এবং এখানেই তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। বঙ্কিমচন্দ্র সহ ১৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন — এর মধ্যে মাত্র দুজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরও ডেপুটি কালেক্টার পদে নিয়োগ করা হয়। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আইন পাঠরত ছিলেন। পড়া ত্যাগ করে তিনি কর্মে যোগ দেন। পরে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ

থেকে বি.এল পরীক্ষা দেন ও পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দর ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল জ্ঞানার্জনস্পৃহা তাঁকে শুধু পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। ইংরাজী সাহিত্য ছাড়াও নানা প্রগতিশীল মতবাদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। কোমতের পজিটিভিজম বা হিতবাদ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কর্মস্থলে প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি স্বজাতি ও স্বদেশ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করলেন। বিচার ও তদন্তের সময় বিভিন্নশ্রেণীর মানুষ ও তাদের জীবনযাপন প্রণালীর সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় এবং তাঁর মতামত ক্রমশঃ পরিণত ও সুগঠিত হতে শুরু করে। সাহিত্যসেবা ও দেশহিতকে আলাদা করে দেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্যাবস্থাতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর বহু গদ্য-পদ্য রচনা ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে খুলনায় থাকাকালীন তিনি কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'Rajmohon's wife' নামক ইংরাজী উপন্যাস প্রকাশ করতে শুরু করেন। এটি অসমাপ্ত রেখে (পরে এর সাতটি অধ্যায় নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন) খুলনাতে থাকাকালীনই তিনি রচনা করতে শুরু করেন তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী এটি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এটিই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস।

বঙ্কিম-মনীষা শুধুমাত্র উপন্যাস রচনা করে তৃপ্তি পায়নি। দেশকাল, সমাজ, মানুষ, আদর্শ, দেশহিত-চিন্তাই তাঁকে প্রবর্তিত করেছিল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। 'প্রবন্দ সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট, ইহার অননুমেয় রূপ-বৈচিত্র্যের কারু শিল্পী, ইহার সমস্ত সীমাতিসারী ভাবসত্তার সৃষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।' যে প্রবন্ধের পরিধি এতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের তথ্য ও তত্ত্বের গুরুভারক্লিষ্ট, মন্থরগতি সারসংকলনে সীমাবদ্ধ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে তাতে এল প্রাণের স্পন্দন। জীবনের বহুমুখী গতিধারায় তিনি নিজের প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারাকে সঞ্চারিত করলেন। 'গুটিপোকার বিচিত্রবর্ণ প্রজ্ঞাপতিতে রূপান্তরের ন্যায় বঙ্কিমের হাতে প্রবন্ধের এক নবজন্ম—পরিগ্রহ ঘটিল। জ্ঞানপ্রধান প্রবন্ধ ভাব প্রধান রসরচনার রূপ পরিগ্রহ করিল।' ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ ও তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন তিনি। উপন্যাসের নিশ্চিত, প্রতিষ্ঠিত আসন ছেড়ে বেছে নিলেন বিফুল ও বহুমুখী প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্র। প্রকাশিত হল, 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬) ও প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯) — পরে এই দুটি গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ নামে একত্রিত হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৮৭)। 'সাম্য' (১৮৭৯), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৯২) — বিষয়বৈচিত্র্যে ও সরস রচনাভঙ্গিতে প্রবন্ধ প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য হয়ে উঠল।

দুইভাগে বিভক্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগটি 'রচনা' — যার নিদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। এই গ্রন্থগুলি রচনাসাহিত্যের আত্মলীন বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'বিবিধ প্রবন্ধের' বেশ কিছু রচনায় বিষয়গত মিল আছে। কিন্তু 'দপ্তর' তথ্যনিষ্ঠাকে বাদ দিয়ে তাকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বস্তু প্রধান প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি মন্তব্য, ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত মানসের পরিচয় দিয়েছেন। 'এই তথ্যপুঞ্জ ও তত্ত্বব্যূহের মধ্যে যে একটি সরস চতুর মন, একটি সৌন্দর্যসচেতন রসস্রষ্টা সাবলীল গতিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি যে মুহুর্মুহু পাঠককে শুধু জ্ঞানাহরণের নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতা হইতে মুক্তি দিয়া তাহার রসানুভব শক্তি ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের সংবেগকে সক্রিয়ভাবে উদ্রিক্ত

করিতেছেন তাহা, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।' এই গুণের সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যুক্ত হয়ে সরস বিদ্রূপ, হিউমার, আত্মকথন, দার্শনিকতার দ্রুত পরিবর্তন, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমনের অনায়াস গতি এবং জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা সমূহ।

১১.৪ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করতেন। 'শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ' শিরোনামে শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে একথা উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের কমলাকান্ত চরিত্র যে বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি তা নিয়ে মতান্তরের কোনো অবকাশ নেই। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রৌঢ় জীবনের ফসল। ইতিপূর্তে তাঁর আটখানি উপন্যাস রচিত হয়ে গেছে। এরই ফাঁকে বঙ্গদর্শনের জন্য তাঁকে নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। একটি মাসিক পত্রিকার গহ্বর পূর্ণ করা সহজ কাজ নয়। সরকারী চাকুরীর শৃঙ্খল অগ্রাহ্য করে স্পষ্ট কথা বলাও তাঁরপক্ষে সহজ কাজ ছিল না এবং জানা গেছে যে, এই সময় তাঁর পরিবার জীবনও নানা সমস্যায় পড়েছিল। কর্মস্থলের গুরুদায়িত্ব, সাংসারিক সমস্যা ও সাহিত্যসেবা — সবদিক মিলিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই, নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল; কমলাকান্ত সেই ছদ্মবেশ।

'কমলাকান্তের দপ্তরের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত এমন নহে। কিছু ইংরাজী, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হইল না,সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে, — তাহারা তালুক মুলুক করিল — আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।' এই কমলাকান্ত একবার চাকরি পেয়ে কাগজে শেকস্‌পীয়রের বচন উদ্ধৃত করে রাখত, 'যথার্থ পে বিল' নাগা ফকিরদের ভিক্ষার চিত্র পেশ কছিল — কাজেই তার চাক্‌রিটা গেল। তার অর্থের প্রয়োজন ছিল না, সে বিবাহ করে নি। কিসে তার খাওয়া চলে এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল 'ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ' করে থাকে সে (কমলাকান্তের জোবানবন্দী)। ভীষ্মদেব খোশনবীসের আশ্রয়ে সে থাকত — "যেখানে হয় দুইটি অন্ন এবং আধভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত।" কিন্তু একদিন সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরে কমলাকান্ত উধাও হয়ে গেল। এবং যাওয়ার সময় তার দপ্তরটি যা একখানি মসীচিত্রিত পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত' তা ভীষ্মদেবকে দিয়ে গেল। এই ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে 'কমলাকান্তের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নির্লিপ্ততা।' সংসারের সঙ্গে তার একমাত্র বন্ধন তার ভোজন ও আফিমসেবা। সে আফিম সেবন করলে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত হত এবং তখন অনায়াসে জগতের সমস্ত রহস্য তার কাছে উন্মোচিত হত।

কমলাকান্তের দপ্তরের রচনারীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যে সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মিল সমালোচকেরা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে এটি পুরোপুরি অনুকরণজাত সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখেছেন, 'কৈশোরে কমলাকান্ত প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম তখন ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, ওটা 'De Quincey র Confession of an English Opium Earth' এর অনুকরণ"। এইভাবে কমলাকান্তের দপ্তরকে কখনো De Quincey র সঙ্গে, কখনো ভীষ্মদেব খোসনবীশকে ওয়াল্টার স্কট রচিত 'Tales of my Landlord'-এর একটি চরিত্র বোথামের সঙ্গে কখনো

লে হান্ট রচিত 'The Call by the Fire' 'বিড়াল' প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ইংরাজী সাহিত্যের রচনাদর্শের প্রভাব থাকবেই। তবে, এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুকরণ করা হয়নি। De Quincey নিজে অহিফেনে আসক্ত ছিলেন এবং এই মাদক দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু কমলাকান্তের কাছে অহিফেন কল্পনা ও বাস্তরাজ্যের প্রেরণাস্থল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর স্কটের প্রভাব সম্পর্কেও অনেক সমালোচক বলেছেন। স্কটের তুলনায় সাহিত্যরচয়িতা হিসাবে অনেক বেশি প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মত করেই কল্পনা করেছেন, অনুকরণ করেন নি। অনেকে বলেছেন কমলাকান্ত এডিসনের গ্রাম্য ভদ্রলোক রোজার ডি কভার্লির কথা স্মরণ করায়, স্কটের 'টেলস্ অব মাই ল্যান্ডলর্ড' এর একটি চরিত্রের ছায়ার কথাও অনেকে বলেছেন। তবে যে প্রসন্ন সরস ও নির্লিপ্ত মন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনা করেছেন তা পারিপার্শ্বিক বাঙালী — জীবন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন। কমলাকান্তের সঙ্গে প্রসন্ন গোয়ালিনীর সম্পর্ক একেবারেই গব্য-রসাত্মক — প্রসন্ন অনেক ক্ষেত্রে কমলাকান্তের মাতাও হয়ে উঠেছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত কমলাকান্তের দপ্তরের উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব কিছু পরিমানে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও রীতির উপরে ইংরেজী সাহিত্যের কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানে সেখানে বহিরঙ্গ যেসব মিল রহিয়াছে তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্যও কিছু কিছু মনে আসিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপ সমন্বিত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি রচনা-সাহিত্যের বিশেষ করিয়া এডিসন ও স্টীলের রচনার সমধর্মী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এডিসন, স্টীল প্রভৃতির লেখা যে সকল সাময়িকপত্রে বাহির হইত তাহার ভিতরে প্রধান পত্র 'স্পেকটেটর' (spectator); ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নাম-সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।" এডিসন, স্টীল ইত্যাদি রচয়িতারা এক ধরনের হাস্যরসাত্মক রচনার প্রবর্তন করেন যার মধ্য দিয়ে পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতির গলদ নিয়ে মৃদু সমালোচনা করেছিলেন। "এই সকল সাদৃশ্য ও সাধর্ম্য সত্ত্বেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র উপরে এইসব পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব আমাদের নিকট অতি গৌণ বলিয়া মনে হয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রচনার ভিতরে যে একটা অনুভূতির তীব্রতা, ভাবের প্রবল আবেগ, চিন্তার গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সরতা লক্ষ্য করিতে পারি আমাদের বিচারে উপরিউক্ত পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখায় তাহা দুর্লভ। একটা আদর্শ হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু আদর্শের ভিত্তিতে যে রূপায়ণ তাহা ইংরেজ লেখকগণের সহিত সাধর্ম্যকে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

কমলাকান্তকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি জীবন্ত চরিত্ররূপেই সৃষ্টি করেছেন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "কমলাকান্তের চরিত্র বঙ্কিম রচিত অনেক চরিত্রেরই ঘনীভূত রূপ।" চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনের প্রতিরূপ এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি চরিত্র। পরবর্তীকালে কমলাকান্তের প্রভাবপুষ্ট অনেকগুলি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'জটাধারীর রোজ নামচা', বীরবল, পরশুরামের গল্প, পরিমল গোস্বামীর 'এক কল্‌মী' ইত্যাদি। প্রমথনাথ বিশীর 'কমলাকান্ত শর্মার ছদ্মনাম গ্রহণ করে রচনাও উল্লেখযোগ্য।

'কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধসমূহ প্রথম 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় — ১২৮০ সাল থেকে ১২৮২ সাল পর্যন্ত। প্রথম পর্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তরে' প্রকাশিত হয় ১৪টি প্রবন্ধ — যার অন্তর্গত 'একা কে গায় ঐ', 'পতঙ্গ','বিড়াল', 'বসন্তের কোকিল', 'বড়বাজার' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনা। দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় (১২৮৪) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় — তৃতীয় পর্যায়ে (১২৮৮) ছিল 'ঢেঁকি' 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে ১৪টি প্রবন্ধ নিয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রবন্ধগুলির মধ্যেই লুকিয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক এবং মহান মানবতাবাদী সত্তার এক মিলিত রূপ — এ জন্যই কমলাকান্তের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বাস্তব বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর কাল্পনিক সত্তা — 'এই রূপ দুয়ে মিলিয়া একটি জীবন — সত্যের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করিয়াছে।'

১১.৫ প্রবন্ধের মূলপাঠ

একা—"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি অমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা, তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি এক—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আন্দোখিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই

অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গ ভাল লাগি,—এখানে লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই। বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহৃত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আরকি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

১১.৬ মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার

কোনো একটি জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে কমলাকান্তের কর্মে বহুকাল-বিস্মৃত সুখের মত একটি গীত প্রবেশ করল। গীতটি যে খুব সুন্দর ছিল এমন নয় — একা একটি পথিক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল — কমলাকান্ত ভাবতে

লাগল সংগীতটি কেন তার এত মধুর লাগল। কমলাকান্তের মনে হল তার একাকীত্ব এবং নির্জনতার মধ্যে এই গীত তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করেছে। রাজপথ লোকসমারোহে পরিপূর্ণ কিন্তু কমলাকান্ত একা। তার ইচ্ছা করতে লাগল ঐ জনসমুদ্রে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। তার মনে হল কেউ যেন একা না থাকে যদি তার প্রণয়ভাগী কেউ না থাকে তবে তার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প মানুষের ঘ্রাণকে পরিতৃপ্ত দিয়েই সুগন্ধি হয়ে ওঠে। কমলাকান্তের শ্রুত সংগীতটি স্বতঃস্ফূর্ত — মানুষের আনন্দজাত। পরিণতবয়স্ক কমলাকান্ত বহুকাল আনন্দানুভব করেনি। যখন তার যৌবন ছিল তখন পার্থিব সব বস্তু তাকে আনন্দদান করত — তখন সংগীত তাকে যে আনন্দ দিত তারই সুখস্মৃতি এখন তাকে আনন্দ দিল। ক্ষণকালের জন্য যেন সে যৌবন ফিরে গেল। তার মনে হল, ক্ষণিক ভ্রান্তির কারণেই এ সংগীত তার কাছে এত মধুর লাগল।

কমলাকান্ত অনুভব করল বয়স বাড়ার সঙ্গে সুখদায়ক সামগ্রীর সঞ্চয় বেড়েছে কিন্তু সুখ কমেছে। কারণ, আশা কমেছে। আশাহচ্ছে সেই রঙন কাচ যা দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর দেখায়। পরিণত বয়সে কমলাকান্ত জেনেছে — 'যৌবনে সুখ অল্প কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা' — তাই সুখ ঘটে। এখন সে জানে পৃথিবীতে নূতন বলে কিছু নেই সবই আবর্তনমাত্র। মধুময় পৃথিবী তার কাছে এখন বিষময়। মানুষ চরম স্বার্থপর — নিজেকে ছাড়া কিছুই জানে না — 'মনুষ্য হৃদয়ে কেবল আত্মাদক আছে।' কমলাকান্ত এখন আর মনুষ্যসংসারজাত আনন্দ পেতে চায় না, সর্বব্যাপী প্রীতিকর একটি সংগীত কমলাকান্ত এখন অনুভব করতে চায় — তা হল সর্বব্যাপী প্রীতি। মনুষ্যপ্রীতি কমলাকান্তের কাছে ঈশ্বর। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী — ঈশ্বরই প্রীতি। ...মনুষ্যজাতির উপরযদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।"

১১.৭ বিশ্লেষণী পাঠ

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'একা — কে গায় ঐ' রচনাটি। এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব — জীবনের বিচিত্র পরিচয় — তাঁর অনুভূতি, তাঁর নিভৃত চিন্তা, তাঁর জীবনদর্শন সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এখানে আর কোনো তত্ত্ব নেই তাই এটিকে একান্তভাবে subjective রচনা বলা চলে। এ প্রসঙ্গে ড. শশিভুষণ দাশগুপ্ত বলছেন, ''গদ্য-রচনাও যে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টির কতখানি উচ্চস্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম সচকিত করিয়া দিয়াছে। ধরা যাক্ প্রথম সংখ্যার কথা, একা — কে গায় ঐ; ইহা কোনো সংবাদ বহন করে না, তথ্য যাহা আছে তাহা তর্কাতীত বা সংশয়াতীত নহে, পাণ্ডিত্যের ভারেও সে তেমন ভারী নহে; তথাপি সে সুন্দর সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ সে সাহিত্যিক সৃষ্টি; সে বহন করে আশা-নিরাশায় ভরা জীবনের সঞ্চিত রসানুভূতি, আর তাহার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের দরদী কবিচিত্তের মধুর স্পর্শ।"

শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগে একক ছিলেন — শিল্প সমালোচনার আদর্শ তাঁকে নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়েছে। এই রচনার সমসময়ের পারিবারিক জীবনের জটিলতা দ্বারা তিনি কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। যে গভীর অনুভূতি এই রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু রেশ আমরা পরে তাঁর 'বুড়া বয়সের কথা' প্রবন্ধে পাই — 'অন্ধকার প্রভো। চারিদিকেই অন্ধকার।' বড় মাপের মানুষ, সার্থক শিল্পী নিঃসঙ্গই হন — জগৎসংসারের ক্ষুদ্রতার মাপে তারা নির্মিত হন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলাকান্ত একই সত্তা, আফিংখোর কমলাকান্ত চক্রবর্তীর বেনামীতে কথা বললেও কারো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এগুলি লেখকেরই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতোৎসারিত।

'একা—কে গায় ঐ' রচনায় অতীত সুখস্বপ্নকে জাগিয়ে তুলেছে একটি গীত। সমস্ত সংসার যেখানে আনন্দে ভাসছে সেখানে কমলাকান্তই একমাত্র নিরানন্দ। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে লেখক দেখলেন, তাঁর যৌবন অপগত, যৌবনের 'আশা' নামক রঙিন কাচটি আর নেই। এখন তিনি অভিজ্ঞ, তাই নিষ্প্রয়োজনে কথা বলেন না, নিজের চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না। মানুষকে আর সরল বলে ভুল করেন না। যৌবনে সবকিছুই তাঁর কাছে সুখময় বলে মনে হত এখন সে সুখ আর নেই। 'আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম — সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতি সূচক সঙ্গীত কর্মে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।' এই মধুর বোধও কিন্তু স্থায়ী হল না কারণ পরিণতবয়সে সব কিছুরই কার্যকারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট। 'এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।'

'একা—কে গায় ঐ' বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি উপলব্ধি প্রকাশিত। প্রথম উপলব্ধি তাঁর একাকীত্ব, দ্বিতীয় উপলব্ধি, 'আশা' না থাকার ফলে এই নিঃসঙ্গতাজনিত বেদনা এবং তৃতীয় উপলব্ধি, মনুষ্যের প্রতি প্রীতিই তাঁকে এই একাকীত্ব থেকে বাঁচাতে পারে। 'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী — ঈশ্বরই প্রীতি।' এই রচনার প্রথম অংশে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন একা না থাকে। মানুষের প্রণয়ভাগী যদি কেউ না থাকে তবে তার মনুষ্যজন্ম বৃথা। এরপর তাঁর বিখ্যাত উক্তি, 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।' দ্বিতীয় উপলব্ধি — আশার অভাব এবং সংসারের অসারতা। আমাদের মোহ যৌবনে যা দেখায় তা প্রৌঢ়ত্বে মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। তখন সুখদ সামগ্রীর অপরিমিত সঞ্চয়ও মানুষকে সুখী করতে পারে না। 'তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে, যখন মনে ভাবিতেছি এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র।" তৃতীয় উপলব্ধিটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্যপ্রীতির চরম দৃষ্টান্ত। প্রীতিকে ঈশ্বর বলায় ঈশ্বর-ভক্তির কথাও বলা হয়েছে, তবে লক্ষ্য মানুষ। "মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।"

'কমলাকান্তের দপ্তরে রয়েছে একদিকে ব্যবহারিক জীবনে সফল ও স্রষ্টা হিসাবে সার্থক বঙ্কিমচন্দ্র — অন্যদিকে শিল্পীমনের গভীর নির্জনতায় মগ্ন তাঁর একাকীত্ব। একদিকে সামাজিক উন্নতির ভাবনায়, দেশের মুক্তির চিন্তায় সামাজিক অসাম্যের প্রতিবাদে, এ জীবন লইয়া কি করিব এই ভাবনায় ব্যাকুল বঙ্কিমচন্দ্র। মানুষের এক ধরণের বেদনা থাকে যা তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ — বঙ্কিমচন্দ্রও আত্মমগ্নতার নির্জনতম স্থানে একাকী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি লিরিকধর্মী কবিচিত্ত ছিল, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে অথবা প্রবন্ধের মধ্যে তার পরিচয় আছে যেমন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের বারুণী পুষ্করিণীর দৃশ্যে, বসন্তের কোকিল প্রবন্ধের 'যে সুন্দর তাকেই ডাকি, যে ভাল তাকেই ডাকি।... ইত্যাদি অংশে অথবা 'একটি গীত' প্রবন্ধে — 'এই সংসারের শুভদৃষ্ট — কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ — চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য।" নিভৃত হৃদয়ের এই উন্মোচন ঘটেছে বলেই 'কমলাকান্তের দপ্তর' হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ আলাপ। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন — সাধারণ কথা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। "শুধু গদ্যসাহিত্য কেন, ইহার পূর্বে মত কাব্য-কবিতা লেখা হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াও কবিপুরুষের স্পর্শ আমরা এমন প্রত্যক্ষ ও গভীর করিয়া বেশী পাই নাই।"

'কমলাকান্তের দপ্তর' তথা 'একা—কে গায় ঐ' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশাভঙ্গের ও জীবন-সংকটের গীতিকাব্য। সমকালীন সমাজ ও পরিবেশের দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে যা পুষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা — যা সাধারণের যা সকলের তাই-ই এখানে ব্যজনায় পরিবেশিত হয়েছে। ফলে সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্র অতি সহজেই বর্তমান কালকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। উপন্যাসের বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে নয়, সংবেদনশীল মনের একান্ত গোপন থেকে তাঁর যন্ত্রণা উৎসারিতে হয়ে পাঠককে স্পর্শ করেছে।

১১.৮ সারাংশ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'একা—কে গায় ঐ' রচনাটি সম্পূর্ণভাবে একটি subjective রচনা। কোনো তত্ত্ব বা তথ্য এই রচনার বাহন হয়ে ওঠে নি। শিল্পসাধনা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একা। শিল্প ও সমালোচনার আদর্শ তাঁকে নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়েছে। সাধারণের থেকে বিচ্যুতি, পারিবিারক সংকট, শিল্পীর গভীর সংবেদনশীলতা তাঁকে 'একা' করে দিয়েছে। কমলাকান্তর জবানীতে তাঁর উপলব্ধি, একটি পথিকের গাওয়া সংগীত কমলাকান্তের মনে অতীতের সুখস্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে, যৌবনস্বপ্নের সম্মুখীন করেছে — তারপর কমলাকান্ত বুঝেছে, এ আনন্দ ক্ষণিকের। প্রৌঢ়ত্বে এসে 'আশা' নামক রঙিন কাচটি না থাকায় এবং সুখদ সামগ্রী প্রচুর অর্জিত হলেও ভোগের স্পৃহা না থাকায় তার মনে সুখ নেই। কমলাকান্ত একা — সে বিবাহ করেনি, তার প্রণয়ভাগীও কেউ নেই। তাই কমলাকান্তের উপদেশ, 'কেহ একা থাকিও না'। এই প্রবন্ধের তিনটি স্তরের প্রথমটিতে একাকীত্বের বেদনা, দ্বিতীয় স্তরে বেদনার কারণ ও তৃতীয় স্তরে মনুষ্যপ্রীতির মধ্যে একাকীত্বের অবসানের কথা বলা হয়েছে। 'প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী — ঈশ্বরই প্রীতি' — এই হল শেষ কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, এই প্রবন্ধের মূলে বিদ্যমান — তাকেই অসামান্য কাব্যিক ভাষায় ও উপলব্ধিতে এই রচনায় তিনি প্রকাশ করেছেন।

১১.৯ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন : নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। 'একা—কে গায় ওই' প্রবন্ধে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তা স্পষ্ট করুন।

২। 'একা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন তা আলোচনা করুন।

৩। কোন বাস্তব ঘটনা লেখককে দার্শনিকতায় নিয়ে গেছে 'একা—কে গায় ওই' প্রবন্ধ অনুসারে ব্যক্ত করুন।

৪। একা থাকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিবৃত করুন।

৫। যৌবন সম্পর্কে যে স্মৃতিচারণা 'একা—কে গায় ওই' প্রবন্ধ অনুসারেতা বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। কমলাকান্ত নিজেকে একা বলছে কেন?

২। 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না' — উক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে মানুষ কী বুঝতে পারে — ব্যাখ্যা করুন।

৪। কমলাকান্ত একবার শ্রুত ঐ সংগীত আর শুনতে চায় না কেন?

৫। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী' — এই উক্তিটির অর্থ পরিস্ফুট করুন।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

১। 'আমি এক—তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল'। —'আমি' কে?

২। প্রাবন্ধিকের মতে পাঠকের 'মনুষ্যজন্ম' কী কারণে 'বৃথা' হতে পারে?

৩। 'কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর।' —'তাহা' বলতে প্রাবন্ধিক এখানে কী নির্দেশ করেছেন?

১১.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বঙ্কিমচন্দ্র' — শ্রী সুবোধ সেনগুপ্ত

২। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩। 'বাংলা প্রবন্দ ও রচনারীতি' — মোহিতলাল মজুমদার

৪। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

৫। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' — সাহিত্য পরিষদ

৬। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — সম্পাদনা — ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়

৭। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' — ড. সুকুমার সেন

৮। 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১২ - কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পতঙ্গ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ প্রবন্ধের মূলপাঠ

১২.৪ মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার

১২.৫ বিশ্লেষণী পাঠ

১২.৬ সারাংশ

১২.৭ অনুশীলনী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

- কৌতুহলী পাঠক 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটি পাঠ করতে উৎসাহিত হবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতুকরস ও হিউমারের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- মানুষ পতঙ্গকে এক করে দেখার সঙ্গে লেখকের আত্মপ্রতিফলন খুঁজে পাবেন।

১২.২ প্রস্তাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' নানা ধরণের প্রবন্ধের সন্নিবেশ ঘটেছে। কোনও প্রবন্ধে সমাজচিন্তা, কোনও প্রবন্ধে স্বদেশচিন্তা, কোথাও রাজনীতি, কোথাও বা শুধু সাহিত্যিক উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। কমলাকান্তের মনোলোকের গভীর আকুতি যে রচনাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিষণ্ণতার প্রকাশ ঘটেছে। যে সব প্রবন্ধে তিনি চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা অনন্য। তবে, রচনা সাহিত্যের গুণের সম্যক্ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। 'পতঙ্গ' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের — শুধু ব্যক্তি জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন নয়, সমাজমনস্কতারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রবন্ধটি রূপকাশ্রয়ী কিন্তু এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মনোজগৎ আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। 'পতঙ্গ' 'কমলাকান্তের দপ্তরের' চতুর্থ প্রবন্ধ এটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। পরে তা 'দপ্তরে'র অন্তর্ভুক্ত হয়। হাল্‌কা চালে প্রবন্ধটি শুরু হলেও শেষ হয়েছে গভর তত্ত্বচিন্তা ও দার্শনিকতায়। সামান্য কৌতুকস্নিগ্ধ হাসের পরিচয় প্রবন্ধটিতে আছে। কমলাকান্ত এখানে অহিফেন—প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে জগতের চলিষ্ণুতার কারণ আবিষ্কার করেছে।

১২.৩ প্রবন্ধের মূলপাঠ

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন, —আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছে। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিা অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ বসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিয়লাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে'কালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারি দিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরতে পাব না?

দেখ, হিন্দুদের মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবাহয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতিরতুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—তাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে জগতে এমন কিছুই না—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ডাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পারে না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়ি যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ, "আন্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত", ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ, না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

১২.৪ মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার

নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলছে। কমলাকান্ত আফিং এর মাত্রা চড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। সেজের চারপাশে একটা পতঙ্গ ঘুরপাক খাচ্ছিল। আফিং এর ঝোঁকে কমলাকান্ত ভাবল সে কি পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পারে না? কমলাকান্ত তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হল এবং শুনল পতঙ্গ বলছে যে, সে আলোর সঙ্গে কথা বলছে। পতঙ্গ বলছে আগুনে পুড়ে মরার অধিকার 'হক' বা 'রাইট' তার আছে— সে হিন্দুর মেয়ে নয় — সহমরণ আইন তার জন্য নয়। পুড়ে মরার সুখে সে কেন বঞ্চিত হবে? এই বৈচিত্র্যশূন্য জগতে সে বাঁচতে চায় না। আগুনের চারিদিকে কাচের ডোমে ঢাকা — তাই তার বাসনাপূরণ হচ্ছে না। অগ্নির স্বরূপ কেউ জানে না, জানতে গেলে তাতে ঝাঁপ দিতে হয়। কাম্যবস্তুর স্বরূপ জানতে পারলে মানুষের আর সুখ থাকে না। আমরা কিছু জানি না, জানতে চাই — এটাই জগতের গতির কারণ।

নসীরামবাবু কমলাকান্তকে ডাকলেন — কমলাকান্তের মনে হল নসীরামবাবু একটি পতঙ্গ — তারপর তাঁর মনে হল মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। নিজের কামনাই তার কাছে বহ্নি। সকলেই চায় তার কামনা পূরণ করতে কিন্তু অদৃশ্য কাচে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে ফিরে আসে। সমস্ত কাব্যসাহিত্যে ও মানবজীবনে এই বহ্নিরই লীলা। কিন্তু তার স্বরূপ কেউ জানে না। 'তবু' সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া পিরি। 'আমরা পতঙ্গ না ত কি?'

১২.৫ বিশ্লেষণী পাঠ

কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের মদনভস্ম অংশের একটি উপমা — 'পতঙ্গবদ্‌বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' এই চিত্রকল্পটি থেকে 'পতঙ্গ' নামটি ব্যবহার করেছেন প্রাবন্ধিক। কমলাকান্তের দপ্তরের একটি দর্শনচিন্তা ও মনুষ্যজীবন বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ হল 'পতঙ্গ'। কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্য দিয়ে 'পতঙ্গ' শুরু হয়নি। সহজ সরল ভাষায় শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে গুরুতর আলোচনা ও দার্শনিকতায় প্রবেশ করেছেন। মানুষের জীবনের ভয়ঙ্কর অভীপ্সা তাকে কোন সর্বনাশা অগ্নির মধ্যে টেনে নিয়ে যায় তারই বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সমাজের পতঙ্গ বৃত্তি দিয়ে শুরু করলেও এর গভীরে মানুষের যে বেঁচে থাকার স্পৃহা তারই আর্তিকে তিনি দেখিয়েছেন। মানুষ কিছু ইচ্ছাপূরণের আশায় পাগলের মত ছুটি বেড়াচ্ছে — এর জন্য সে নিজের জীবনকেও বাজি রাখতে পারে। কিন্তু কাম্যবস্তু এত সহজে পাওয়া যায় না। আমাদের সংসার, পরিবার, শিক্ষা, রুচিবোধ, ঠিকঠাক চেষ্টার অভাব এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের কাম্যবস্তুর প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে না পারলে পদে পদে বাধা এসে আমাদের পথভ্রষ্ট করে। এগুলিই সেই কাচ যাতে মানুষ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে কিন্তু কাম্যবস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ শেষ হয় না বলে সে বার বার ফিরে ফিরে আলোর চারিদিকে পতঙ্গের মত কাম্যবস্তুর চার পাশে ঘুরে ঘুরে ফেরে — এখানেই পতঙ্গের সঙ্গে তার একাত্মতা।

'পতঙ্গ' প্রবন্ধের দুটি অংশ। প্রথম অংশে আফিমের প্রসাদে কমলাকান্ত পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পেরেছে এবং পতঙ্গের কামনার বিষয়টি জানতে পেরেছে। দ্বিতীয় অংশ কমলাকান্তের কাছে সব মানুষকেই পতঙ্গ বলে মনে হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে যে পরিহাসরস দিয়ে শুরু হয়েছিল, প্রবন্ধের শেষে তা হয়ে উঠেছে তত্ত্ব এবং দর্শনের

বাহন। যে কমলাকান্ত 'একা' প্রবন্ধে বলেছিলেন, সংসারে আমরা আবর্তিত হই মাত্র, 'আমার মন' প্রবন্ধে বলেছিলেন, বিদ্যা আমাদের গাঢ়তর অন্ধকারে নিয়ে যায়, পতঙ্গ প্রবন্ধে শেষ পর্যন্ত একই কথা বলেছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞান বা ধর্ম সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এই রহস্যময়তা এবং তজ্জনিত অনুসন্ধানই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্যজীবন, সমাজ প্রভৃতি চিন্তার পাশাপাশি সাহিত্যচিন্তারও পরিচয় আছে। মাত্র কয়েকটি বাক্যে তিনি সাহিত্যবিষয়ক কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি রূপ-বহ্নি, জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি ইত্যাদিতে যেন সহস্র সহস্র পতঙ্গের পুড়ে মরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে— "এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি।" বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি কাব্য-নাটকের ব্যাখ্যাও তিনি এই প্রবন্ধে করেছেন। তাঁর মতে "জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'। ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা'। রূপ বহ্নির 'রেমিও ও জুলিয়েত' ঈর্ষা-বহ্নির 'ওথেলো'। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে।" বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতকে মান-বহ্নির কাব্য কাব্য এবং বা রামায়ণকে স্নেহ-বহ্নির কাব্য বলেছেন। তাঁর শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে গভীর বোধ এবং জীবনবোধের বলিষ্ঠতায় প্রবন্ধটি উদ্ভাসিত। বহ্নির এই স্বরূপ কাব্যসাহিত্যে এবং জীবনে কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তা দেখিয়ে তিনি চলে গেছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং দার্শনিকতায়। তিনি বলছেন, "বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ, তেজ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে বিজ্ঞান হারি মানে, ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে।" কোনো মানুষ বা কোনো বিদ্যা জীবনের শেষ রহস্য উন্মোচন করতে পারে না — কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ এই রহস্যের মুখোমুখি হতে পারে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র পতঙ্গের অগ্নিবলয়ে ঝাঁপ দেওয়ার রূপকে মানবজীবনের এক বিশেষ তাৎপর্যকে লক্ষ্য করেছেন। চিরকালই মানুষ আগুনের দিকে ছুটে যাওয়াকে তার 'হক' বা 'রাইট' বলে মনে করছে। এ প্রসঙ্গে পতঙ্গ সেজবাতির উল্লেখ করে বলেছে, আগে পুড়ে মরা সহজ ছিল। এখন তাকে ডোমের ভিতরে ভরা হয়েছে, তার আত্মবিসর্জনের অভিপ্রায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অগ্নি বিশ্বধংসক্ষম — সে রূপ, সে বাসনা পোড়াতে সৃষ্ট হয়েছে। পতঙ্গও পুড়ে মরতেই চায় — এই বৈচিত্রশূন্য পৃথিবী তার কাম্য নয়। পতঙ্গের এই কামনা পূর্ণ হয়নি, তাকে ফিরে ফিরে ঘুরতে হয়েছে 'আবর্তনমাত্র' সার হয়েছে তার তথা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে। সংসার যেমন বহ্নিময় অর্থাৎ আকর্ষণময় তেমনি কাচময় অর্থাৎ বাধাময় — সাংসারিক দায়িত্ব, ইচ্ছাপূরণের জন্য যথার্থ যোগ্যতার অভাব, দৃঢ়সংকল্পের অভাব ইত্যাদিই হল কাচ। এই বাধা না থাকলে সংসার থাকত না। কামনা-বাসনা আমাদের জীবনের গতির কারণ-কামনার চরিতার্থতা ঘযলে কিছুই থাকে না। তাই বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই কামনাপূরণের লক্ষ্যে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করার কথা বলেছেন। কাব্য, ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন তিনি।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রূপক বা প্রতীকের আশ্রয়ে জীবনসমীক্ষা করেছেন। পতঙ্গ, আলো, কাচ এই তিনটি বস্তুকে তিনি জীবনের চালিকাশক্তি ও পরিণাম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র যে দার্শনিক প্রত্যয়ে স্থিত হয়েছেন তা হল, "বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে।" এই বস্তু অপরিজয়াত আছে বলেই আমাদের আবর্তন আমাদের জীবনের গতিময়তা। জীবন ও জগতের এই রহস্যময়তার চিত্র দেখিয়ে প্রাবন্ধিক শেষ করেছেন।

একান্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে প্রবন্ধটি রচিত। খেয়ালী কল্পনাবৃত্তির একটি অসামান্য শব্দচিত্র এখানে প্রস্ফুটিত। প্রবন্ধে উচ্চকিত হাস্যরস নেই কিন্তু একটি স্নিগ্ধ হাস্যধারা এটিকে আবৃত করে রেখেছে। এখানে মনুষ্যসমাজ আলোচ্য বিষয় হলেও সমাজসন্ধানীর বিশ্লেষণধর্মিতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম অনুভব ও ঈশ্বরের অনধিগম্যতা — যা 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধেও প্রকাশিত, "জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি সমান কথা, তুইও কিছু জানিস না আমিও জানি না, তোর ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে।" এখানে অপরিজ্ঞাত হলেও সবকিছুর অতীত সত্তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ও জানার আকাঙ্ক্ষা বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।

'পতঙ্গ' আবেগপ্রধান রচনা। লঘু, ভারমুক্ত হাল্‌কা মেঘের মত ভাবগুলি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাতায়াত করেছে। এখানে বাসনা,কাব্য, ঈশ্বর একীকৃত হয়ে আছে। মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা এই রচনায় সর্বত্র খুঁজে পাই। তর্কাতীতভাবে এই প্রবন্ধ কোনো ভার বহন করে না। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ভরা মানবজীবন ও তার চালিকাশক্তি এখানে সাহিত্যিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে — গদ্যের মধ্যে কাব্যের মাধুর্য সঞ্চরিত হয়েছে এখানে।

১২.৬ সারাংশ

'পতঙ্গ' মনুষ্যসমাজের অন্বেষণ ও হতাশার চিত্রকাব্য। মনুষ্যজীবনের মূল চালিকাশক্তি তার আবেগ। কামনাময় জীবন নিয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া তার নিয়তি। আফিমের প্রসাদে দিব্যকর্ণ ও দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত কমলাকান্তি সব মানুষকে পতঙ্গরূপে দেখতে পেয়েছে। সে বুঝেছে সব মানুষেরই এক একটি বহ্নি আছে — সবাই সেই বহ্নিতে পুড়ে মরতে চায়। বাসনার শেষ চরিতার্থতা সকলের জীবনে ঘটে না, যাঁদের ঘটে তাঁরা মহাপুরুষ। বাকিরা সংসাররূপ কাচে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে, সাধারণ জীবন যাপন করে, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণে বার বার কাম্যবস্তুর কাছে পতঙ্গের মত ঘুরে ঘুরে আসে। এই কাম্যবস্তুর স্বরূপ কেউ জানে না — জানলে মানুষের জীবনের প্রতি আকর্ষণ আর থাকে না। কিন্তু সে জানতে চায় বলেই সেই অপরিজ্ঞাত রহস্যময় বস্তুর আকর্ষণে ঘুরে ফিরে মরি। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র অনায়াস — দার্শনিকতায় পৌঁছে বলেছেন, ঈশ্বরও আমাদের কাছে এমনই রহস্যময় ও দুরধিগম্য। গভীর ভাবুকতা ও দর্শনসমৃদ্ধ এই প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোলোককে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সহজ ভাষা ও অভিব্যক্তি এই প্রবন্ধের অতিরিক্ত গুণ।

১২.৭ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। 'পতঙ্গ' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনুষ্যজীবন সম্পর্কে যে উপলব্ধি আছে — তা পরিস্ফুট করুন।

২। 'কাচ' না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত।' — কাচ কী? এটি কীভাবে সংসারকে রক্ষা করে, তা বিশদ করুন।

৩। পতঙ্গ প্রবন্ধ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর পরিচয় দিন।

৪। 'অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত' পদার্থ কী? আমরা কেন তার চারিদিকে ঘুরে মরি — আলোচনা করুন।

৫। 'সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে — সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে।' — এই বক্তব্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। পতঙ্গ নিজেকে হিঁদুর মেয়ের থেকে আলাদা করতে চায় কেন — স্পষ্ট করুন।

২। পতঙ্গের কাছে পৃথিবী কেমন, বুঝিয়ে বলুন।

৩। বহ্নিকে জগতের গতির কারণ বলা হয়েছে কেন?

৪। বহ্নির কাছে পতঙ্গ কী ভিক্ষা করেছে বুঝিয়ে বলুন।

৫। পতঙ্গের পক্ষে আগে বহ্নিতে পুড়ে মরা সহজ ছিল, এখন সহজ নয় কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।' —বক্তা কে? কার উদ্দেশে তার এই মন্তব্য?

২। পতঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীজাতির সাদৃশ্য কোথায়?

৩। 'সংসার বহ্নিময়'—কোন্ বহ্নির কথা বলা হয়েছে?

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বঙ্কিমচন্দ্র' — শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

২। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — মডার্ন বুক এজেন্সী প্রকাশিত

৪। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — সম্পাদনা ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়

একক - ১৩ ❑ কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিড়াল

গঠন

১৩.১ **উদ্দেশ্য**

১৩.২ **প্রস্তাবনা**

১৩.৩ **মূলপাঠ**

১৩.৪ **মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার**

১৩.৫ **বিশ্লেষণী পাঠ**

১৩.৬ **সারাংশ সংক্ষিপ্তসার**

১৩.৭ **অনুশীলনী**

১৩.৮ **গ্রন্থপঞ্জি**

১৩.১ উদ্দেশ্য

- এককটি পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।
- সাম্যবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে।
- বিশুদ্ধ নির্মল হাস্যরসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে জানা যাবে।
- ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে কীভাবে প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্যকে তীক্ষ্ণধার করে তুলেছেন তা বোঝা যাবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। উপন্যাসের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আসন ছেড়ে সাহিত্যের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে বেছে নিলেন প্রবন্ধের বৃহত্তর জগৎ — সাময়িক পত্রের কলেবর পূরণের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের রচনার সাহায্যে পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইলেন। বাঙালী পাঠকের শুধু জ্ঞানের ক্ষুধা নয়, রসপিপাসা চরিতার্থ করারও এক অপূর্ব প্রয়াস করলেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জীবন-দর্শন, পরাশ্রয়ী শিক্ষা-সংস্কৃতিরগ্লানি, কখনো কৌতুক — হাস্য, কখনো ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতের আশ্রয়ে পরিস্ফুট করে তুললেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁর বিচিত্রসঞ্চারী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়বাহী।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সমাজসচেতন শিল্পী। অন্তরের সুগভীর দেশপ্রেম থেকেই তাঁর এই সমাজচেতনা জন্ম নিয়েছিল। তাঁর এই অনুভব ভাবাবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি বরং প্রখর যুক্তিশীল মানসিকতার সাহায্যে তিনি সমাজের মৌলিক প্রশ্নগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন — অসাধারণ প্রজ্ঞার সাহায্যে সমাজের মূলীভূত সমস্যাগুলির সমাধানের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। 'বিড়াল' 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

এটির সঙ্গে 'সাম্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধগুলিতে যুক্তিশীল মন দিয়ে তিনি যা বিশ্লেষণ করেছেন, 'বিড়াল' প্রবন্ধে তা হয়ে উঠেছে কোতুকস্নিগ্ধ এবং কখনো ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণধার। ইংরাজী সাহিত্যে যে রসটি 'উইট' এবং 'হিউমার' বঙ্কিমচন্দ্রই তাকে বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করেন। এ বিষয়ে তিনি এডিসন এবং স্টীলের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। এডিসন স্পেকটেটর (Spectator) পত্রিকায় এই জাতীয় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ সৃষ্টি করেন। স্যার রজার কভারলি নামক একটি গ্রাম্য লোকের চরিত্র অবলম্বন করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিকারগ্রস্ত মানুষের, সেই সমাজের ও তাদের সাহিত্যরুচির সমালোচনা করেছেন। রচনাগুলি ব্যঙ্গরসে পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এডিসনের প্রভাব আছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন — বিশেষতঃ ব্যঙ্গের আঘাতে সমাজকে সচেতন করতে চাওয়ার দিক থেকে এডিসনের কথা এসেই যায়, আবার কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর 'Familiar Essays' এর প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। আবার ইংরেজ লেখন De Quincey র 'Conferson of an English Opium Eater'-এর প্রভাবের কথা অনেকেই বলেছেন। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবাহাল ছিলেন এবং সেইসব রচনার কিছু প্রভাব তাঁর সাহিত্যে থাকলেও প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয় মননের দ্যুতিতে উজ্জ্বল।

১৩.৩ মূলপাঠ

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জারা; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা

করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য। ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরিকরেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহে না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।

যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অরিত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইতে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হসবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পূনর্বার আসিও এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

১৩.৪ মূলপাঠের সংক্ষিপ্তসার

অহিফেন সেবন করে কমলাকান্ত শয়নগৃহে চার পায়ীর উপরে বসে হুঁকা হাতে ঝিমোচ্ছিল এবং ভাবছিল সে নেপোলিয়ান হলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জিততে পারত কিনা। একটি ক্ষুদ্র 'মেও' শব্দে তার চট্‌কা ভাঙল। সে প্রথমে ভাবল ডিউক অব ওয়েলিংটন তার কাছে আফিম চাইতে এসেছেন — তারপর দেখল একটি বিড়াল কমলাকান্তের আহারে জন্য রাখা দুধ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ডাকছে 'মেও'। কমলাকান্ত ভাবল বিড়াল তার কাছে দুধ চুরি করে খাওয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছে। কমলাকান্তভাবল 'দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন।' কাজেই দুধে কমলাকান্তের যে অধিকার, একই অধিকার বিড়ালেরও। তবু সামাজিক প্রথামত কমলাকান্ত বিড়ালকে লাঠি নিয়ে মারতে গেল। এইবার দিব্যকর্ণপ্রাপ্ত কমলাকান্ত বুঝল, বিড়ালকী বলতে চায়। তার মনে হল সব ভোগ্য দ্রব্য একশ্রেণীর লোক ভোগ করবে এবং অন্য শ্রেণীর লোক তা থেকে বঞ্চিত হবে এটা ঠিক নয় — তাদেরও সমান অধিকার,সব ভোগ করার — একথাই বিড়াল বলছে। আরও বলছে দুধ খেয়ে সে কমলাকান্তকে ধর্মসঞ্চয়ে সাহায্য করেছে। সাধ করেসে দুধ চুরি করে খায়নি, খেতে পেলে কেউ চুরি করে না। চোর দোষী, কিন্তু কৃপণ ধনী তার চেয়ে শতগুণে দোষী। ধনীরা উদ্বৃত্ত আহার্য বা বস্তু ফেলে দেয় কিন্তু গরীবকে দেয় না। মান্য ব্যক্তিদের জন্য তাদের পরোপকার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে কেন না, 'তলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ'। ক্ষুধার জ্বালায় কেউ চুরি করে খেলে সে দোষী সাব্যস্ত হয় — তার দণ্ডবিধান করা হয়। এই সমাজে একজন মানুষ পাঁচশো জন দরিদ্রকে বঞ্চিত করে ধনী হয়ে ওঠে অথচ খাদ্যে বা ভোগ্যবস্তুতে যে দরিদ্রেরও সমান অধিকার আছে, তা কেউ স্বীকার করে না। কিন্তু 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' এবার কমলাকান্তের মনে হল বিড়ালের কথাগুলি 'ভারি সোশিয়ালিস্টিক।' 'সমাজবিশৃঙ্খলার মূল।' ধনীর ধনসঞ্চয়ের পক্ষে তার যুক্তি হল, ধন সঞ্চয় না করলে সমাজের ধনবৃদ্ধি হবে না।' বিড়ালের বক্তব্য, দরিদ্র যদি খেতে না পায় তবে সমাজের ধনবৃদ্ধিতে তার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

বিড়াল সুতার্কিত, বিজ্ঞ — তাকে কিছুই বোঝানো গেল না। এই বিড়ালসুবিচারকও। কমলাকান্ত যখন ধনীদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছে তখন বিড়ালের বক্তব্য হল, চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য কিন্তু যিনি দণ্ড দেবেন, দণ্ড দেলয়ার আগে তাঁকে তিনদিন উপবাস করতে হবে, তাঁর যদি চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবে তিনি দণ্ড দেবেন।

কমলাকান্ত পরাস্ত হল। বিজ্ঞ লোকের মত অনুসরণ করে পরাস্ত হয়ে উপদেদানের আশ্রয় গ্রহণল করল। কমলাকান্ত বলল, এসব কথা নীতিবিরুদ্ধ। এর আন্দোলনেও পাপ আছে এবং প্রয়োজনে সে বিড়ালকে কিছু আফিম দিতে পারে। মার্জ্জার হাঁড়ি খাওয়ার বিষয়টি ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাবে বলে বিদায় নিল। কমলাকান্ত একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভেবে আনন্দলাভ করল।

১৩.৫ বিশ্লেষণী পাঠ

'বিড়াল' প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের ত্রয়োদশ সংখ্যক রচনা। প্রবন্ধটি চৈত্র সংখ্যা ১২৮১ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ — এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ সুরে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'সাম্য' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন সে সময়ে বর্তমান সম-ভোগাবদ (Communism) এ দেশে প্রচারিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র কার্ল মার্কস্, এঙ্গেলস্ প্রমুখ চিন্তানায়কদের রচনার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন না কিন্তু তিনি অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী লেখকদের রচনা গড়েছিলেন। বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের সময় রুণো, ভল্‌টেয়ার প্রমুখ সমাজস্রষ্টারা মানুষের সমান অধিকারবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে নুতন আদর্শ প্রচার করেন, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক চিন্তাশীল পুরুষদের মতই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের কৃষকদের অপরিসীম দুরবস্থা দেখে তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধগ্রন্থ ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ রচনা করেন। তবে, 'সাম্য' গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হলেও তিনি এর দ্বিতীয় মুদ্রণের ব্যবস্থা করেননি। সম্ভবতঃ সাম্যবাদ তাঁর সময়ে এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী হবে মনে করে তিনি এই গ্রন্থের প্রচারে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেননি।

'বিড়াল' নামক সংখ্যাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের আদর্শগত দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর মুল বক্তব্য এই যে, এ সংসারের ভোগ্য দ্রব্যে সকলের সমান অধিকার। এই পৃথিবীতে অনাহারে মারা যাওয়ার জন্য কারো জন্ম হয়নি। যদি যা কিছু উৎকৃষ্ট ভোগ্য এক বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারভুক্ত হয় তবে সেটা যেমন নীতিবিরুদ্ধ তেমনই প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। ক্ষুধা সকলেরই আছে, সকলেরই খাদ্য চাই, অথচ সকলে খাদ্য পায় না — এর কারণ ধনীর ধনবৈষম্য এবং শ্রেণী বিদ্বেষ। ধনের অসম-বণ্টনের ফলে দরিদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি হতে বাধ্য। একে তো ধন-বৈষম্যই শ্রেণী-বৈষম্য, তার উপর ধন-শক্তির জোরে সমস্ত ভোগ্যবস্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত হওয়ায় অন্য শ্রেণী খাদ্যাভাবে পীড়িত হতে বাধ্য। যদি সুবিধাভোগী সম্প্রদায় নিজের উদ্বৃত্ত খাদ্য বা অর্থ কিছুটা দিয়ে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে, তাহলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। কিন্তু কার্যত পরের দুঃখে এরা কাতর হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে এইভাবে ধনী ও দরিদ্রের ভয়ঙ্কর শ্রেণী-বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। 'সাম্য' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যই বঙ্কিমচন্দ্র লঘুসুরে 'বিড়াল' প্রবন্ধে পরিবেশন করেছেন। ড. অধীর দে বলেছেন 'কূট তর্কবহুল বিচারের মীমাংসা হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার অনন্য সাধারণ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। 'বিড়াল' নামক রচনা হতে তা প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপকাত্মক রচনাচিত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের বৈশিষ্ট্য যুক্তিতর্ক সহকারে বিবৃত করেছেন। চতুষ্পদ জন্তু বিড়াল সাম্যবাদী সমাজের প্রতিনিধি ও উকিল এবং কমলাকান্ত পুঁজিবাদী ধনির সম্প্রদায়ের পক্ষে, বিশুদ্ধ একটি রাষ্ট্রনীতিমূলক বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব হতো, কিন্তু এখানে নিছক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে মূল উদ্দেশ্য প্রকাশের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। রাজনৈতিক জটিল মতবাদের অন্তঃগূঢ় তত্ত্ব শ্লেষাত্মক রেখাচিত্রের আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র দুগ্ধাপহাররক বিড়াল ও আফিমসেবী কমলাকান্তের সরস ইঙ্গিতপূর্ণ কথোপকথনের

মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। ফলে বুদ্ধিগ্রাহ্য রাষ্ট্রীয় মতবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। দরিদ্র সর্বহারা ব্যক্তিদের ব্যথা-বেদনা এবং চুরি প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির মূল উৎস সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনামধ্যে যে বাস্তব সত্যের আলোকপাত করেছেন, তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি তাঁর কৌতুকমিশ্র বিদগ্ধ মনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে।"

নির্জল দুগ্ধপান — সুখে সুখী বিড়াল বলেচে 'মেও'। অহিফেন সেবন জনিত আলস্যে কমলাকান্ত ভেবেছে, এটি 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' (এঁর প্রকৃত নাম আর্থার ওফেলেসলি এটি সম্রাট প্রদত্ত উপাধি — ইনি অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করেন।) বিড়ালের কমলাকান্ত যখন দেখল বিড়াল তার দুধ খেয়ে ফেলেছে, তখন সামাজক নিয়ম অনুযায়ী লাঠি হাতে বেড়ালকে তাড়া করল। বিড়াল বিচলিত হল না। কমলাকান্ত তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে শুনল বিড়াল দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে বলছে, 'তোমাদের ক্ষুৎপপাসা আছে — আমাদের কি নাই? ...পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। ...আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। ... দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া ওঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপেণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?' বিড়াল আরও বলল দরিদ্র হওয়া লজ্জার বিষয় নয়। কিন্তু পেট ভরা থাকলেও দরিদ্রকে কেউ সাহায্য করে না। মান্য লোকেদের পেট আরও ভরানোর চেষ্টা করা হয় কারণ, 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতর রোগ।' অবশ্য গৃহমার্জার বা বড়লোকদের তোষামদকারী ব্যক্তি অনেক সুবিধা পায়। 'চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই?' 'বিড়াল' প্রবন্ধটির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এমন মূল্যবান সমাজ-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ। কমলাকান্তের যুক্তি, বিড়ালের এইরকম সোশিয়ালিস্টিক কথাবার্তা সমস্ত সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি ধনীর ধনবৃদ্ধি নাহয়, তবে সমাজের ধনবৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি হয় না। অবশ্য এই দরিদ্র বিড়ালেরতাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সুবিচারক, সুতার্কিক বিড়ালের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হয়ে কমলাকান্ত তাকে উপদেশ দিতে শুরু করল (কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এমনই পরামর্শ দিয়ে থাকেন)। কমলাকান্তের উপদেশ, এসব অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, এর আন্দোলনেও পাপ আছে। এই কৌতুকপূর্ণ উপদেশে বিড়াল কতটা উপকৃত তা বোঝা গেল না কিন্তু কমলাকান্ত একটি পতিত আত্মাকে উদ্ধার করার তৃপ্তি অনুভব করলেন।

এ যুগের যে সামাজিক-অর্থনৈতিক (Socio economic) সমস্যা, তারই উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে অথবা সাম্যবাদী আদর্শের প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরার চেষ্টায় 'বিড়াল' প্রবন্ধটি পরিকল্পিত। বাস্তব জীবনের গভীর সমস্যার এই দিকটি যে কীভাবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র একটি মুল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল তা বিস্ময়জনক। রস-রচনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্রায়ন একটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। দপ্তর রচনার মৌল প্রকৃতির সঙ্গে এই গুরুগম্ভীর বিষয়টি মেলে না কিন্তু 'বিড়াল' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের রস-সন্দর্ভ রচনায়, সর্বোচ্চ কলানৈপুণ্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

বিড়াল এবং কমলাকান্তের তর্কবিতর্কে সমাজের মূল সমস্যা — সমবণ্টনের ভাব সুচিত্রিত। বস্তুতঃ সমাজের সব মানুষ সর্বতোভাবে সমান হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ও ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে আমাদের একটি ক্ষুদ্র বস্ত্র দিয়ে সারা পৃথিবীকেঢাকা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার কথা বলেছেন। 'সাম্য'ও এমনই অলীক। হাশেম শেখ ও রামা কৈবর্ত সমানভাবে শ্রম করবে এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক, খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থান পারে না— প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই অসাম্য আমরা সমভাবেই পালন করে আসছি। বঙ্কিমচন্দ্র খোলাখুলিভাবে সমস্যাটি আমাদের গোচর করার চেষ্টা করেছেন। এই রসসন্দর্ভে কখনো হিউমার কখনো স্যাটায়ারের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলা

হয়েছে। এত গুরুগম্ভীর বিষয়ককে এত সহজে উপভোগ্য করে উপস্থাপনা করা যায় তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

এই প্রবন্ধে সাম্যবাদী প্রাবন্ধিক ধনতন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষের আবরণে এই আক্রমণের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে ও সমালোচক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র যে কতখানি সফল —'বিড়াল' রচনাটি তার সাক্ষ্য দান করে। এটি একটি রূপকধর্মী রচনা। রচনাটির স্বরূপ নিবন্ধজাতীয় হলেও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে সরস করবার জন্য প্রাবন্ধিক এখানে নাটকীয়ভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি, চিন্তাসমন্বিত বিশুদ্ধ প্রবন্ধের আবেদন বুদ্ধির কাছে — সাধারণ পাঠকের কাছে এ ধরনের রচনাগুলির উপভোগ্যতা কম। তাই সাধারণের বোধম্য ও উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিনির্ভর সাম্যবাদের মূল সূত্রটিকে রূপকের আবরণে আবৃত করেছেন। অন্তর্গূঢ় কৌতুক হাস্য ও ঈষৎ ব্যঙ্গ সহকারে পরিবেশিত এই প্রবন্ধটি আমাদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক সাম্যবাদের গোড়ার কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, হাল্‌কা সুরে গম্ভীর কথা শোনাবার ক্ষেত্রে ত্রাং সাধারণ কথাকে অসামান্য করে তুলতে তিনি যে কতখানি সফল 'বিড়াল' প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। সাম্যবাদের মত জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণে না গিয়ে সমাজব্যবস্থার এই গভীর অসাম্যকে তিনি পরিষ্কার করে দেখাতে চেয়েছেন। নেশাখোর কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথোপকথন আমাদের নাট্যরস, গল্পরস ও হাস্যরসের সন্ধান দিয়েছে। যে 'শুভ্র সংযত নির্মল' হাস্যরসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র তার পূর্ণ পরিচয় আমরা 'বিড়াল' প্রবন্ধে পাই। এটি প্রশ্ন উঠতে পারে, দানের মধ্য দিয়ে বা ভিক্ষার মধ্য দিয়ে দারিদ্র সমাজের উন্নতি সত্যিই কী সম্ভব? বিড়াল উদ্বৃত্ত অংশ ভিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছে কিন্তু ভিক্ষায় মানুষের প্রয়োজন যেটা বা তার মানসিক বিকাশও সম্ভব নয়। কাজেই সমান অধিকার লাভের প্রশ্নটি থেকেই যায়। এই প্রশ্নের গভীরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেননি।

এই প্রবন্ধটির সঙ্গে সী হান্ট রচিত 'The cat by the Fire' নামক প্রবন্ধের মিল অনেকে লক্ষ্য করেছেন। কমলাকান্ত আফিংখোর, অকৃতদার ব্রাহ্মণ, আফিংএর ঝোঁকে সে দপ্তর রচনা করেছে। বেশির ভাগ রচনাই জাগ্রত ও স্বপ্নজগতের মাধ্যমে পরিবেশিত। আবার 'Confession of an English Opeum Eater' এর কথা ধরেও বলা যায় এদের প্রভাব বা ছায়া যা-ই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যাক না কেন, প্রাবন্ধিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতা বা অনন্যতার তাতে কিছুমাত্র হানি হয় না। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসাবে তাঁর অবস্থান এখনও সর্বজনস্বীকৃত।

১৩.৬ সারাংশ

ক্ষুধার্ত জাতির প্রতিভূ বিড়ালের কাছে কমলাকান্ত তর্কযুদ্ধে হেরে গেছে এবং উপদেশের আশ্রয় নিয়ে বলেছে, এগুলি নীতিবিরুদ্ধ কথা এর আলোচনাতেও পাপ আছে। এভাবেই ধনতন্ত্রের প্রতিভূরা কোনো নিরুমের পরোয়া না করে সমাজের বৃহত্তর একটি শ্রেণকে বঞ্চিত করে আসছে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের সমর্থনে এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কৌতুকের কশাঘাত করে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন। যদিও প্রশ্নটির গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি এবং এই অসংখ্যের প্রকৃত সমাধান কী হতে পারে তার পথনির্দেশও এই রচনায় নেই। তবু ধনতন্ত্রের অনিবার্য কুফল ও শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। 'সাম্য' বা 'বঙ্গদেশের কৃষক রচনায় যুক্তিপূর্ণ গদ্যে তিনি যা বলেছেন 'বিড়াল' প্রবন্ধে তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ে আরও তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠেছে। হাল্‌কা চাল, নাট্যধর্মী কথোপকথন,

গল্পরস, কৌতুক ও ব্যঙ্গের সমাহার এবং পদে পদে অসামান্য প্রৌঢ় উক্তি প্রবন্ধটিতে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রকৃত রস-রচনার সৌন্দর্য ও হার্দ্য অনুভব 'বিড়াল' প্রবন্ধটির কাছে আমাদের পরম প্রাপ্তি।

১৩.৭ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। 'বিড়াল' প্রবন্ধ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার পরিচয় দিন।

২। সাম্যবাদ সম্পর্কে 'বিড়াল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে স্পষ্ট করুন।

৩। 'বিড়াল' প্রবন্ধে কাহিনী ও নাট্যরস বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে কীভাবে একত্রিত হয়েছে বিবৃত করুন।

৪। সমাজের কঠিন সত্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার পরিচয় দিন।

৫। শ্রেণীবৈষম্যের পরিচয় ও তার সমাধানের পথ বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, তা বিবৃত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রথমে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী ভেবেছিল — ব্যক্তিটির পরিচয় কী ছিল? — স্পষ্ট করুন।

২। বিড়াল তার চুরি করার পক্ষে কী কী যুক্তি দিয়েছে তা বলুন।

৩। ধনতন্ত্রের পক্ষে কমলাকান্ত কী যুক্তি দিয়েছে, তা বিবৃত করুন।

৪। 'বিড়াল' প্রবন্ধে যে ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের যুগপৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত দিন।

৫। বিড়াল কেন বলেছে যে, চোরের চেয়ে কৃপণ ধনী শতগুণে দোষী, তা স্পষ্ট করুন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে...' —কে কী দেখলেন?

২। চুরির মূলে কে থাকে?

৩। 'দুধ আমার বাপেরও নয়।' —বক্তা কে?

১৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বঙ্কিমচন্দ্র' — শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত

২। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৩। 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা' — ড. অধীর কুমার দে

৪। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — মডার্ন বুক এজেন্সি প্রকাশিতটট

৫। 'কমলাকান্তের দপ্তর' — সম্পাদনা ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়

একক - ১৪ ❑ লাইব্রেরী : বিচিত্র প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ লেখক পরিচিতি

১৪.৪ মূলপাঠ

১৪.৫ মূলপাঠের সারসংক্ষেপ

১৪.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

১৪.৭ সারাংশ

১৪.৮ অনুশীলনী

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

- রবীন্দ্রনাথের রম্যরচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে।
- রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাবে।
- কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচিতির বাইরে অন্য রবীন্দ্রনাথকে চেনা যাবে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। তাঁর গদ্যরচনা কাব্যরচনার পরিমাণ থেকে কম নয়, বরং বেশি। কাব্যরচনা তো বটেই, গল্প, উপন্যাস, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ — সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য সমালোচনা, আত্মজীবনী, ডায়েরি, চিঠিপত্র, এমনকি বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদিও তাঁর রচনার বিষয়ীভূত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্য তাঁর এই দিকগলিকে ম্লান করেনি তবে খানিকটা একপেশে করে রেখেছে তা মানতেই হবে। 'রচনা সাহিত্য' বলতে যা বোঝায় তার দুর্লভ স্রষ্টাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন। 'আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা, নাটক-উপন্যাসেই দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি শুধু তাহাই নহে, — রচনাও তিনি এত লিখিয়াছেন, তাহার এত বৈচিত্র্য যে এক তাঁহার রচনা-সাহিত্যেরক্ষেত্রেই দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)।

রবীন্দ্রনাথের রচনাকে কেটে ছেঁটে, বিশ্লেষণ করে দেখানো সহজ নয়। রূপবন্ধের দিক থেকে এবং ভাবের ঐশ্বর্যে তা এতই সমৃদ্ধ, তা থেকে বেছে রত্ন আহরণ করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। রবীন্দ্রনাথের গদ্যলেখার মধ্যে নিবন্ধ আছে, ক্ষুদ্র রচনাও আছে — এর মধ্যে আবার ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, রাজনীতি — কোনো আলোচনাই বাদ পড়েনি। সমকালীন সময়ে তিনি আধুনিক থেকে অত্যাধুনিকতাই রবীন্দ্রবিরোধ শুরু হয় রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের সব রচনাই সাহিত্যগুণমণ্ডিত তবে একেবারে আত্মনিষ্ঠ যে রচনাগুলি তা একটু বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সমাজ, দেশ সম্পর্কিত রচনাগুলিকে

আমরা খাঁটি রচনা-সাহিত্য বলতে পারি না ঠিকই তবে, রচনাকৌশলে পল্লীসমাজ বা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু বক্তব্যই প্রকাশ করেনি তাকে যতটা সুন্দর করে প্রাবন্ধিক প্রকাশ করেছেন তাতে তা অনায়াসেই সাহিত্যগুণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আসলে সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলিই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার উপাদান। গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, খুঁটিনাটি বস্তুও তাঁর সৌন্দর্য-দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাকে আমরা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ বলব এবং কোন রচনাকে খাঁটি রস-সন্দর্ভ তা নিয়ে আমাদের সবসময়ই দ্বিধা থাকে কারণ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনার সময়েও শব্দচিত্র, অলংকারের সমাবেশ, ভাবনার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ এত অনায়াসে এসে পড়ে যে, মূলকথা খুঁজে বার করার চেয়ে তার সৌন্দর্যে আমরা আবিষ্ট হয়ে পড়ি। আমাদের মন প্রসন্নতায় ভরে যায়। 'এ খুশীটি একটি বিমিশ্র খুশী। কোথায় সে যে কতটুকু বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রসাদ-জনিত হ্লাদবৃত্তি — আর কোথায় যে সে কবিহৃদয়ের সহিত পাঠক হৃদয়ের সংবাদজনিত সন্তোষ তাহা নির্ণয় করা শক্ত।'

১৪.৩ লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ৭ই মে, (২৫শে বৈশাখ) ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১৮৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় — বিষয় ছিল, তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা। ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকায় তাঁর 'ভিখারিনী' নামে একটি বড়গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর ভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত মোট ছ-টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রবন্ধ, এরপর ১২৮৫ সালে তাঁর আরও পাঁচটি প্রবন্ধ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলি তাঁর প্রথম পর্বের গদ্যরচনা। গল্প-উপন্যাস এবং সমালোচনা এই উভয়বিধ রচনা নিয়েই গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশি বছরবয়স পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে তিনি রচনা করে গেছেন, কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, ডায়েরি প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি।

শেষ বয়সে এরসঙ্গে যোগ হয়েছিল ছবি আঁকা। ইংরাজী ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে গীতাঞ্জলি এবং অন্য কিছু কাব্য গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের (Song Offerings) জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন।

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম কবিখ্যাতির আড়ালে তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা অনেক পরিমাণেই আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু তুল্যমূল্য বিচারে তিনি যদি শুধু গদ্যরচনাই করতেন তাহলেও তাঁর খ্যাতি এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হত না। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' প্রবন্ধ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে তিনি গদ্যরচনা করে গেছেন। এইসব প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন, যুক্তিনিষ্ঠা ও সর্বোপরি কবিসত্তার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দরের মত যুক্তিনিষ্ঠা এবং বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠতা হয়তো রবীন্দ্রনাথের ছিল না কিন্তু যে ঐশ্বর্য, শিল্পীসত্তার যে গভীর প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধের ভিতরে আছে এবং বাহ্য অলংকারে তা কীভাবে ভূষিত হয়েছে তা কোনো ব্যাখ্যার দ্বারাই প্রকাশ করা যায় না। তাঁর গদ্যরচনা স্বয়ং সম্পূর্ণ, কাব্যরচনার পরিপূরক বা সম্পূরক নয়, সমান্তরাল রেখায় প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের সব গদ্যরচনাই সাধারণভাবে সাহিত্য অর্থাৎ রচনাসাহিত্য। তবু যুক্তি, তথ্য ও শিল্পগুণের মাত্রাভেদে তাঁর রচনাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখা যায়। প্রথম ভাগটি রচনাশিল্প ও দ্বিতীয় ভাগটি নিবন্ধ।

যে লেখাগুলিতে ব্যক্তিগত আবেগই প্রধান, তা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং যাতে বস্তু ও তথ্যনিষ্ঠা প্রধান, ভাষায় যুক্তি ও ঋজুতা আছে তা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

আমরা রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-জাতীয় রচনার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি না। তাঁর আত্মগত প্রবন্ধসমূহকে বিষয় অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা যায়।

(ক) ভ্রমণ বিষয়ক : (১) য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), (২) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি (১৮৯১-১৮৯৩), (৩) জাপানযাত্রী (১৯১৯), (৪) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), (৫) পথের সঞ্চয় (১৯৩৯), (৬) যাত্রী (১৯৩৬), (৭) জাপানে ও পারস্যে (১৯৩৬)

(খ) পত্র সাহিত্য : (১) ছিন্নপ, (২) পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮), (৩) ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং আরও বহু চিঠিপত্রের সংকলন।

(গ) ব্যক্তিগত রচনা : (১) পঞ্চভূত (১৮৯৭), (২) বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), লিপিকা।

(ঘ) জীবনচরিত : (১) জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)

১৪.৪ মূলপাঠ

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনা পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রাপ্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি—চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজে লিখিব। সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালিরনাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকগণকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়েছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব।

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

পৌষ ১২৯২

১৪.৫ মূলপাঠের সারসংক্ষেপ

মহাসমুদ্রের কল্লোল শব্দ যদি না থাকত, সেই নিস্তব্ধ, শান্ত কল্লোলের সঙ্গে লাইব্রেরীর তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লাইব্রেরীর মধ্যে মানুষের ভাষা, ভাবনা, অমর আলোক, কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে যেন কারাগারের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। হিমালয়ের মাথার উপরবন্দী বরফের মত মানবহৃদয়ের বন্যা কঠিন বরফের মত স্থির হয়ে আছে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের আশা, আনন্দ, আকাশের দৈববাণীকে মানুষ কাগজের মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছে। একটি বই সাঁকোর মত অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

একটি লাইব্রেরী আমাদের সামনে অন্ত পথ খুলে দিয়েছে। 'আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি।' আমরা যে পথে ইচ্ছা, সেই পথে যেতে পারি। এখানে বর্তমান ও অতীতের মানুষের হৃদয় একই সঙ্গে বাস করছে। বাদ, প্রতিবাদ, সংশয়, বিশ্বাস সবই এই গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে রয়েছে। লাইব্রেরী যেন তার কাছে আলোকের জন্মসংগীত শোনার জন্য উদারভাবে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। মহাপুরুষদের বাণী যুগ যুগ ধরে চিরকাল এখানে সঞ্চিত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এই যে, লাইব্রেরীর এই বিপুল সঞ্চয়ের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রান্ত থেকে কিছুই উঠে আসছ না, কেবল আমরাই নিস্তব্ধ। 'মানবসমাজকে কি আমাদের কোনো সংবাদ দিবার নাই?' — এটিই তাঁর প্রশ্ন। আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত এই দেশ স্তব্ধ। আমাদের অনন্ত নীলাকাশ ও নক্ষত্রালিপিও স্তব্ধ। —কেবল কয়েকটি চটি

চটি সংবাদপত্রের মধ্যে আমাদের জ্ঞানপিপাসা স্তিমিত হয়ে আছে। আমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে আমরা শুধু ক্ষুদ্রতর করে তুলছি, সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদে আমাদের দিন কাটছে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান বাঙালি একবার তার আপন ভাষায় কথা বলুক, যা বিশ্বসংগীতের সঙ্গে মিশে মধুরতর হয়ে উঠবে।

১৪.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে নিরন্তর সৃষ্টি করেছেন, বলাই যায় এটি তাঁর জীবনের ধর্ম — এক্ষেত্রে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সমার্থক। যে স্রষ্টার মৌল পরিচয় কবিত্বধর্ম, সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কেও অবলম্বন করেও যে তা মূত হয়ে উঠতে পারে, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্যরচনা তার প্রমাণ। লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার মনুষ্যজীবনে জ্ঞান অর্জনের একটি অবলম্বন। তাকে যে এমন একটাজীবন্ত সত্তায় পরিণত করা যায় তা 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধটি পাঠ এবং অনুধাবন না করলে বোঝা যায় না। 'বিচিত্র প্রবন্ধের' অন্তর্গত এই প্রবন্ধটি একটু অন্যরকম হলেও নিজ বৈশিষ্ট্যে, অসামান্য।

প্রথমেই 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' — ব্যঞ্জনা দিচ্ছে মানুষের তরঙ্গায়িত ভাব-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের — যা শত সহস্র বছর ধরে মানবচিত্তকে অধিকার করে আছে। প্রাবন্ধিক বলছেন, এই হৃদয়াবেগকে অক্ষরের বন্ধনে, শব্দের বন্ধনে বাঁধলে সে ঘুমিয়ে পড়া শিশুর মতন চুপ করে থাকতে পারে। লাইব্রেরী সেই ঘুমিয়ে পড়া শব্দকল্লোল সেই ভাব উচ্ছ্বাস যা শত শত বৎসর মানুষের হৃদয়াবেগকে ভাবনার তরঙ্গকে বহন করে চুপ করে আছে। স্পষ্টতঃই একটি চিত্রকল্প যা উপমার হাত ধরে লাইব্রেরীতে রাখা শত শত পুস্তকের ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই কালো অক্ষরগুলি যদি মুক্তি পায়, হিমালয়ের বরফ গলে গেলে যেভাবে বন্যা নেমে আসতে পারে, ভাবনার প্লাবন, সহস্র বছরের ভাবের প্লাবন সেইভাবে নেমে বন্যার মত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বক্তব্যই উপমা, উপমাই বক্তব্য। লাইব্রেরীর মধ্যেকার চিন্তার প্লাবনকে তিনি মুক্ত দেখতে চান, যে কারণে তাদের সৃষ্টি — মানব হৃদয়কে প্লাবিত করা সেই রূপেই লাইব্রেরী সকলকে প্লাবিত করে দিক এই তাঁর ইচ্ছা। যে অভীত বর্তমানে কাগজের, অক্ষরের বন্ধনে বন্দী, তাকে সচল প্রাণপ্রবাহের মধ্যে অর্থাৎ মানবহৃদয়ের মধ্যে প্রাবন্ধিক মুক্ত দেখতে চান।

লাইব্রেরী যে জ্ঞানের, যে বিস্ময়ের সম্ভার আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে তা পাওয়ার জন্য আমাদের সামনে অনেক পথ খোলা — "লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপর দাঁড়াইয়া আছি।" জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, দর্শন, কলা, রাজনীতি, অর্থনীতি — যে কোনো পথই আমরা বেছে নিতে পারি, কখনো উঠতে পারি পর্বতের অনন্ত শিখরে কখনো নামতে পারি মানবহৃদয়ের গভীর রহস্যে। যেকোনো রাজ্যে 'হারিয়ে যাওয়ার মানা' আমাদের নেই। সেই স্বাধীনতা, জ্ঞানের বিপুল আয়োজন 'মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।'

অলংকার ও ব্যঞ্জনাবহুল অসামান্য এই অংশ — 'শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের নাম ভুলিতে পারে না। উহা কালের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না।' আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বধির। লাইব্রেরী ব্যবহার করার মত প্রকৃত শিক্ষা তারা পায় না, তাই লাইব্রেরী তাদের কাছে বই-এর সম্ভার মাত্র, অচেতন পদার্থ মাত্র। প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীর কাছে এটি সমুদ্রের আহ্বান, স্বর্গের আহ্বান। এক একটি মহাদেশ এক একটি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই অমৃতলোকের উদ্ভাসন অমৃতের পুত্র

মানবকে সন্ধান দিয়েছিলেন অতীতের মহাপুরুষেরা। যে দিব্যধামে মানুষ বাস করছে তা শুধুমাত্র বাদ-প্রতিবাদের স্থান নয়, মারামারি কাটাকাটির স্থান নয়, এখানে মানুষের পরস্পরবিরোধী ভাবনা ও দুই ভাই-এর মত একত্রে বাস করছে। সেই মহাভাবনা সহস্র বৎসর ধরে লাইব্রেরীর বইগুলি বহন করছে, অপেক্ষা করে আছে, কে তাদের বুঝবে।

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, বঙ্গের মানুষ আপন ক্ষুদ্র ভাবনা, সীমাবদ্ধতা, কলহ, ভ্রাতৃদ্রোহ, পরস্পরের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে নিজের জীবনীশক্তির অপব্যয় করছে। তাঁর দুঃখ এই যে, আমাদের ভাবনায় মহৎ কোনো কিছু নেই বা সৃষ্টি হচ্ছে না, যা আমরা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারি। হিমালয় কি কৈলাসের সমুচ্চ বার্তা আমরা বহন করে আনতে পারছি না। বিপুল সমুদ্র, নক্ষত্রখচিত বৃহৎ আকাশ আমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপ্তি সঞ্চারিত করতে পারছে না — আমাদের ভাবনার এদের মহত্ব ধরাই পড়ে না। ব্যঞ্জনগর্ভ এই বাক্যবিন্যাসে প্রাবন্ধিক আমাদের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন শুধু সাময়িকতাময় সংবাদপত্র থেকে বেরিয়ে এসে মহত্তর সত্য উপলব্ধির বৃহৎ অঙ্গনে বাঙালিকে দেখতে। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সারা পৃথিবীর উন্নত ভাবনাচিন্তার সঙ্গে আমরা যেন সমান আসন ভাগ করে নিতে পারি, এই চেষ্টা করতে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে, আমাদের উঠোনের সঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, আমাদের ভাবনা চিন্তা, কর্মবিধি, কার্যকলাপ সবকিছুর মধ্যে থাকবে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস যাতে আমাদের সাহায্য করতে পারে একমাত্র লাইব্রেরী তার জ্ঞানরাজ্যের প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত করে। প্রাবন্ধিক অবশ্যই নৈরাশ্যকে কখনো তাঁর জীবনে স্থান দেননি, আশাবাদী, আস্তিক্যবাদী, সামঞ্জস্যকামী, শান্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন বাঙালির এই জড়ত্ব ও হীনতা চিরস্থায়ী হবে না — বহু বৎসরের নীরবতার পর বাঙালির মন ভরে উঠেছে, তাকে তার কথা বলতে দিতে হবে। "বাঙালি কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।"

রবীন্দ্রনাথের আত্মগৌরবী প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করার যে, প্রাবন্ধিক কী বলেছেন সেই চিন্তাতে আমাদের মন একান্তভাবে আবিষ্ট না হয়ে কীভাবে বলেছেন সেটিই বেশিরভাগ সময় আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। আবার 'পঞ্চভূতের' নিজেই বলেছেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। আবার 'পঞ্চভূতের' মধ্যে ব্যোমের মুখ দিয়ে বলেছেন, 'বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন।' সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেও বলা হয়েছে, 'বসন্তে যেমন বৃক্ষ নবপত্রে, পুষ্পে শোভিত হয়ে নূতন হয়ে ওঠে, তেমনি নব নব কবিকে আশ্রয় করে কাব্যও নবীন হয়ে ওঠে।' ভাবনা পুরাতন — কেউ না কেউ তাকে প্রকাশ করবেই কিন্তু প্রকাশভঙ্গিই সাহিত্রিকের একমাত্র আপনার বস্তু। বাচ্য-বাচকের যে বক্রতা দ্বারা ব্যঞ্জনাসৃষ্টি সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় তার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে অমূর্ত চিন্তাগুলিকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। এই সাহিত্যধর্মী রচনায় যুক্তির শৃঙ্খলা নয়, ভাবাবেগই প্রাধান্য পেয়েছে। এই রচনার প্রতীকধর্মিতা, অলংকারসমাবেশ ও ব্যঞ্জনাগর্ভ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। প্রবন্ধটির শেষে সমকালীন বাঙালি সমাজের ভাবনার দৈন্য ও নিশ্চেষ্টতা নিয়ে কটাক্ষ করলেও বিষয়ের মহত্ত্বও তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং আত্মগত রচনায় এটুকু বেদনার প্রকাশ ঘটতেই পারে।

অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'অলঙ্কৃত বাক্যই রসাত্মক বাক্য'। সেই অলংকরণের প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কথা বাদ দিলেও গদ্যে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। এমনকি অনেক স্থানেই অলংকার তাঁর বক্তব্যের স্থান অধিকার করে রয়েছে। 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধে এই জাতীয় অলংকার-সন্নিবেশই আমরা দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন পদ্যসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের চর্চা সমান্তরালভাবে করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু গদ্যই

রচনা করতেন তাহলেও 'মহাকবি' আখ্যায় ভূষিত হতেন। তবে, কবিতার প্রতি আমাদের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই কবি রবীন্দ্রনাথের উপরে আমাদের আকর্ষণ অনেক বেশি। প্রকাশের যতগুলি মাধ্যম আছে, রবীন্দ্রনাথ তার কোনোটিকেই ছেড়ে দেননি, সবগুলির পূর্ণ ব্যবহার তিনি করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে মন ও বুদ্ধির মেলবন্ধন ঘটেছে। তাঁর রচনার যে রীতি বা স্টাইল তাতে রুচি, বৈদগ্ধ্য, রচনার পারিপাট্য এমনভাবে মিশে থাকে যে তা থেকে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে আমরা আলাদা করতে পারি না — সবই এক অখণ্ড ঐক্যের সূত্রে বাঁধা। ব্যুফোঁর উক্তি — Style is the man himself রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আক্ষরিকভাবে সত্য।

১৪.৭ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি আমাদের কাছে কাব্যরচনার মতই আনন্দদায়ক। যে সৃষ্টিধর্মিতা তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঐ একই উৎস থেকে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্ম।

নিশ্চুপ লাইব্রেরী রবীন্দ্রনাথের কাছে হয়ে উঠেছে ঘুমন্ত শিশুর মত শান্ত — যার জাগ্রত অবস্থা মহাসমুদ্রের মত কল্লোলময়। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত এই জ্ঞানসমুদ্র প্রতীকী হয়ে উঠেছে। হিমালয়ের চূড়ার বরফ গলে গেলে যে বিপুল বন্যা সৃষ্টি হতে পারে, লাইব্রেরীও জীবন্তসত্তায় পরিণত হলে তার ভাবপ্লাবনে সব মানবহৃদয় ভেসে যেতে পারে। ভাবনারাজ্যের শত শত পথের দিশা লুকিয়ে আছে লাইব্রেরীর মধ্যে। যে যা বস্তুর আকাঙ্খা করে, এখানে সবই পেতে পারে, শুধু খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষা।

অতীত থেকে বর্তমানে প্রসারিত এই জ্ঞানের ভাণ্ডারে বাঙালি কিছুই সংযোজন করছে না এটি প্রাবন্ধিকের ক্ষোভ। তবে, বাঙালি জাগ্রত হচ্ছে এবং অবশ্যই এই বৃহতের সঙ্গে সে নিজের বৃহৎ ভাবনা যোগ করবে।

ব্যঞ্জনাধর্মী এই রচনার অলংকার প্রয়োগ, ভাবনার অভিনবত্ব, তুচ্ছ বিষয়কেও মনোগ্রাহী করে তোলার অসামান্যতা প্রবন্ধটিকে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা দিয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে রচনারীতি যা মনে এবং মননে একটা আনন্দের দোলা লাগায় তা এখানে খুবই সুলভ। সৃষ্টি এবং সষ্টা এই প্রবন্ধে একাকার হয়ে আছে।

১৪.৮ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। লাইব্রেরীর সঙ্গে কী কী বস্তুর তুলনা করা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলুন।

২। লাইব্রেরীর উপযোগিতা রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বর্ণনা করেছেন, বিবৃত করুন।

৩। লাইব্রেরী কীভাবে আমাদের সমৃদ্ধ করে বুঝিয়ে বলুন।

৪। সমকালীন বাঙালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধ অনুসারে বিবৃত করুন।

৫। আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধটির উৎকর্ষ বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। লাইব্রেরীকে শান্ত মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

২। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্ব কীভাবে 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তা বলুন।

৩। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা অনুসারে লাইব্রেরী প্রবন্ধে একসঙ্গে কারা কারা বাস করছে বিবৃত করুন।

৪। লাইব্রেরী প্রবন্ধ অনুসারে বর্তমান বাঙালির কার্যকলাপের পরিচয় দিন।

৫। লাইব্রেরীতে আমরা কীভাবে সহস্র পথের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থাকি, তা স্পষ্ট করুন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বিদ্যুৎকে মানুষ কীভাবে বদ্ধ করেছে?

২। 'বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে।' —'ভরিয়া উঠিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২। 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' — অবন্তীকুমার সান্যাল

৩। 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা' — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' — ড. সরোজ দত্ত

একক - ১৫ ❑ বই কেনা : সৈয়দ মুজতবা আলী

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৫.৪ মূলপাঠ

১৫.৫ মূলপাঠের সারসংক্ষেপ

১৫.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

১৫.৭ সারাংশ

১৫.৮ অনুশীলনী

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.১ উদ্দেশ্য

- বাঙালি পাঠক এই প্রবন্ধটি পড়ে বই পড়া এবং বই কেনায় উৎসাহিত হবেন।
- সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যরচনা ও রচনাশৈলী সম্পর্কে পাঠকেরা জানতে পারবেন।
- বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে মুজতবা আলীর গভীর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কেও পাঠকেরা ধারণা করতে পারবেন।

১৫.২ প্রস্তাবনা

বাংলা রচনা-সাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ থেকে বিংশ এই শতাব্দীর যাত্রাপথে রচনা সাহিত্যে তার রূপ ও চরিত্র বদল করেছে অনেকটাই। প্রথমে ইংরাজী সাহিত্য থেকে ভাব ও রূপ অনুকরণ করলেও তার স্বকীয় সত্তা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই পরিস্ফুট হয়েছে। সাধারণ সাহিত্য হিসাবে রচনা-সাহিত্যও তার বাচ্যার্থকে সর্বদাই ছাপিয়ে যায় এবং একটি স্বতন্ত্র রসের জন্ম দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), রাজশেখর বসু প্রমুখ লেখকদেরহাতে রচনাসাহিত্য নবত্ব লাভ করেছে এবং আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। এই রচনাকারেরা ভাবনা, দৃষ্টিকোণ এবং স্টাইল সব দিক থেকেই এঁরা নিজস্ব মৌলিকতায় অনন্য। এই প্রাবন্ধিকদের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আর একটি নতুন নাম — সৈয়দ মুজতবা আলী। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হিসাবে ড. আলী তাঁর স্বকীয়তায় ভাস্বর। ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে তাঁর অবদান তুলনারহিত। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সপক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখা মুজতবা আলীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। আমাদের সাহিত্য ও তার ধারা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ''সভ্যতার সোপানে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও বহুমুখী হয়। তখন সাহিত্য বলিতে শুধু সরল রস-সৃষ্টি বুঝি না। তখন সাহিত্য সভ্য-মানবের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের আধার হয়। শেলীর যুগে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল দুই আদর্শের। একদিকে চিরন্তন সমাজ, তাহার বজ্র বাঁধন-প্রচলিত ধর্মের কড়া শাসন,

অন্যদিকে মানবের চিরন্তন বিদ্রোহী আত্মা — নূতনের সন্ধান ও সত্যের ক্রম-বিকাশের দৃঢ় আস্থা। পলে 'প্রমিথিউস আন-বাউন্ডে'র সৃষ্টি।"

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনায়াস—বিচরণ সম্ভব হয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের কারণে। সেজন্যই তিনি কখনো মুসাফির, কখনো সত্যপীর, কখনো প্রিয়দর্শী রায়পিথোরা, কখনো টেকচাঁদ ইত্যাদি রূপে সাহিত্য-সেবা করেছেন। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যেও তাঁর দান অনন্য। সেখানে তিনি রোমান্টিক এবং মুসলিম সমাজের শিক্ষিত নারী তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত মূর্তি পেয়েছে। বাংলা গদ্যসাহিত্রের প্রতিভা। তিনি অভিজ্ঞতা-জাত বক্তব্য সহজ সরল করে নানান, রসময় কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য সহযোগে উপস্থাপন করেছেন। শাণিত বিদ্রূপের সুষম প্রয়োগ, সুমিত ও সুসংগত শব্দাবলীর ব্যবহার তাঁর রচনায় যে তীক্ষ্ণতা এনেছে তা অননুকরণীয় — এ ধরনের সংবেদনশীলতা, মননশীলতা ও সৃষ্টিধর্মী চেতনা তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যেরই ফলশ্রুতি। "তাঁর রচনার ঢং বা শৈলী বা রীতি বাংলা গদ্যসাহিত্যে, 'বিশেষ করে রম্য রচনার ধারায় 'সৈয়দী ঢং বলেই পরিচিতি লাভ করেছে (সুনির্মল কুমার দেব, মীন)।" প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর অনায়াস — গমন এবং বৈঠকী আলাপনকে সরাসরি লেখায় তুলে আনা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনার রীতি আলাল, হুতোম, বীরবল এবং পরশুরামকে পিছনে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলা যায়। একই নিবন্ধে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদির সুষম অবতারণা তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করেছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুভাষাবিদ হওয়ার সুফল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান নকল করতে গিয়ে সন্ধান পেয়েছেন তা থেকেই তিনি ভাষাতত্ত্বপাঠে আগ্রহী হন। এর ফল হল বাক্যরচনা কৌশল সাবলীল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা — এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বহু-ভাষা জ্ঞান, দেশী-বিদেশী শব্দব্যবহার, নির্বিচারে গ্রাম্য ও মেয়েলি শব্দের প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য।

১৫.৩ সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ (বর্তমান ভারতের কাছাড় জেলা) শহরের নটিখাল এলাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী ও মাতা আমতুল মন্নান খাতুন। সৈয়দ সিকন্দর আলীও সাহিত্যসেবা করতেন — ১৯২৪ সালে কলকাতার 'নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ' তাঁকে 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্য-সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করে। মুজতবা আলীর পরিবারের সকলেই শিক্ষিত ও স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় শৈশব থেকেই পাওয়া যায়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাবদে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এলে তাঁর বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুজতবা আলী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে অসযোগ আন্দোলনের কালে কিছু ছাত্র অভিযুক্ত হয়। তার মধ্যে মুজতবা আলীও ছিলেন। পরে বহু ছাত্র স্কুলে যোগ দিলেও তিনি দেননি। তাঁর বাবার নির্দেশে শহর থেকে অনেকটা দূরে মোজা বোনার কাজ করতে শুরু করেন। তারপর নিজের জেদে তিনি শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাপক বগদানভ, রেনোয়া, ফরমিক, মরিস, টুচ্চী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখকে। ১৯২১-১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেন। ১৯২৬-২৭ সালে তিনি তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা অধ্যাপক রেনেয়া ও বগ্‌দানভের সুপারিশে আফগানিস্তানের শিক্ষাবিভাগে চাকুরী লাভ করেন। সময়ে দেশে ফিরে আসেন। তখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী স্বীকৃতি না থাকার ফলে সরকারী চাকরি পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। একমাত্র জামিয়া মিলিয়া ও জার্মানী বিশ্বভারতীকে স্বীকৃতি দিত।

সেই সুবাদে তিনি জার্মানী যান ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে, ১৯৩০ সালে রাইনল্যান্ডের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে থেকে 'The Origin of the Khojas and their Religious Life Today' নামক থীসিস এর জন্য ডি.ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। সেই বছরই স্বদেশে ফেরেন এবং ১৯৩৪ সালে অধ্যয়নের জন্য আবার কায়রো যাত্রা করেন। ১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষকপদে যোগ দেন। এবং মতপার্থক্যের কারণে ১৯৪৪এ এই চাক্‌রি তিনি ছেড়ে দেন — ইতিমধ্যে আবার একবার তিনি জার্মানী ঘুরে এসেছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি 'দেশ' পত্রিকার জন্য ধারাবাহিক 'দেশে বিদেশে' লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বগুড়া কলেজে যোগ দেন কিন্তু রাজনৈতিক বাদানুবাদের কারণে চাক্‌রি ছাড়েন এবং এরপর পাসপোর্ট চালু হলে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। পরে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্‌স্' এর সেক্রেটারী পদে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে রাবেয়া খাতুনের বিবাহ হয়। ১৯৫২তে তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' দিল্লীতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪তে স্টেশন ডিরেক্টার হন কটক কেন্দ্রে। ১৯৫৬তে এই চাক্‌রি ত্যাগ করেন। কোনোমতে বেশ কিছুদিন চলার পর ১৯৬১তে বিশ্বভারতীর ইস্‌লামিক হিস্ট্রী বিভাগের রীডার পদে যোগ দেন (অ্যাডহক ভিত্তিতে)। ১৯৬৫তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও বোলপুরের নিচাপট্টিতে থাকতে শুরু করেন। ১৯৭২এ আবার জার্মানী যান শেষবারের মত। ১৯৭৩এ ফিরে আসার পর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ঐ বছরই পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য বাংলাদেশে যান এবং সেখানেই ১৯৭৪-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই বর্ণময় জীবন একেবারেই ব্যতিক্রমী। যাযাবার মনোভাব সাজীবনই তাঁর সঙ্গী ছিল। কর্মক্ষেত্র বার বার পরিবর্তন ও ক্ষেত্রান্তরে গমন শুধু তাঁর জীবনকে নয়, সাহিত্যরচনাকেও পুষ্ট করেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোটামুটি ২৮টি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তাঁর রচনা একবারও থেমে থাকে নি। তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'দেশে-বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র' (আষাঢ় ১৩৪৯), 'জলে ডাঙায়', 'শব্‌নম্', 'টুনিমেম', 'পঞ্চতন্ত্র' (২য় পর্ব)—আষাঢ় ১৩৭৩, 'হাস্য মধুর', 'শহর', 'ইয়ার', 'হিটলার', 'মুসাফির', 'তুলনাহীনা', 'কত না অশ্রুজল' ইত্যাদি বহু আলোচিত। মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য', 'মোহম্মদী' পত্রিকায় ১৩৪১ সালে ছাপা হয়। তিনি ইংরাজী, বংলা ছাড়া আরবী, ফারসী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটী, ইতালীয়ান, ফরাসী, জার্মান সমেত মোট ১৫টি ভাষা জানতেন (আবার কেউ কেউ বলছেন তিনি ১৮টি ভাষা জানতেন)। যাইহোক, তাঁর একমাত্র ইংরাজী গ্রন্থ— The Origin of the Khojas and their Religious Life Today' ১৯৬৩ সালে জার্মানী থেকে প্রকাশিত হয়। অসাম্প্রদায়িক বলতে যা বোঝায় মুজতবা আলী ছিলেন তাই। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করা, সেখানে সর্বজাতীয় মানুষকে শিক্ষক হিসাবে পাওয়া, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসা তাঁকে মুক্তমনা করে তুলেছিল। তাঁর সত্যসন্ধ বলিষ্ঠ মনোভাব ও আপোষহীন বক্তব্য তাঁকে কোথাও স্থিত হতে দেয় নি। 'পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা' শ্রাবণ ১৩৫৬ রচনাটিতে প্রকাশিত মনোভাব এর প্রমাণ। তিনি বার বার তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থান সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। জীবনে বহু বিড়ম্বনা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল,'পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপান হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কমা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্থানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' বলাবাহুল্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরই ১৯৫০-এ তাঁকে পূর্বপাকিস্তান ছাড়তে হয়। নানা ছদ্মনাম গ্রহণ করে তিনি লেখেন। 'সত্যপীর' নামটিই তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়াও টেকচাঁদ, রায়পিথোরা ইত্যাদি

ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকা অবস্থায় তিনি কিছু লেখেননি, গুরুদেবকে তিনি এতটাই সম্মান করেছিলেন।

১৫.৪ মূলপাঠ

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার নিয়েছেন। মাছিকে যেদিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবারনয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোক বসানো থাকতো তাহলে আচক্রবালবিস্তৃতই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ব করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটি কি? প্রথমত : বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবে হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—

Here with a loaf of bread
beneath the bough
A flask of wine, A book of
verse and thou,

Beside me singing in the wilderness

And wilderness if paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্ত বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে "আল্লামা বিল কলমি" অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই Per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক — The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনি তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কতা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে — ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নয়।

বইয়ের দামা যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ 'সিকে দিয়ে যেকোন ভালবই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটেরভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। একস্‌পেরিমেন্য করতে নারাজ — দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদানূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র বাসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer — তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer : আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই producer করেছি — কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেস মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদাগাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত — পা ফেলা ভার। একবন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্তি কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজের জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়াক কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না — বই পড়তে পারে না।

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই.ডি দিয়ে 'অতএব প্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে,

কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে 'তবে একখানাভাল বই দিলেহয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জং করতে চায়। তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুতকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলাম — কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেন নি।

* * *

আর কত বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুখ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

১৫.৫ মূলপাঠের সারসংক্ষেপ

মাছির মাথার চারিদিকেই চোখ আছে বলে মাছি একসঙ্গে চারদিকটাই দেখতে পায়। এই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।' ফাঁস এটাও বুঝেছেন, বাস্তব চোখের চেয়ে মনের চোখের দৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারী। আর, মনের দৃষ্টি বাড়াবার একমাত্র উপায় জ্ঞানার্চন — অর্থাৎ বই পড়া। বই পড়তে হলে বই কিনতেও হয়। সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণা এড়াবার একমাত্র উপায় হল বই — বার্ট্রান্ড রাসেল একথা বলেছেন। ওমর খৈয়ামও বলেছেন বই অনন্ত যৌবনা, সে কখনো ফুরিয়ে যায় না। কোরানে হজরত মহম্মদ বলেছেন, 'আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের মাধ্যমে। 'বাইবেল' শব্দের অর্থও 'সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক'। হিন্দুধর্মেও গণেশ সর্বশ্রেষ্ঠ বইটি লিখবার দায়ভার নিয়েছিলেন।

বাঙালি বই কিনতে বিমুখ। অত পয়সা তার নাকি নেই। কিন্তু বই কিনে কেউ যে দেউলিয়া হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কেউ দিতে পারে না। বইএর দাম কমলে বাঙালি হয়তো বই কিনতে পারে কিন্তু প্রকাশক বইএর দাম কমাবে না। বই বেশি বিক্রী হয় না কাজেই বেশি বই ছাপানো যায় না, বেশি না ছাপালে প্রকাশকের লাভ হয় না সুতরাং সে বই-এর দাম কমাতে পারে না। অথচ লেখকের মতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর ছয় বা সাত নম্বর ভাষা। ফরাসীরা দায়িত্ব নিয়ে বই ছাপায়। আমরা বই কিনি না, তাই বই বেশি ছাপানো যায় না — এটি একটি দুর্ভেদ্য চক্র। লেখক কৌতুক করে বলেছেন, তিনি নিজেই নিজের বই-এর producer নিজেই consumer।

বই কেনার প্রসঙ্গ থেকে লেখক মার্ক টুয়েন-এর প্রসঙ্গে চলে গেছেন যিনি শুধু বই ধার করেই আস্ত একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। ধনীরা কঠিন পরিশ্রমে টাকা অর্জন করেন, সেই পরিশ্রমের ফল যদি জ্ঞানীকে দেওয়া যায়, তাঁরা অনেক ভালো পদ্ধতিতে অর্থাৎ বই-এর সঞ্চয় করে টাকা কাজে লাগাতে পারেন। ধনীরা ঘর সাজানোর জন্য বই ব্যবহার করেন, ফরাসীরা মানুষকে সম্মান বা অপমান করতেও বই-এর সাহায্য নেন। আঁদ্রে জিদ বই-এর সাহায্যেই তাঁর কপট বন্ধুদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বাঙালির বই কেনার প্রতি অনীহা প্রাবন্ধিককে ব্যথিত করেছে অথচ তিনি এও দেখেছেন যে, ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার টিকিট কিনতে মানুষ একটুও কার্পণ্য করে না। কৌতুকচ্ছলে তিনি একটি হেকিম ও রাজার গল্প বলেছেন — যেখানে রাজা তাঁর বই দিতে না চাওয়া হেকিম বন্ধুর বইটি কৌশলে হস্তগত করে হেকিমের কৌশলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ করেছেন যে বাঙালি হয়তো এই গল্পটি জানে, তাই সে বই কেনে না, বা পড়ে না।

১৫.৬ বিশ্লেষণী পাঠ

প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর পরিজ্ঞান বই কেনা প্রবন্ধটির সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। বই পড়া এবং বই কেনার প্রতি পরাঙ্মুখ বাঙালির চেতনাকে জাগ্রত করা চেষ্টা সর্বতোভাবে এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রাবন্ধিক করেছেন। কয়েকটি গল্প তিনি নিজ বক্তব্যের যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যা অকাট্য। কৌতুকের ছলে লেখা এই রচনা বাঙালির আলস্য, জ্ঞানবিমুখতা চিন্তাহীন স্থির জীবনযাপনকে আঘাত করার পক্ষে যথেষ্ট। গোটা পৃথিবীকে একসঙ্গে দেখার জন্য মাছির মত চোখ চেয়েছেন প্রাবন্ধিক যা আনাতোল ফাঁস চেয়েছিলেন। মনের চোখে লেখক সারা পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন। মনের চোখে দেখতে গেলে চাই জ্ঞানার্জন, যা বই পড়া চাড়া সম্ভব নয়। কোরান, বাইবেল, হিন্দুদের মহাভারত লেখার কাহিনী উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সব ধর্মেই জ্ঞানের প্রসারকে শেষ কথা বলে মানাহয়েছে। সাহিত্যও যে একই কথা বলে 'ওমর খৈয়াম' থেকে তা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, রুটি, মদ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব বস্তু ফুরিয়ে গেলেও বই ফুরিয়ে যাবে না, কাজেই বেহেস্তে যেতে একমাত্র সঙ্গী হতে পারে বই। সর্ববিধ ধর্ম ও আচারের মূলীভূত বিষয়কে লেখক এভাবেই দেখেছেন।

মুজতবা আলী বই কেনা, বই-এর দাম ও প্রকাশক সম্পর্কে যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তব। বক্রদৃষ্টিতে লেখা হলেও বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বই কেনা একটা অভ্যাস এবং বই কিনে লোকে কখনো ফতুর হয় না। বাঙালির বই না কেনার অভ্যাস, ক্রেতা ও প্রকাশকের সৃষ্ট যে দুর্ভেদ্য আবর্তনচক্র তাতে পুরো বিষয়টি ঘূর্ণায়মান হতে থাকে। 'তাই এই চক্র অচ্ছেদ্য। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।' — এই প্রাঞ্জল যুক্তির বিন্যাস পদে পদে রচনাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মার্ক টুয়েনের গল্প, একজন পণ্ডিতের তথ্য, গরবিনী 'ধনী'র স্বামীর একটি বই থাকার গর্ব, আঁদ্রে জিদের বই-এর সাহায্যে প্রতিশোধ নেওয়া — সব গল্পগুলিই বই পড়া এবং তজ্জন্য বই কেনার সপক্ষে আমাদের মনকে অনুকূল করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিশেষে তাঁর শ্লেষযুক্ত আখ্যানটি জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে যে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করা যায়, এই রচনাটির ফলকথা।

লেখক নিজে জ্ঞানী, বহুভাষাবিদ, পনেরো, মতান্তরে আঠারোটি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি তাঁর প্রবন্ধ রচনার সহায়ক হয়েছে। দেশ বিদেশের দৃষ্টান্ত নিয়ে এসে জ্ঞান যে নূতন ভুবন দেখানো বা সৃষ্টিতে আমাদের কতখানি সাহায্য করে তা তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের এই প্রবন্ধটি তাঁর 'সৈয়দ' জনোচিত শ্লেষ এবং বিদ্রূপে পরিপূর্ণ — রম্যরচনার মেজাজ প্রবন্দটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। রম্যরচনায় লেখকের যে প্রস্তুতি দরকার সেই সমৃদ্ধ মন মুজতবা আলীর ছিল — তাই সামান্য বিষয়কে তিনি করে তুলেছেন অসামান্য। তাঁর হ্যাসোজ্জ্বল, পরিহাসপ্রিয় আড্ডাধারী মনটি যা কথায় ও লেখায় মননশীলতা নিয়ে বিচ্ছুরিত হত তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রম্যরচনায়। বীরবল ও রাজশেখর বসুর সাহিত্যধারায় বৈদগ্ধ্য ও সরসতাকে মিশিয়ে তিনি একটি অনন্য মাধ্যম সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। যদিও তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন, 'আড্ডাধারী' হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন,

কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে সংকেত ও ব্যঞ্জনার বহুব্যবহার তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যভাষায় আছে "ফরাসী গদ্যের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীত তীক্ষ্ণতা। লঘুচালের ভাষায় বর্ণাঢ্য রচনা শৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন" (প্রসঙ্গ : মুজতবা আলী। রচনাকা — সৈয়দ মুর্তাজা আলী)।

১৫.৭ সারাংশ

বাঙালির পাঠবিমুখতা তথা বই কেনার বিষয়টি নিয়ে সহজ, সরল, কৌতুকস্নিগ্ধ এবং শ্লেষযুক্ত এই রম্যরচনাটি লিখিত হয়েছে। মানুষ বাস্তব চোখে নয়, মনের চোখে সারা পৃথিবীকে দেখতে পারে। তার সামনে সেই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় বই। বাঙালি স্বেচ্ছায় সেই উন্মুক্ত রাজ্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বই পড়তে গেলে অন্তত কিছু বই কিনতে হয়। বই যারা পড়তে ভালোবাসে তারা বই কেনে এবং ক্রমশঃ বই কেনাটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক মনে করে বই কেনা মানে পয়সা নষ্ট করা। বই বিক্রী হয় না বলে প্রকাশক বেশি বই ছাপায় না এবং বই-এর দামও কমাতে পারে না। বই-এর দাম কমে না বলে মানুষ বেশী দাম দিয়ে বই কেনে না। এটি একটি চক্রব্যূহ। তাই প্রাবন্ধিক কৌতুক করে বলেছেন, "আমি নিজেই Producer এবং Consumer — তামাকেব মিক্সচার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে Producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই Consumer : আর বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই Produce করেছি — কেউ কেনে না বলে আমি নিজেই Consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।"

বই-এর সাহায্যে জ্ঞানবৃদ্ধি থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ সবকিছুই করা যায়। এই প্রসঙ্গে ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ এবং একজন রাজা ও হেকিমের গল্প লেখক বলেছেন।

বহুভাষাবিদ প্রাবন্ধিক দেশ বিদেশের দৃষ্টান্ত তুলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন ও বই পড়া তথা বই কেনার প্রতি আমাদের আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন। বীরবল ও রাজশেখর বসুর মননশীল, শ্লেষ ও বিদ্রূপপূর্ণ ধারার পাশাপাশি প্রাবন্ধিক একটি নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা প্রবন্ধপাঠের পর আমাদের মনে কৌতুক-স্নিগ্ধ ও শ্লেষবিজড়িত একটি অনুভূতির সঞ্চার করে।

১৫.৮ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। রম্য-রচনা হিসাবে 'বই কেনা'—রচনাটির সার্থকতা বিচার করুন।

২। 'বই কেনা' রচনায় প্রাবন্ধিক যে মজার গল্পগুলি বলেছেন, তা আলোচনা করুন।

৩। 'বই কেনা' প্রসঙ্গে যে অচ্ছেদ্য চক্রের কথা বলা হয়েছে, তা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৪। 'বই কেনা' রচনার মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ও এই প্রসঙ্গে লেখকের যুক্তি বুঝিয়ে বলুন।

৫। মুজতবা আলীর রচনাশৈলীর পরিচয় 'বইকেনা' প্রবন্ধে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। লেখকের মতে বাঙালির বই কেনার প্রতি অনীহা কেন?

২। আঁদ্রে জিদ কেন এবং কীভাবে তাঁর কপট বন্ধুদের জব্দ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। বই সম্পর্কে বাইবেল এবং ইস্‌লামের মত কী তা বলুন।

৪। 'যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।' — বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

৫। বই সম্পর্কে বড়লোকদের কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 'বই কেনা' প্রবন্ধ অনুসারে বুঝিয়ে বলুন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। চোখ বাড়াবার প্রথম পন্থা কী?

২। 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ জোগাড় করছ না কেন? —বক্তা কে?

৩। 'এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।' —কোন্ সমস্যার কথা বলা হয়েছে?

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বাংলা সাহিত্যের একদিক' — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২। 'সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী'

৩। 'প্রসঙ্গ : মুজতবা আলী।' বিজনবিহারী পুরকায়স্থ সম্পাদিত

মডিউল ৪
পত্রসাহিত্য

একক : ১৬ ❑ 'ছিন্নপত্রাবলী' : ১০৭ সংখ্যক পত্র

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ ভূমিকা
১৬.৪ চিঠি লেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
১৬.৫ 'ছিন্নপত্রাবলী' ১০৭ সংখ্যক চিঠি — মূলপাঠ
১৬.৬ মূল চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা
১৬.৭ ১০৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'জাল ফেলা' ('অনাদৃত') কবিতা — মূলপাঠ
১৬.৮ 'জাল ফেলা' ('অনাদৃত') কবিতার ব্যাখ্যা
১৬.৯ ১০৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'দেউল' কবিতা — মূলপাঠ
১৬.১০ 'দেউল' কবিতার ব্যাখ্যা
১৬.১১ সারাংশ
১৬.১২ অনুশীলনী
১৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে, রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে ওঠার পাশাপাশি, রবীন্দ্র-কবিমানস উন্মোচনের ইতিবৃত্তটি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হবে উঠবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

'ছিন্নপত্রাবলী'-র প্রকাশকাল সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রদান, পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ তিনটি চিঠি নির্বাচনের কারণ, পত্ররচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এবং বিশেষভাবে 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১০৭ সংখ্যক চিঠিটির সূত্রে, পত্রে-উল্লিখিত নানা প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এই এককটি সজ্জিত।

১৬.৩ ভূমিকা

পাঠ্যসূচিতে একক ১৬ ও ১৭ জুড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৮, ৫৫ এবং ১০৭ সংখ্যক চিঠি। কেন বিশেষ এই তিনটি পত্রেরই নির্বাচন, সেই প্রশ্নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল জাগতে পারে যে, পত্রগুলি ক্রমানুসারে আলোচনা না করে কেন একক ১৬-য় ১০৭ সংখ্যক এবং একক ১৭-য় ৮ ও ৫৫ সংখ্যক চিঠি বিন্যস্ত হয়েছে। সেই আলোচনায় আসার আগে, 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের প্রকাশজনিত তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক—

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী (ডাক নাম — বব)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ১৪৫টি চিঠি একত্রে সংকলিত হয়ে 'ছিন্নপত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এই ১৪৫টি চিঠির সঙ্গে অতিরিক্ত ১০৫টি চিঠি যুক্ত হয়ে ১৯৬০-এ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র প্রকাশ। অর্থাৎ, 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে মোট পত্রসংখ্যা ২৫২। এই 'ছিন্নপত্রাবলী'-র যুগ রবীন্দ্রসাহিত্যে 'হিতবাদী' পর্ব (১৮৮৪ — ১৮৯১) এবং 'সাধনা'-'ভারতী' পর্ব (১৮৯১ — ১৮৯৫)-কে ধারণ করে আছে।

১৭ বৈশাখ, ১২৯৭-এ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ক্যাশবইয়ের হিসেবে লেখা আছে, 'শ্রীযুক্ত রবিবাবু মহাশয়ের জন্য একখানা বহী ক্রয় গুঃ খোদ ১৸০'। 'রবিজীবনী'-র তৃতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখছেন, 'দাম দেখে মনে হয় খাতাটি বেশ পুরু ধরনের ছিল। বৈষয়িক চিঠিপত্রের নকল রাখার জন্যে কেউ কেউ এইরকম খাতা ব্যবহার করেন [আমরা রবীন্দ্রভবনে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এইরূপ একটি খাতা দেখেছি, শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের চিঠির নকল রাখার জন্যে ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল] —কিন্তু বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এমন কিছু বৈষয়িক গুরুত্ব অর্জন করেনি যে তাদের নকল রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেইজন্য আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই খাতা ছিন্নপত্রাবলীর পাণ্ডুলিপির খাতাটি নয় তো?'

'ছিন্নপত্রাবলী'-র শেষ চিঠি, ২৫২ সংখ্যক পত্রটি লেখা হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৫—১ পৌষ, ১৩০২-এ। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলাইদহে কাটিয়েছেন। 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, সেই সময়েও রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক চিঠি লিখেছিলেন, 'কিন্তু সেগুলি দুর্ভাগ্যবশত রক্ষিত হয় নি, অন্তত এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।'

'ছিন্নপত্রাবলী'-র ২৫২টি চিঠির মধ্যে মাত্র তিনটি চিঠি এই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি চিঠি এমনভাবেই নির্বাচিত হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা এই তিনটি চিঠির পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের মাধ্যমে রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে—যে-পরিচয়, স্নাতকস্তরের পাশাপাশি স্নাতকোত্তর স্তরেও রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-সহায়ক হয়ে উঠবে।

'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১০৭ সংখ্যক চিঠির মূল ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের বিবিধ সত্তা এবং সেইসমস্ত সত্তার কেন্দ্রীভূত রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তা। রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৮ সংখ্যক চিঠির ভরকেন্দ্র। আর, 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৫৫ সংখ্যক চিঠিতে প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা।

১৬.৪ চিঠি লেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

চিঠি-যে একটা 'নতুন-জাতীয় সুখ', সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১৯৮ সংখ্যক চিঠিতে, ৮ মার্চ, ১৮৯৫-এ লিখছেন, 'পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে; কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিষ নয়। পোস্ট্ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখবৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর-একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস

আছে—ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করে না। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পূরণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি হয়েছে। সামান্য কথাবার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা প'ড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে—কথায় যে জিনিষটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিষটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘন্টা পরস্পর কাছাকাছি যাপন করেছে, যাদের মধ্যে কখনো চিঠিপত্র-লেখালেখির অবসর হয়নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণভাবে জানে, পরস্পরের চরিত্রের অনেক ডেলিকেট অনেক সত্য এবং সুগভীর জিনিষ তাদের জানবার কোনো উপায়ই হয় না। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার যো নেই—এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ।'

চিঠি লেখার ক্ষেত্রে পত্রলেখক এবং পত্রপ্রাপক—উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১৬০ সংখ্যক চিঠিতে, ৭ অক্টোবর, ১৮৯৪-এ ভাইঝি ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সবচেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত।... আমি জীবনচরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই; আমরা ইচ্ছা করলে, চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘন্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেকদিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি।... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।... সহজ সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে... বায়রন মূর'কে যেসমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায়নি, মূরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে—সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়রনের স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি, মূরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে! যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, / তবে সে কলতান উঠে। / বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, / তবে সে মর্মর ফুটে।"

১৬.৫ ছিন্নপত্রাবলী ১০৭ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

সাজাদপুর

৩০ আষাঢ়। ১৩০০।

১৩.০৭.১৮৯৩

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয়— এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন— মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্যকর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই পড়েছি [বব]! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে— তিনি মনে করেছিলেন যে, আহা, সেই যদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকে-সুদ্ধ নিয়ে ছটি হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস যদি কর্ণকেও পেতেন তা হলে দুর্যোধন-দুঃশাসনকেও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হত

না। কারণ, হয় এক, নয় অসংখ্য— এর মাঝখানে আর কোথাও বেশ স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। পাঁচ বললে ছয় আপনি এগিয়ে আসে এবং ছয়ের পর সাত আট নয় দশ প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যাগুলি সার বেঁধে অনিমেষ লোচনে মুখের দিকে [চেয়ে] অপেক্ষা করে থাকে। অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে— বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন— আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।...

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিষটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দু'ই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম— তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে কর্ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল— সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সুমদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিষ উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি— হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিষ কখনও দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়— এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী?

জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি— আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয় নি!' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিষগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা

অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না— তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়— অতএব এখনকারমতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়— ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাঁৎসেতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

সিমলা
১৭ জুলাই ১৮৯৩

১৬.৬ মূল চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

ক) 'আজকাল কবিতা লেখাটা ... আশ্রয় নিচ্ছি :

সাজাদপুর থেকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে এই চিঠি লিখছেন ১৩ জুলাই, ১৮৯৩—বাংলায় ৩০ আষাঢ়, ১৩০০-য়। কবিতা লেখার অবসরকে রবীন্দ্রনাথ কেন 'গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের' সঙ্গে উপমিত করেছেন?

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে (ডিসেম্বর, ১৮৯১) 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল মাত্র চার বছর। প্রথম তিন বছর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যদিও সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত থাকলেও প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চতুর্থ বছরে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন উপরি-উক্ত চিঠিটি লিখছেন, তখন 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ। তিনি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথকে লেখার তাগাদা দিচ্ছেন। এদিকে, সেইসময় রবীন্দ্রনাথের ওপর ন্যস্ত হয়েছে বিরাট জমিদারি সামলানোর ভার। নানা ব্যস্ততায় রবীন্দ্রনাথের মন কবিতা লেখার অবসর খুঁজত। কবিতা লিখনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরতম 'আমি'-র সন্ধান পেতেন। তাই, জমিদারি দেখাশুনা, 'সাধনা' সম্পাদনা বা 'সাধনা'-য় প্রকাশের জন্য ছোটগল্প রচনা—এসবের মাঝে কখনও অবসর পেলেই, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন। তাই কবিতা লেখাটা তাঁর পক্ষে ছিল 'যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো'।

খ) 'আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে ... সেই কাজই করা যাক :

রবীন্দ্রনাথের মতো পারদধর্মী প্রতিভাকে এক সরলরেখায় বিচার করা অসম্ভব। সাধারণত রোমান্টিক কবিদের জীবন ছন্নছাড়া হয়। কিন্তু আশ্চর্য রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সুযম, পরিমিত এবং ধ্রুপদী। তিনি একদিকে বিরাট জমিদারি সামলেছেন, অন্যদিকে সংসার-ও করেছেন। তিনি স্থিতধী। সমবায় আন্দোলন করেছেন, পতিসরে কৃষিব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন, শিক্ষা সংক্রান্ত বক্তৃতা দানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিষয় হয়ে উঠেছে বিশ্ব-রাজনীতিও। তাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক আশ্চর্য বৈপরীত্য ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে যদি ওই স্ববিরোধ বা বৈপরীত্যই প্রধান হয়ে উঠত, তাহলে সৃজনশীল রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যেতেন। সেই কারণেই, যে-রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' লিখেছেন তিনিই লিখেছেন 'শেষলেখা'। তিনি একদিকে 'পূরবী' লিখেছেন, অন্যদিকে লিখেছেন 'বলাকা'। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেন, 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে', আবার পরমুহূর্তেই বলেন, 'ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা করেছিনু আশা'। একদিকে তিনি লেখেন 'বিসর্জন', অন্যদিকে সেই রবীন্দ্রনাথ-ই লিখতে পারেন 'চার অধ্যায়'।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহুবিচিত্র একঘনতা লক্ষ করা যায়। আবু সয়ীদ আইয়ুব এই নানা সত্তার রবীন্দ্রনাথকে পৃথক পৃথক বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের নানা সত্তা আসলে একটি এককেন্দ্রিক বৃত্তের সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে পরিধিগুলো বহুবিচিত্র, অপুনরুক্ত এবং মূল কেন্দ্রটি এক রহস্যময়তায় আলগ্ন। সেকারণেই Krishna Dutta এবং Andrew Robinson রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন 'The Myriad Minded Man'। 'Myriad' অর্থে সহস্রাক্ষ।

এপ্রসঙ্গে 'কবিমানসী'কার জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সহস্রাক্ষ। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে নানা রবীন্দ্রনাথের লীলা। ...কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষব্যাপী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বার বার ঋতুবদল হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ ও রীতিবদলও হয়েছে বার বার। শিল্পী হিসাবে কবিতায়-গানে- গল্পে- উপন্যাসে-নাটকে-রসরচনায় কলাকৃতির বহু বিচিত্র সমাবেশে তাঁর বাণীপ্রকাশ 'নব রে নব নিতুই নব'। বিষয়ালম্বনের দিক থেকে বিশ্বমানবের বাণীদূত তিনি ... জীবনশিল্পী-হিসাবেও ঋষিপ্রতিম তাঁর জীবনসাধনা কখনো শিক্ষাচার্য কখনো আশ্রমগুরু, কখনো ভক্ত কখনো প্রাজ্ঞ, কখনো দেশপ্রেমিক কখনো বিশ্বমানবের শুভৈষী রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ...তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কবি-হিসাবেও তাঁর জীবনের কারিগর তাঁর চিত্তফুলবনের বিচিত্র ঋতুর পুষ্পসম্ভার দিয়ে 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা' গেঁথে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে তাঁর অন্তরতম আসল পরিচয় কোন্‌টি—এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কবিজীবন সম্পর্কে কৌতূহলের নিবৃত্তি কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর তাঁর রচনাবলীতে, গদ্যে ও কবিতায় পরিচ্ছন্ন ভাষাতেই ব্যক্ত করে গিয়েছেন। যাটের কোঠায় পড়ে, অশীতিবর্ষব্যাপী কবিজীবনের শেষপাদে, অর্থাৎ জীবনের শেষ কুড়ি বৎসরে, রবীন্দ্রনাথের মনে বার বার এই প্রশ্ন জেগেছে এবং প্রত্যেকবারই তিনি তাঁর উত্তর অন্তরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম আত্মজিজ্ঞাসা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তেষট্টি বৎসর বয়সে দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার সমুদ্রপথে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করেন "তাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেবার জন্যে" এবং ১৯২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাত্রার পূর্বে কবির শরীর অসুস্থ, মন ক্লান্ত ও অবসন্ন। সেই যাত্রার কথা কবি ডায়ারির আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। 'যাত্রী' গ্রন্থে "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" অংশে কবির সেই ডায়ারি সংকলিত হয়েছে। সমুদ্রের উপর 'হারুনা-মারু' জাহাজে বসে ১৯২৪ সালের ৫ অক্টোবর যে চিঠি লেখেন তাতেই তাঁর নিভৃত মুহূর্তের আত্মচিন্তা ভাষা পেয়েছে।'

এই বক্তব্যের সমর্থনে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য—

"মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

"জীবনের মাঝমহলে, যে-কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত, 'তোমার বয়স কত?' তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশ বছরটা সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটকু। অর্থাৎ, আমার বয়স হচ্ছে কুষ্ঠির শেষের দিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে, 'নেতা হও', কেউ বললে, 'সভাপতি হও', কেউ বললে, 'উপদেশ দাও।' আবার কেউ বা বললে, 'দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।" অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মত অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

"এমন সময় ষাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলা সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।..."

"কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর অবতারণার যে সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম না, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্য ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।..."

"মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস আছে, স্বরাজ পররাজ দ্বৈরাজ নৈরাজের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা-মন ছেলেটির একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

"আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার?..."

"এও বুঝলুম, এ-জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।"

"যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল

নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলার সময় পায়নি; ...তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আমার জীবনে যারা সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।"

৭ অক্টোবর, ১৯২৪-এ ওই 'হারুনা-মারু' জাহাজে বসেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আজ পনেরো-ষোলো বছর ধরে কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততর মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করে, "ফল হবে কি।" সেইজন্যে যার ফরমাশ কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারি পাওনা দাবি করে ভিতরে-ভিতরে সে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে, "তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, তার করলে কী। কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।" নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়; হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীরভাবে বলে, "পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর।" তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, "পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।" লঘু নয় তো কী! সেইজন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় তার পাখা চলে, তার রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিত ফেঁদে সময়ের সদ্ব্যয় করা তার জাত-ব্যবসা নয়; সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে পথে রঙের ঝরনা রসের ধারা ঝরে ঝরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল একটা বাজে খরচের মতো।'

এই আত্মচিন্তার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম যে-সত্তাটি উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেটি হল, রবীন্দ্রনাথ কবি। রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক। সত্তর বছর পূর্তিতে 'পান্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুপরিধিময় এককেন্দ্রিক সত্তাস্বরূপ বৃত্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুটির পরিচয় উদ্ঘাটন করে লিখলেন—'শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, / আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই। / আমি কবি, আছি / ধরণীর অতি কাছাকাছি, / এ পারের খেয়ার ঘাটায়।'

গ) নিজের এই কবি-সত্তা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

এক. 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৫১ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ২৮ মে, ১৮৯২-এ লিখছেন, 'একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস—একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না—একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ।'

দুই. 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৯৪ সংখ্যক চিঠিতে ৮ মে, ১৮৯৩-এ 'কবিতা'কে 'প্রেয়সী'র সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল— তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল, তখনকার সেই আবছায়াপূর্ণ অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত—কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়—আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুদ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে

নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্রত আশ্রয়স্থান।'

তিন. দিলীপকুমার রায়কে চৈত্র, ১৩৩৭-এ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'প্রাণ' কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায়ই বাকি নেই। ...একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো বৎসর বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে, অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্তত একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকুই নিঃসন্দেহ পাওয়া গেল যে আমি কবি।'

ঠিক এই কারণেই 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১০৭ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ছোটগল্প, ডায়ারি, প্রবন্ধ—সাহিত্যের এই বিভিন্ন সংরূপে তাঁর অনায়াস যাতায়াত থাকলেও, 'এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন—মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক।'

ঘ) 'মদগর্বিতা যুবতী যেমন ... নিরাশ করতে চাই নে :

মিউজ কারা? গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী দেবতা Zeus, তরুণ রমণী Mnemosyne-র সঙ্গে পরপর নয়টি রাত একত্রে যাপন করেন। তারই ফলস্বরূপ Mnemosyne নয়টি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এই সন্তানদের Mnemosyne নিজের কাছে না রেখে Nymph Eufime এবং God Apollo-র কাছে সমর্পণ করেন। এই নয়টি কন্যাসন্তানের নাম—Clio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsichore, Erato, Polymnia, Ourania এবং Calliope। দেবতা অ্যাপোলোর তত্ত্বাবধানে তারা শিক্ষালাভ করতে থাকে এবং দেখা যায়, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা বিভিন্ন কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনচর্যায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই এবং তারা তাদের জীবন কলাবিদ্যাতেই উৎসর্গ করতে চায়। সেই থেকে এই নয়টি কন্যাসন্তানই গ্রীক পুরাণে নয়জন মিউজ (Muse) রূপে আখ্যাত হন। গ্রীক শব্দ 'Mosis' —যার অর্থ 'Desire and Wish', সেই শব্দ থেকেই এই 'Muse' শব্দটি আগত।

কোন্ মিউজ কোন্ কলাবিদ্যায় পারদর্শী এবং চিত্রে তাঁরা কীভাবে অঙ্কিত হয়েছেন, তা নিচে আলোচনা করা হল :

1. **Clio :** 'The Muse Clio discovered history and guitar. History was named Clio in the ancient years, because it refers to "kleos" the Greek word for the heroic acts. Clio was always represented with a clarion in the right arm and a book in the left hand.'
2. **Euterpe :** 'Muse Euterpe discovered several musical instruments, courses and dialectic. She was always depicted holding a flute, while many instruments were always around her.'

3. **Thalia :** 'Muse Thalia was the protector of comedy; she discovered comedy, geometry, architectural science and agriculture. She was also protector of Symposiums. She was always depicted holding a theatrical—comedy mask.'
4. **Melpomene :** 'Opposite from Thalia, Muse Melpomene was the protector of Tragedy; she invented tragedy, rhetoric speech and Melos. She was depicted holding a tragedy mask and usually bearing a bat.'
5. **Terpsichore :** 'Terpsichore was the protector of dance; she invented dances, the harp and education. She was called Terpsichore because she was enjoying and having fun with dancing ("Terpo" in Greek refers to be amused). She was depicted wearing laurels on her head, holding a harp and dancing.'
6. **Erato :** 'Muse Erato was the protector of Love and Love Poetry—as well as wedding. Her name comes from the Greek word "Eros" that refers to the feeling of falling in love. She was depicted holding a lyre and love arrows and bows.'
7. **Polymnia :** 'Muse Polymnia was the protector of the divine hymns and mimic art; she invented geometry and grammar. She was depicted looking up to the Sky, holding a lyre.'
8. **Ourania :** 'Muse Ourania was the protector of the celestial objects and stars; she invented astronomy. She was always depicted bearing stars, a celestial sphere and a bow compass.'
9. **Calliope :** 'Muse Calliope was the superior Muse. She was accompanying kings and princes in order to impose justice and serenity. She was the protector of heroic poems and rhetoric art. According to the myth, Homer asks from Calliope to inspire him while writing Iliad and Odyssey, and, thus, Calliope is depicted holding laurels in one hand and the two Homeric poems in the other hand.' (তথ্যসূত্র : https://www.greekmyths-greekmythology.com/nine-muses-in-greek-mythology)

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, মিউজ Clio ইতিহাস এবং গিটার-এর আবিষ্কারিণী। তাঁর ডান হাতে থাকে ক্ল্যারিওন নাম বাদ্যযন্ত্র এবং বাঁ হাতে থাকে একটি বই। মিউজ Euterpe সঙ্গীতের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, 'courses and dialectic'-এর আবিষ্কার করেছিলেন। বংশীধারী হিসেবেই তিনি বর্ণিত হন এবং তাঁকে ঘিরে সবসময়ই নানা বাদ্যযন্ত্রের সম্ভার। মিউজ Thalia-কে বলা হয় 'protector of comedy'। তবে, কমেডি ছাড়াও জ্যামিতি বা Geometry, architectural science এবং agriculture বা কৃষিবিদ্যার উদ্ভাবক হিসেবেও এই মিউজ প্রাচীন গ্রিসে পূজিত হতেন। Melpomeni—Thalia-র ঠিক বিপরীতধর্মী এই মিউজ আসলে 'protector of tragedy'। Terpsichore — ইনি নৃত্যকলার উদ্ভাবক। Erato — এই মিউজের নামকরণের প্রেক্ষাপটে আছে গ্রীক কামদেবতা Eros। গ্রিক শব্দ 'Eros'-এর অর্থ হল 'the feeling of falling in love'। তিনি চিত্রিত হন এইভাবে—'holding a lyre and love arrows and bows.'। মিউজ Erato, প্রেম, প্রেমকবিতা ও বিবাহের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য চিঠিতে বলছেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে কলাবিদ্যার নানা ক্ষেত্রে পারদর্শী বিভিন্ন আর্টিস্টের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী এই নয়জন গ্রিক মিউজের কোনোটিকেই তিনি 'হাতছাড়া' করতে চান না। তাই তিনি একবার ছোটগল্প লেখেন, একবার লেখেন ডায়ারি, কখনও গান তৈরি করেন, 'আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ।' এদিকে চিত্রবিদ্যার প্রতিও তাঁর অমোঘ টান তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

ঙ) 'আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা ... লাভ করা যায় না।' :

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, চিত্রবিদ্যার প্রতি তিনি 'সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত' করে থাকেন, কিন্তু চিত্রকলার সাধনার বয়স তিনি পেরিয়ে এসেছেন। 'অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।' অথচ, আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করে চিত্রজগতে বিশেষ স্থান লাভ করেছিলেন।

শেষ বয়সে পৌঁছে, জীবনের অন্তিম ষোলো বা সতেরো বছর তিনি চিত্রবিদ্যায় নিমগ্ন ছিলেন। এঁকেছিলেন দু'হাজারেরও বেশি ছবি। ১৯৩০-এর ২৬ এপ্রিল প্যারিস থেকে ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫ বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন—তিনি এখন চিত্রকররূপে প্রকাশমান—তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজমুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে গেলে অহংকার করা হয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রকর-সত্তার আবিষ্কারক ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। আর্জেন্টনার বুয়েনোস আইরেসে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট খাতায় তাঁর কবিতা লিখতেন। পাণ্ডুলিপির বর্জনীয় অংশ তিনি এমনভাবে কাটাকুটি করতেন, মনে হত, তিনি কবিতার মাঝখানেই রেখাচিত্র এঁকেছেন। ওকাম্পো সেগুলি দেখার পর রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের পরিচয় পেয়ে কবিকে চিত্রবিদ্যায় মনোনিবেশের অনুরোধ জানান। চিত্রকলার যে-সাধনা রবীন্দ্রনাথের মনে সুপ্ত ছিল, ওকাম্পোর অনুরোধে তা প্রকাশ পায়। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোই প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনি ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠ খড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য...। খরচ কম হয়নি—তিন চারশো পাউন্ড হবে। ...ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্ছে। ...এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজনদের ও জানে—ডাক দিলেই তারা আসে। ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক্ কারো চোখে পড়ত না।' ('রবীন্দ্রজীবনী', ৩য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

চ) অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে ... আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।' :

রবীন্দ্রনাথ 'কবিতা'-কে উপমিত করে বলেছেন 'আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা', 'আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।' কেন কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলাকার ভালোবাসা', তাঁর 'বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী' বলেছেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে। ব্যক্তিজীবনের সেই আলোচনা এখানে 'কবিমানসী'-র 'জীবনভাষ্য' খণ্ড অনুসারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশিত হল :

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বছর দু' মাস, সেইসময় দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র, রবীন্দ্রনাথের নতুনদা, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী হিসেবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পদার্পণ করেন নবমবর্ষীয়া কাদম্বরী দেবী। তিনিই রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। রবীন্দ্রনাথের শিশুমানসে কাদম্বরী দেখা দিলেন রূপকথার রাজকন্যারূপে। আশি বছর বয়সে শৈশবের সেই বিশেষ দিনটির কথা সানুরাগে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'-য় লিখেছেন, 'এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ কচি শামলা হাতে সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের মানুষ।'

রবীন্দ্রনাথ 'নির্বাসিত রাজপুত্র'। 'রাজ্যহীন রাজার অবহেলিত কনিষ্ঠ সন্তানের ভাগ্য ছিল তাঁর।' সেই ভাগ্যের কথায় 'আত্মপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালাপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্যে দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ-বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি। ...এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাসসমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।'

এককথায় রূপকথার রাজপুত্রের ভাগ্যবিড়ম্বিত শৈশবজীবন ছিল অন্তঃপুর থেকে নির্বাসিত, সহজাত নারীস্নেহ থেকে বঞ্চিত, ভৃত্যরাজকতন্ত্রে নিগৃহীত, অভিভাবকদের নিষ্ঠুর অনুশাসন-শৃঙ্খলে অষ্টপ্রহর জর্জরিত। শ্যাম চাকরের গণ্ডিতে তাঁর বন্দীদশা কাটত নিজেরই ঘরে। আর, বিদ্যালয়ে গেলে তাঁর মনে হত, আন্দামনে দ্বীপান্তরিত অপরাধী আসামীর মতো তিনি যেন কারারুদ্ধ। সেই অবাঞ্ছিত ও নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে যে দুটি সুখস্মৃতি পঞ্চাশোর্ধেও রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করেছে, তার একটি হল কৈলাশ মুখুজ্জের ছড়া, আর একটি, ইরাবতী-কথিত অনাবিষ্কৃত রাজপুরীর রহস্য।

'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায়, কৈলাশ মুখার্জী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির বহুকালের খাজাঞ্চি। অত্যন্ত রসিক সেই কৈলাস মখুজ্জে রবীন্দ্রনাথের শৈশবে অতি দ্রুত গতিতে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলে শিশু রবির মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। সেই ছড়াটির প্রধান নায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং সেখানে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হত। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে লিখছেন, 'এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু, বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।'

কৈলাশ মুখুজ্জের সেই ছড়াটি আটাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতায় অভিনব কাব্যরূপ লাভ করেছে। বিড়ম্বিত বন্দীদশার অভিশপ্ত কারাগারে শিশু রবির কাছে শাপমুক্তির

বাণী নিয়ে এসেছিলেন কাদম্বরী। তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শে নির্বাসিত রাজপুত্রের কারাগৃহ হয়েছিল অর্গলমুক্ত—'এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ'। আম-কাঁঠালের ছায়ায় চতুর্দোলায় চড়ে সেই বধূ এসেছে কবির স্বপ্নে, তার 'গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে'—'বালকের প্রাণে / প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে / ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়, / আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়, / সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা / দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা। ... / সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে / বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে, / পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও, / পথ শেষ হবে না কভুও। / সেকাল মিলাল। তার পরে বধূ-আগমনগাথা / গেয়েছে মর্মরছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা। ... / অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে / তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি / মৃদু রণরণি। / ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে, / পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে / দিয়েছিল দেখা / অনাগত চরণের অলক্তের রেখা। / কানে কানে ডেকেছিল মোরে / অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধরে— / সচকিতে / দেখে তবু পাইনি দেখিতে / অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ / রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ; / তাহারে শুধায়েছিনু, অভিভূত মুহূর্তেই, / "তুমিই কি সেই, / আঁধারের কোন্ ঘাট হতে এসেছ আলোতে!" / উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ; / ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত, / সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে, / নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।" '

'গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে' —এই 'নারীমন্ত্র আগমনীগানে'ই শিশু রবির মানসলোকে রূপকথার রাজকন্যের ঘুম ভেঙেছে। কৈলাস মুখুজ্জের ছড়ায় ছিল তার সোনার কাঠির স্পর্শ। আর, রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর কন্যা ইরাবতী-যে অনাবিষ্কৃত রাজপুরীর রহস্যের কথা বলত, সেটা ছিল ওই রূপকথারই পরিপূরক কাহিনি।

'জীবনস্মৃতি'-র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত ... ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। খেলিবার জন্য যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জায়গাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কী বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভৃত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কী একটা রহস্য ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্যও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহিরে, তাহাতে নিত্যপ্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই, তাহা শোভাহীন অনাবশ্যক পতিত জমি, কেহ সেখানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এইজন্য সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়া যেদিন কোনোমতে এইখানে আসিতে পারিতাম সেদিন ছুটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

'বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে; একতলায় বা দোতলায় কোনো-একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে।" সে বলিয়াছে, "না, এই বাড়ির মধ্যেই।" আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়।

রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়েছে, কেবল এইটকুমাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।'

অর্থাৎ যে-বাড়ি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ছিল তাঁর কারাগার, তাঁর বন্দীশালা, সেই বাড়ীতেই রূপকথার রাজপুরী রয়েছে—সেই স্বপ্নসংবাদ কবিমানসে বহন করে এনেছিল ইরাবতী। ইরাবতী রূপকথার রাজকন্যা নয়, কিন্তু রূপকথার স্বপ্ন সে এনেছে। আর, সেই স্বপ্ন-সরণিতেই একদিন এল রাজকন্যা। বারোয়াঁ সুরে বাজল সানাই। কাদম্বরী দেবী এলেন ঠাকুরবাড়িতে। এলেন শিশু রবির মানসলোকে রাজকন্যার রূপ ধরে—'গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে'। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।' ('প্রত্যাবর্তন' / 'জীবনস্মৃতি')

কিন্তু সেই ইচ্ছাপূরণ সহজ ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কোনো সুযোগে কাছে গিয়া পৌঁছতে পারিলে ছোড়দিদি তাড়া দিয়া বলিতেন, "এখানে তোমরা কী করতে এসেছ, যাও বাইরে যাও।" —তখন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান,মনে বড় বাজিত।' 'ছেলেবেলা'য় এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলেফেলার ছেলেমানুষ। দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর কোঠায়। নবাবী কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগ-কাটা গণ্ডির বাইরের। আবর শুকনো মুখ করে ফিরে আসতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।'

'সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়াল' থেকে বেরিয়ে অন্তঃপুরে, বালক রবীন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকার পেলেন তাঁর নতুন বৌঠান আসার পাঁচ বছর পর। রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হল ১২৭৯-র ২৫ মাঘ। সেই উপলক্ষ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ফেরার সময় তিনি বালক রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। হিমালয়যাত্রার সেই বর্ণনা আমরা পাই 'জীবনস্মৃতি'-র 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে। কলকাতা থেকে বোলপুর, সেখান থেকে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে অমৃতসরে পৌঁছলেন তাঁরা। মাসখানেক সেখানে থেকে চৈত্র মাসের শেষে গেলেন ডালহৌসি পাহাড়ে। বক্রোটার সর্বোচ্চ শিখরচূড়ায় পিতার সঙ্গে কয়েক মাস অতিবাহিত করার পর কিশোরী চাটুজ্জের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

ফিরে আসার পর, ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের স্থান প্রশস্ত হল। অন্তঃপুরে ঠাঁই পেলেন তিনি। হিমালয়ভ্রমণের বিবরণ-সহ প্রবাসী দেবেন্দ্রনাথের সংবাদ শোনার জন্য বালক রবিকে কাছছাড়া করতেন না মা সারদাদেবী। ফলে, হিমালয় থেকে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাড়িই ফিরলেন না, সেই প্রবাসযাত্রার আগে যে-নির্বাসন জীবন তিনি অতিবাহিত করতেন, সেই নির্বাসনের মেয়াদ-ও ফুরোলো। ঘুচে গেল অন্তঃপুরের বাধা। চাকরদের ঘর ছেড়ে তিনি মায়ের ঘরের সভায় এক বড় আসন দখল করে বসলেন।

এদিকে, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ঠাকুরবাড়িতে আসার পর থেকেই ছাদের রাজ্যে পরিবর্তন ঘটল। ছাদে নামল নতুন ঋতু। অন্তঃপুরের পর্দা থাকল না। তাই, বাড়ির ভিতরে যে-ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে, সেই অন্দরমহলের ছাদেও বৌদির সঙ্গলোভী বালক-দেওর রবীন্দ্রনাথের অধিকার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। আরো কিছুদিন পর, রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এসে বসলেন তেতলার ঘরে। রবীন্দ্রনাথ-ও তারই এককোণে একটু জায়গা করে নিলেন। ছাদের ঘরে পিয়ানো এল। এল বার্নিশ

করা বৌবাজারের আসবাব। দিনের শেষে ছাদে মাদুর আর তাকিয়া বিছানো হত। একটা রুপোর রেকাবিতে ভিজে রুমালে ঢাকা থাকত বেলফুলের গোড়ে মালা, সঙ্গে পিরিচে এক গ্লাস বরফ-জল আর বাটাতে ছাঁচা পান। বৌঠান কাদম্বরী গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে আসতেন। গায়ে একটা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরের গান। এই তেতলার ছাদেই প্রথম উৎসারিত হল কিশোর রবীন্দ্রনাথের গানের ফোয়ারা।

'ছেলেবেলা'-য় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে, সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। ...বঙ্গদর্শন এলে পাড়ার দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না, কেন না আমার একটা গুণ ছিল আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজলি পাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।'

রবীন্দ্রনাথের যখন তেরো বছর দশ মাস বয়স, তখন সারদাদেবীর মৃত্যু হয়—১২৮১-র ২৫ ফাল্গুন তারিখে। 'জীবনস্মৃতি'তে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!' তখনই বৌঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল।'

সেই আশঙ্কা থেকে তিনি যে-শুধু ওই দাসীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাই নয়; তিনি সদ্য মাতৃহীন বালকদের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। রবীন্দ্রজীবনে শৈশবের অনাদর ও ঔদাসীন্যের অভিশপ্ত দিনের অবসান ঘটল। ভৃত্যরাজকতন্ত্রের নির্মম বন্দীদশার গণ্ডি তিনি অতিক্রম করেলন। নতুন বৌঠানের স্নেহবৃত্তে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের স্বপ্নসুন্দর নানা-রঙের দিন। মায়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন-ই ভোলেননি। কিন্তু সদ্য মাতৃবিয়োগের বেদনা-যে তিনি ভুলতে পেরেছিলেন, তার সমস্ত কৃতিত্ব সেই বৌঠানের। 'কবিমানসী'কার লিখছেন, 'আমাদের মনে হয়, যে-ক্ষতি পূরণ হবে না, যে-বিচ্ছেদের কোনো প্রতিকার নেই, তাকে ভোলবার শক্তি শিশুচিত্তে যতই প্রবল হোক না কেন, শুধু সেই শক্তির দ্বারাই কবি মাতৃশোকের বেদনা ভুলেছিলেন, এ বিশ্লেষণ আংশিক সত্য মাত্র। এর চেয়েও বড় শক্তি সেদিন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ভুলে থাকার শক্তি নয়, ভুলিয়ে রাখার শক্তি। সেই শক্তি সৃষ্টি করেছেন কাদম্বরী দেবী। অনুক্ষণ তিনি তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য দিয়ে, খাইয়ে-পরিয়ে, সর্বদা কাছে টেনে, সদ্য-হারানো মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখবার জন্যে দিনরাত্রি চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র-জীবনে সেই কল্যাণী চেষ্টাই সেদিন জয়যুক্ত হয়েছে। নতুন-বৌঠানকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে পারেননি যে, তিনি মাকে হারিয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাতযাত্রা করেন ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। মা সারদাদেবী মারা যাওয়ার পর থেকে প্রথম বিলাতযাত্রার আগে পর্যন্ত, সময়ের হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন বছর, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই পর্বেই তাঁর কবিপ্রতিভা বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ স্কুল-পালানো ছেলে। মাতৃবিয়োগের পর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও, শেষপর্যন্ত তিনি আর স্কুলমুখো হননি। ঠাকুর-পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের বিদ্যায়তনিক পড়াশুনোয় এহেন মতি দেখে, বাড়ির সকলেই আশা পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু, পরিবারের সকলেই যখন রবীন্দ্রনাথের অক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত, ঠিক সেইসময় 'শিক্ষায়তনের বাইরে সরস্বতীর কমলবনে স্বচ্ছন্দবিহারের

আহ্বান তাঁর কবিচিত্তে পৌঁছে গেছে। যেখানে 'রাজহংস কেলি করে সুবর্ণ-নলিনী সনে' সেখানে তাঁর মানসহংস নব নব কাব্যসৃষ্টির আনন্দ-কেলিতে নিমগ্ন হয়েছে। ...নতুন বৌঠান তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন সরস্বতীর কমলবনে, শিক্ষাভবনের অবজ্ঞাত ও অসম্মানিত বালক সারস্বতসত্রের নবদীক্ষিত নবীনকিশোরের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। 'বনফুল'-'কবিকাহিনী'র কবির জন্ম হল।'

কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন সাহিত্যচর্চার প্রভাব নেহাত কম নয়। কিন্তু, 'কবিমানসী'কারের মতে, 'যে-সোনার কাঠির স্পর্শে কবি-কিশোরের ঘুম ভাঙল, সে-সোনার কাঠি ছিল কাদম্বরী দেবীর হাতে।' দিলীপকুমার রায়ের 'তীর্থংকর' গ্রন্থে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের দুই নারী তত্ত্বকে শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য এই সূত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী, সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের। ...জৈব-সৃষ্টিকার্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণভাবে স্ত্রীর সৃষ্টি-শক্তিকে সক্রিয় করে তোলে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে তো নয়। তাদের মনঃশরীর আছে, এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণত যে একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না করেও তাকে বুঝতে বাধে না। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে, তার মধ্যে মনঃশরীরের এই গভীর আহ্বানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে মিলন হয়, সে মিলনেও দৃষ্টি-শক্তিকে জাগরূক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মতন্ত্রগঠন, অর্থ-অর্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি করে তোলা মুখ্যভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টিকার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণভাবে সক্রিয় করে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেছেন, তাই মেয়েদের বলেছেন শক্তি, অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।' রবীন্দ্র-কবিমানসকে যিনি নানা প্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই 'হ্লাদিনী শক্তি' হলেন কাদম্বরী দেবী।

তাই, 'কবিমানসী'-কার যথার্থই লিখেছেন যে, 'প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্রকে লক্ষ্মীর বিলাসপুরী থেকে তিনি সরস্বতীর পদ্মবনের দিকে ডাক দিলেন এবং নিজেও তার নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন। সেদিন ঠাকুর-পরিবারে বিহারীলাল কবিগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কাদম্বরী ছিলেন বিহারীলালের ভক্ত-পাঠিকা। বিহারীলালের মতো উৎকৃষ্ট কবিতা লেখার নিত্যপ্রেরণা তিনি জাগিয়ে রাখতেন রবীন্দ্রনাথের চিত্তে। বিহারীলাল-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছুই হচ্ছে না, এই পরিহাস ও পরিবাদ-ছলে তিনি কবি-কিশোরের মনে বিহারীলালের প্রতি অনুক্ষণ ঈর্ষা জাগিয়ে রাখতেন। সে-যুগের মহত্তম কাব্যাদর্শের প্রতি ঈর্ষার বহ্নিস্পর্শেই অনুপ্রাণিত-বালকের চিত্তে আত্মপ্রকাশের আগুন জ্বলে উঠল।'

একারণে, কবিতা-ই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলাকার ভালোবাসা', তাঁর 'বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী'। 'সোনার তরী'-র 'মানসসুন্দরী' কবিতায় তাই তিনি 'কবিতা'কেই 'প্রিয়ে' সম্বোধনে লিখেছেন, 'আজ কোনো কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে / ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থগীত—এসো তুমি প্রিয়ে, / আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার / কবিতা, কল্পনালতা।...'

ছ) 'তুই যে নীরব কবি ... ব্যাকুল হয়ে আছে।' :

রবীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন, কবি 'নীরব' বা 'সরব' যাই হোন্ না কেন, তাঁর কবিত্ব খাঁটি হওয়া চাই। 'একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে' বিবিধ ভাব কবির হাতে নানা বিচিত্র আকার ধারণ করে। কবির সেই সৃজনক্ষমতার সরঞ্জাম হল ভাষা, ভাব ও অনুভাব। এই তিনের যেকোনো একটি, দুটি বা তিনটিই কোনো কবির থাকতে পারে। কিন্তু সৃজনীশক্তি ব্যতীত কবি হওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে 'নীরব কবি'-র 'অস্তিত্ব' প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন।

অথচ, এই রবীন্দ্রনাথই কার্ত্তিক ১৩১০-এ লিখবেন 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধ। সেখানে তিনি বলবেন, '...লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ। ...নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে, 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'; ভাণ্ডারে কী জমা আছে তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোনো সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে হাতে পাওয়া আবশ্যক।'

'উপরের এই ভূমিকার পরে ... আপত্তি না হতেও পারে।' —'জাল ফেলা' কবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'অনাদৃত' কবিতাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গ আলোচনার আগে মূল 'অনাদৃত' কবিতাটি পাঠ করা যাক্—

১৬.৭ ১০৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'জাল ফেলা' ('অনাদৃত') কবিতাটির মূল পাঠ

অনাদৃত

তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জ্বলজ্বল
কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন ভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল পানে চাহিনু ধীরে;
শুনিনু কাহার বাণী,
পরাণ লইল টানি',
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদুর নীরে।

নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে!
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টলটল
কঠিন নয়ন জল,
কোনটা সরম ছল

বধূর গালে!
সে দিন সাগর তীরে প্রভাত কালে!

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি' পূরবে
গগনের মাঝ খানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলি'
জাল ফেলে টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলি ধূলি
ধূসর নভে
গাভীগণ গৃহে ধায় হরষ রবে।

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে, চাঁদ আকাশ পরে।
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে' আছে ছায়ালোক,
মুদে আসি দুটি চোখ
স্বপন ভরে;
ডাকিছে বিরহী পাখী কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি'
কাননে বসিয়াছিল মালাটি পরি'।
কুসুম একটি দুটি
তরু হতে পড়ে টুটি',
সে করিছে কুটিকুটি
নখেতে ধরি';
আলসে আপন মনে সময় হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নীচু।
যাছিল চরণে রেখে
ভুমিতল দিনু ঢেকে;
সে কহিল দেখে' দেখে'
"চিনিনে কিছু!"
শুনি' রহিলাম শির করিয়া নীচু!

ভাবিলাম, সারাদিন চারাটি বেলা
বসে' বসে' করিয়াছি কি ছেলেখেলা!
না জানি কি মোহে ভুলে'
গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে
আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা!

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে?
কোন দুখ নাহি যার,
কোন তৃষা বাসনার,
এ সব লাগিবে তার
কিসের কাজে?
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে!

সারাটি রজনী বসি দুয়ার দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে!
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন;
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে'
সব ভুলে' নিয়ে গেল আপন দেশে!

২২ ফাল্গুন, ১২৯৯।

১৬.৮ 'জাল ফেলা' ('অনাদৃত') কবিতার ব্যাখ্যা

আলোচ্য চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'অনাদৃত'-র বহিঃস্তরীয় আলোচনার শেষে কবিতাটির ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গে লিখছেন, 'বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না—তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ওই জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।'

'Posterity' শব্দের অর্থ হল 'all the people who will live in the future'। সোজা কথায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। রবীন্দ্রনাথ এখানে কেন বলেছেন যে, সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতার ভাব বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যৎ পাঠক এর মূল্য বুঝবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তৎকালীন পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতার কী ধরনের সমালোচনা করেছিলেন এবং কীভাবে সেই সমালোচনা ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-বিদূষণের জন্ম দেয়, সেই ইতিহাসের দিকে।

রবীন্দ্র-দূষণের 'সূত্রপাত', আদিত্য ওহদেদারের মতে, ১২৯১ সন, ইংরিজিতে ১৮৮৫ সালে। ১২৯১-এর ৫ মাঘ কলকাতার সিটি কলেজে রামমোহন রায় সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন তেইশ বছর বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যেই তাঁর কবিতাসহ নানাবিধ রচনা মিলিয়ে মোট প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ষোলো। গীতিকাব্যের ধারায় তিনি তখন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান' শেষে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে এসে পৌঁছেছেন। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

রামমোহন রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটি ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। 'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত'-এ আদিত্য ওহদেদার লিখছেন, 'এই মুদ্রিত প্রবন্ধটি অবলম্বন করেই উদ্ভূত হল প্রথম রবীন্দ্র-দূষণ।' ১২৯১-এর 'প্রবাহ' পত্রিকায় সমালোচক মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'ভারতী পত্রিকায় প্রচারিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রামমোহন রায়' প্রস্তাবের সমালোচনা'য় লিখলেন, 'আজকাল অনেকেরই মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যশঃকীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার কোনো ত্রুটি বা দোষের বিষয় উল্লেখ করিতে গেলে, তাঁহার স্তুতিবাদকদিগের নিকটে দোষপ্রদর্শককে অপ্রিয় হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা রবীন্দ্রবাবুরও দুঃখিত ও বিরক্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই সকল বুঝিয়াও যে আমি এই অপ্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজকে দোষ হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা ভিন্ন আরে কিছুই নহে।'

মহেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি 'দুষ্প্রবৃত্তি'-র উল্লেখ করেন। প্রথম, রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের চরিত্রহননে লিপ্ত হয়েছেন, রামমোহনকে 'অনুদার মতাবলম্বী' বলেছেন এবং 'চতুরতাপূর্বক জগৎবিখ্যাত রামমোহনের নাম লোপ' বলতে উদ্যত হয়েছেন। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচক কুম্ভীলকবৃত্তির অভিযোগ আনেন। 'উদাহরণ, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভাব ও ভাষা চুরি করেছেন। যথা, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে [রামমোহনকে] রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষের বঙ্গসমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" আর অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন, "তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার নয়। তুমি একটি সুস্থির মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ অতএব তুমি তোমার রাজা।" এই জাতীয় সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কুম্ভিলতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।' তৃতীয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে 'অদ্ভুত' করে তুলেছেন। মহেন্দ্রনাথ লিখিলেন, "কবি রবি সুসংস্কৃত পদাবলীর সহিত গ্রাম্যতা দোষপূর্ণ শব্দ একত্র ব্যবহারপূর্বক বঙ্গভাষাকে কিরূপ অদ্ভুত পদার্থ করিবার চেষ্টায় আছেন তাহা দেখুন।" —এই বলে তিনি 'দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করলেন সেই সব কিছু বাক্য যাতে রবীন্দ্রনাথ 'ঢের', 'খুঁটিনাটি', 'হাঁসফাঁস', 'গড়িয়া-পিটিয়া', 'বানাইতে' প্রভৃতির মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন।'

নভেম্বর, ১৮৮৬, অর্থাৎ, ১২৯৩-এর কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ। 'নবজীবন' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সংখ্যায় সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য' ব্যঙ্গ করে

'কাব্যি-সমালোচনা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখলেন, 'কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমি তো বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়ব, সুদৃষ্ট-ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বল-বর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও তো ছায়াময়ী নহে, তবে তোমরা এরূপ কুয়াশার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্যে গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করতেছ কেন? ...তোমাদের গুরুভক্তি ধন্য; তোমাদের মহাগুরুর আদর্শ—তোমাদের কবিতার সর্বত্রই বিরাজমান। তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন কাব্য, ন কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।'

নামহীন এক সমালোচক 'প্রচার' পত্রিকায় 'সমালোচন বিভ্রাট' নামক নাট্যাকারে লিখিত এক সমালোচনায় লিখলেন—

"রঘু। ওতো কবিতাই হল না—'সজনি' নেই, 'জোছনা' নেই, 'বাঁশী' নেই, 'স্বপন' নেই, 'কি-যেন-কি'—আর ওর সবই তো বুঝতে পাল্লেম।

কানাই। বুঝতে পাল্লেন—তাতে দোষ হল কি? সেটা তো বোধ হয় ভালোই হল।

রঘু। আজ্ঞে না মহাশয়। প্রকৃত কবিতা—হৃদয়ের কবিতরা যে কি তা আপনারা মোটেই বোঝেন না, তাই এমন কথা বলচেন।

কানাই। তবে কি আপনি বলতে চান, যা বুঝতে না পারা যায় সেগুলোই ভালো কবিতা?

জগু। অনেকটা তাই বটে, (রঘু বাবুর প্রতি) কি বল?

রঘু। নিশ্চয়ই তাই।"

রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্তে এরপর অবতীর্ণ হন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন 'রাহু' ছদ্মনামে 'মিঠে-কড়া' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গাত্মক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'কড়ি ও কোমল'-এর প্যারডি রচনা করে লিখলেন—'উড়িসনে রে পায়রা কবি / খোপের ভিতর থাক ঢাকা / তোর বক্‌বকম আর ফোঁস ফোঁসানি / তাও কবিত্বের ভাব মাখা!' 'কবির লেখনি অগ্রে / কি জানি কি শক্তি এ যে! / গাছে গাছে নেচে নেচে / ভ্রমিতেছ যার তেজে!!' 'না হয় না হবে মানে / রস চাই—কবিতার। / মিষ্টি হলে বেঁচে যাই / ভাবনা থাকে না আর!' 'ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ / বঙ্গের আদর্শ কবি। / শিখেছি তাঁহারি দেখে / তোরা কেউ কবি হবি?' / 'আয় তোরা কে দেখতে যাবি / ঠাকুরবাড়ীর মস্ত কবি / হায়রে কপাল, হায়রে অর্থ, / যার নাই তার সকল ব্যর্থ।'

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'। এই কবিতাটির প্যারডি করে লেখা হয় 'হাতী-ঘোড়া'। লেখক, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রবীন্দ্র-বিদূষণের আদর্শে অনুপ্রাণিত খগেন চাটুয্যে। তাঁর মূল আক্রমণের বিষয় ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ভাব ও অর্থহীজন একটা অসার বস্তুমাত্র'। প্যারডিটির প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরকম—'হাতীর শালে বাঁধা রাজার হাতী / সে ঘাস জল খায় হেথা। / ঘোড়াটি বাঁধা ঘোড়ার শালে, / সহিস শোয় রাতে সেথা। / হাতীকে ভোরে ফাঁকে নিয়ে যেত, / টহল দিতে ঘোড়াটিও যেত, / বেড়িয়ে এসে তারা দানা খেত, / দানার সাথে কচি পাতা। / হাতীর শালে বাঁধা রাজার হাতী / সে ঘাস জল খায় হেথা। / বাড়ীর ছাদে রোদ নেমেছে ওই, / চড়িয়ে জিন ঘোড়া সাজে, / মাহুত হাতী নিয়ে আগে চলে, / গলায় ঘন্টা ধীরে বাজে।'

এই প্যারডির শিরোনামে একটি টিপ্পনি মুদ্রিত হয়—"কবি হতে সাধ যায়; কিন্তু ক্ষমতা কৈ? কাজেই কারো নকল করা আবশ্যক। ঈশ্বর গুপ্তের মতো অ্যান্টিকোয়েটেড কবির নকল করতে আমি রাজী নই। আমি আজকালকার দিনে কবি হব, কাজেই এখনকার কোনো সুকবিকে নকল করতে হবে। হেম-নবীন নিভে গেছেন অনেক দিন, এক রবি এখন কিরণ দিতে পাচ্ছেন, কাজেই তাঁকেই নকল করা উচিত। তাঁর এতদিনের সাধনার ধন 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (সাধনা, ১ম বর্ষ, ২য় ভাগ, আষাঢ় সংখ্যা দেখ) নকল করার জিনিসও বটে, কারণ কোনো মহাকবি আর কখনো এমন কবিতা লেখে নাই, লিখবেও না; কাজেই আমার অরিজিনালিটি বজায় থাকবে। এই মনে করে আমি তারই নকলে কবিতা লিখেছিলাম। আজ তাই ছাপালেম। আমার কবিতা আসলের সঙ্গে কেমন মিলেছে, তাই দেখাবার জন্যে আসলও ছাপালেম—উদ্দেশ্য, রবিবাবুকে যখন পাবলিকে 'সুকবি' বলে, তখন আমিও তাই, এইটে প্রমাণ করব।"

ফলে, বোঝাই যাচ্ছে, তৎকালীন পাঠকসমাজ রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন। নিজের দেশের মানুষ যে তাঁর সাহিত্যসম্পদের প্রকৃত কদর না করে, যুক্তিহীনভাবে সেই সাহিত্য বোঝার বিনা প্রচেষ্টায় অত্যন্ত কদর্য ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় ব্রতী ছিলেন—সেই আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন। তাই, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে 'আত্মপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি।'

কিন্তু যে-সময় রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র এই ১০৭ সংখ্যক চিঠি লিখছেন, সেইসময়েই প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন যে, 'অনাদৃত' কবিতায় জেলেটি তার জালে-ওঠা 'অপরূপ জিনিষ' যাকে সমর্পণ করেছিল, সে যেমন তার মূল্য বুঝতে পারেনি, কারণ 'সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিষ কখনও দেখে নি।' সে ভেবেছিল 'এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এককথায় এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়—এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না।' ঠিক তেমনই, সমকালের পাঠক তাঁর কাব্যমূল্য না বুঝলেও, গীতিকবিতার ধারায় 'অপূর্ব' রবীন্দ্র-কবিতার সমাদর না করলেও, একদিন দেশ-বিদেশে তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃত হবে।

এই চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, নোবেল-প্রাপ্তির তখনও অনেক দেরি। কিন্তু নোবেল পুরস্কার-ই তো রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিল! ১৮৯৩-এ তাঁর কবিতা প্রাপ্য সম্মান না পেলেও কুড়ি বছর পর 'পস্টারিটি'-ই এসে তাঁকে উপহার দিয়েছিল জয়মাল্য।

১৬.৯ ১০৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'দেউল' কবিতাটির মূল পাঠ

'সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা ... টের পাওয়া যায়।' : 'মন্দিরের কবিতা' কবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'দেউল' কবিতাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গ আলোচনার আগে মূল 'দেউল' কবিতাটি পাঠ করা যাক্ :

দেউল।

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি'।

রাখি নি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার,
ভুধর হ'তে পাষাণ ভার
যতনে বহি' আনি'
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসাায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়ে বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনক-মণি-পাত্রপুটে,
সুরভি ধূপ-ধুষ উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে,
পরাণ উঠে মাতি'
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্ন সম চমৎকার
কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরণ, কত আকার
কে পারে বরণিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে!

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,

পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত!
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মত লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি' নত,
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত।

ধ্বনিতে এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি'
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি'
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি
গুঞ্জরতি তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন
জানি নে কিছু আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষ-হত
ঊর্দ্ধমুখী শিখার মত,
শরীর খানি মূর্চ্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম স্বরে স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম
অগ্নিময় সর্প সম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি',
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি',
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি',
জাগিছে এক প্রসাদ হাসি
অধর চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।

সরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে,
সরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ হারে,
কি গান আজি উঠিল চারিধারে!

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,

দেবের কর-পরশ লাগি',
দেবতা মোর উঠিল জাগি'
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি'
আঁধার পাখা তুলি'।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি'।

২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯।

১৬.১০ 'দেউল' কবিতার ব্যাখ্যা

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত চোদ্দ স্তবকে বিভক্ত 'দেউল' কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯-এ—'বালিয়া হইতে কটক-পথে'। এই সম্পূর্ণ কবিতাটির মূল ভরকেন্দ্র একটি রুদ্ধদ্বার মন্দিরের রূপকল্প বা image। এটি একটি রূপক কবিতা, যেখানে বহিঃস্তর বা বাচ্যার্থের রূপটি, কবিতার রূপকার্থকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে।

কবিতাটির বহিঃস্তরের বক্তব্যটি এই—কবি বহু বছর ধরে বন্ধদুয়ার দেউল বা মন্দিরে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর আরাধ্য দেবতার পূজা করছিলেন। সেই দেউলের গাত্রে অদ্ভুত নানা ছবি চিত্রিত—যে-ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায়, জীবনের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছবিগুলির যোগ নেই। এমনসময়, হঠাৎ-ই দেউলের ওপর এক প্রচণ্ড বাজ পড়ে। ভেঙে যায় সেই দেউল। সেই পরিস্থিতিতে, পূজারী-কবির মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁর সমস্ত আরাধনা ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু, তার পরিবর্তে, আশ্চর্যজনকভাবে কবি উপলব্ধি করলেন যে, জগৎ থেকে দূরে সরে তিনি রুদ্ধদ্বার দেউলে শুধু দেবতার মূর্তিকেই পুজো করছিলেন। বজ্রপাতে সেই দেউল ভেঙে যাওয়ায়, তিনি সেই দেবতাকেই পেলেন বিশ্বের আঙিনায়।

কিন্তু কী এই কবিতার রূপকার্থ? দেউলে স্থানত্বটুকুই ছিল। সেখানে ছিল দেবতার দেহ বা মূর্তি। কিন্তু সেখানে জীবনের কোনো গতি ছিল না। রুদ্ধদ্বার দেউলে জীবনের গতি ছিল স্তব্ধ। আসলে, সেই দেউলে বসে আরাধ্যদেবতার প্রতি প্রেম, পূজারী-কবির জীবনের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু কবি যখন সেই প্রেমের সঙ্গে জীবনের যোগ অনুভব করলেন, তখনই প্রেমকে জীবনের অগ্রগতির সমার্থক হিসেবে দেখলেন। অর্থাৎ, সেই প্রেম-ই সার্থক, যা মানুষকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। সেই প্রেম কখনোই জীবনের অগ্রগতির পথে বাধাসৃষ্টি করে না।

'জীবনস্মৃতি'-র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমার পনেরো-যোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত ...যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। ...অপরিণত মনের প্রদোষলোকে আবেগগুলা ...পরিমাণবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। ...শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্‌গত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলো বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।'

'আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানোই চলে।'

'তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে-শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেটা অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছু নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শেষপরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না, তাহাকে পুরাপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না, এইজন্য সকলপ্রকার আঘাত আতিশয্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথি। মঙ্গলকর্ম যখন তাহার একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায়, তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে, আনন্দেরও পথ সেই দিকে।'

'জীবনস্মৃতি'র 'সন্ধ্যাসংগীত' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে-অবস্থার কথা পূর্বে লিখিয়াছি, মোহিতবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি 'হৃদয়-অরণ্য' নামের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসংগীতে 'পুনর্মিলন' নমাক কবিতায় আছে—'হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে / দিশে দিশে নাহিক কিনারা, / তারি মাঝে হনু পথহারা। / সে-বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা / সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে / আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।'

'হৃদয়-অরণ্য নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে; কেবল সন্ধ্যাসংগীতে-প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে। ...কাব্য হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না থাকিতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।'

এরই প্রতিফলন দেখা যায় 'জীবনস্মৃতি'-র 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়ে : 'মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাহা সত্য, সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কিনা মূল্য নাই বলিয়া তর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়; ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে। অতএব হৃদয়ের অব্যক্ত আকুতিকে ব্যক্ত করায় পাপ নাই, যত অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে-মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যেখানে মেলে না, সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না, ইহার বর্ণনা নাই, এইজন্য ইহার যে রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে; তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে

অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে; অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্ট ভাষায় সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত হইয়াছে।'

'জীবনস্মৃতি'-র 'প্রভাতসংগীত' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বউঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছি, এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল। একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদু মাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোকে আমি যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজস্ব স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে—তাহা আনন্দময়, সুন্দর। ...সদর স্টীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতো যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। ...শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। ...এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ...মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখ-দুঃখ-আলোক-অন্ধকারে সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে-একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি। ...একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাক দাবি করিতে লাগিল, তখন বাইরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন

ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে রুগ্‌ণ হৃদয়টার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে-সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। সহজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়া যখন পাওয়া যায় তখনই পাওয়া সার্থক হয়। এইজন্য আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।'

রবীন্দ্রনাথ যখন 'দেউল' কবিতা লিখছেন, তার প্রায় আট বছর আগে আত্মহত্যা করেছেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী—১২৯১-এর ৮ বৈশাখ, ইংরিজি মতে, ১৮৮৪-র ১৯ এপ্রিল, রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ বছরের যুবক। 'জীবনস্মৃতি'-র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, '...আমার চব্বিশ বছরের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' কাদম্বরীর সেই আত্মহত্যা আসলে ছিল 'আত্মখণ্ডন'—রবীন্দ্রজীবনে যে-আত্মখণ্ডনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কৃপালনি লিখেছিলেন, 'it did not break him, it made him'। 'মৃত্যুশোকে' তা সুস্পষ্ট করেছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই—'জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া।

'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারি দিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল।

'তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বন্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

'সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড় মনোহর।

ফলে, আলোচ্য ১০৭ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, '...যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র প'ড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধূনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।' তখন বোঝা যায়, ভুবনেশ্বরের কোনো মন্দির দেখে কবি এই কবিতা লিখলেও এর প্রেক্ষাপটে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনসম্ভূত অনুভূতি।

জীবনে যাঁকে ভালোবেসেছিলেন, সেই মানুষটি-যে তাঁর জীবনে অপ্রাপনীয়—এই বোধ রবীন্দ্রনাথকে শৈশব, কৈশোর পার করে যৌবনের প্রারম্ভেও মানসিকভাবে স্বস্থ থাকতে দেয়নি। তাই কবি প্রথমে প্রেমকেই জীবন থেকে নির্বাসিত করে প্রকৃতিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মেলেনি মানসিক স্বস্তি। তখন কবি প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু প্রেমকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু সেখানেও জীবনের সমতা ফেরাতে পারলেন না। অবশেষে যখন প্রকৃতিতেই বিকীর্ণ হল তাঁর প্রেম, তখনই জীবনে এল সামঞ্জস্য, যদিও সেই ভারসাম্যও বিঘ্নিত হল ভালোবাসার মানুষটি মৃত্যুর পরপারে চলে যাওয়ায়। কিন্তু সেই দুঃসহ দুঃখেও, তিনি 'নাই অন্ধকার'-এর মধ্যেই 'আছে আলোক'-এর সন্ধান পেলেন। কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের যে-পালা রবীন্দ্রজীবনে ঘটেছিল, সেটিই রূপকার্থে 'দেউল' কবিতায় প্রকাশিত।

১৬.১১ সারাংশ

'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১০৭ সংখ্যক চিঠির মূল বিষয়বস্তু হল রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ সত্তার কেন্দ্রীভূত সত্তার উন্মোচন। চিঠিতে কথোপকথনের সূত্র ধরে এসেছে 'অনাদৃত' এবং 'দেউল' কবিতার ব্যাখ্যার পাশাপাশি 'নীরব কবি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ধারণা।

১৬.১২ অনুশীলনী

ক. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ১০৭ সংখ্যক চিঠির পত্রপ্রাপক কে? কবে এই চিঠি লেখা হয়েছিল?

২. 'ছিন্নপত্রাবলী'-তে মোট পত্রসংখ্যা কত?

৩. 'আমি জীবনচরিতে বিশ্বাস করি নে।' —কার উক্তি?

৪. 'জাল ফেলা' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে কোন্ শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

৫. 'সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না।' —কোন্ কবিতা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই।' —কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি?

২. 'ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়' —প্রসঙ্গ-সহ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৩. 'আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার।' —পত্রলেখক কেন একথা বলেছেন?

৪. 'নীরব কবি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য পাঠ্য চিঠি অনুসারে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

গ. বিস্তৃত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি' —কোন্ বাড়িটিকে কেন 'রাজার বাড়ি' বলা হয়েছে?

২. 'জাল ফেলা' কবিতাটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

১৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি ও ঋণ স্বীকৃতি

১. 'ছিন্নপত্রাবলী', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬০, নূতন সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৪১০।

২. 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : ১৯১২, সাধারণ সংস্করণ : জৈষ্ঠ্য ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩১১।

৩. 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯৪।

৪. 'সোনার তরী', রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০।

৫. 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), দশম খণ্ড,বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০।

৬. 'আত্মপরিচয়', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : ১ বৈশাখ, ১৩৫০, সংস্করণ : চৈত্র ১৪০০।

৭. 'কবিমানসী' (প্রথম খণ্ড), জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৯, প্রথম ভারবি সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৭।

৮. 'রবীন্দ্রজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৮।

৯. 'রবিজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ, ১৩৯৪।

১০. 'রবীন্দ্র-বিদূষণ ইতিবৃত্ত', আদিত্য ওহদেদার, বোনা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১৮।

১১. 'সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

এই এককে ছিন্নপত্রাবলীর ১০৭ সংখ্যক চিঠির সূত্রে 'দেউল' কবিতাটির যে-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেজন্য বিশিষ্ট রবীন্দ্রসমালোচক শ্রী তপোব্রত ঘোষের কাছে ঋণী।

ইন্টারনেট :

https://www.greekmyths-greekmythology.com/nine-muses-in-greek-mythology

একক : ১৭ ❑ 'ছিন্নপত্রাবলী' : ৮ ও ৫৫ সংখ্যক পত্র

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ প্রস্তাবনা

১৭.৩ 'ছিন্নপত্রাবলী' ৮ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

১৭.৪ 'কবিমানসী'কার জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ

১৭.৪.১ গ্রিক দার্শনিক প্লেটো লিখিত 'সিম্পোসিয়াম' ('Symposium')

১৭.৪.২ প্লেটো লিখিত 'ফিড্রাস' ('Phaedrus')

১৭.৪.৩ ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবিদ্যা

১৭.৫ 'ছিন্নপত্রাবলী' ৮ নং চিঠির বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

১৭.৬ 'ছিন্নপত্রাবলী' ৫৫ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

১৭.৭ ৫৫ নং চিঠির ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ সূত্র

১৭.৮ সারাংশ

১৭.৯ অনুশীলনী

১৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ রচিত পত্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে ছিন্নপত্রাবলীর ৮ নং ও ৫৫ নং চিঠির মূল পাঠ উল্লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই চিঠিদুটির মূলপাঠ গ্রহণ করলে রবীন্দ্রপত্রসাহিত্যের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে যেমন ধারণা করতে পারবেন তেমনই চিঠিগুলিতে উল্লিখিত প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের সূত্রে রবীন্দ্র-কবিমানসে প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৭.২ প্রস্তাবনা

'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৮ সংখ্যক চিঠিটির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা এবং ৫৫ নম্বর পত্রপ্রসঙ্গে পত্রলেখকের সৌন্দর্যচেতনার নিরিখে পত্রোদ্ধৃত নানা প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এই এককটি সজ্জিত।

১৭.৩ 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৮ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

লণ্ডন

১০ অক্টোবর ১৮৯০

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা— তার এত দিকে গতি... এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে - ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতিপদে বলে 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'— তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়, আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখেনে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে— আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে...

কলকাতা। ১৮৯০

১৭.৪ 'কবিমানসী'কার জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ

এই পত্রটির মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ জেনে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেমভাবনার উৎকর্ষ এই পত্রের নানা কথায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর বহুল আলোচিত 'কবিমানসী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ('কাব্যভাষ্য')-র প্রথম অধ্যায়ে 'প্রীতিরতি এরস্-তত্ত্ব লিবিডো ও প্রেমধর্ম' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা এখানে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা বিশ্লেষণ-সূত্রে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম' এবং 'ফিড্রাস'-এর আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার মুখ্য তাত্ত্বিক অংশটি এখানে পরিবেশিত হল :

১৭.৪.১ গ্রিক দার্শনিক প্লেটো লিখিত 'সিম্পোসিয়াম' ('Symposium')

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'সিম্পোসিয়াম' ও 'ফিড্রাস' সংলাপে প্রেমের উদ্ভব ও বিবর্তনের কথা বলেছেন। প্লেটোর প্রেমতত্ত্বের নাম এরস্তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা বোঝার ক্ষেত্রে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম' ('Symposium') বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'সিম্পোসিয়াম' আসলে গ্রিক প্রেমদেবতা এরস (Eros)-এর বন্দনা। 'সিম্পোসিয়াম'-এ এই এরস-এর প্রশস্তি রচনাই ছিল প্লেটোর উদ্দেশ্য। ট্রাজিক কবি আগাথনের নাট্যসাফল্য উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে আহূত একটি ভোজসভায় সবাই প্রেম বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রেমের স্বরূপ এবং মানবজীবনের তার বিচিত্র প্রভাব। প্রথম বক্তা ছিলেন ফিড্রাস আর সক্রেটিস ছিলেন সর্বশেষ বক্তা। মধ্যবর্তী বক্তাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কমিক কবি অ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes) আলোচনা শুরু করলেন একটি মজার গল্প দিয়ে। কী সেই গল্প?

অ্যারিস্টোফেনিস জানালেন, মানুষের যে-স্বাভাবিক চেহারা দেখতে আমার অভ্যস্ত, প্রাচীনকালে তা ছিল না। তখন তিনটি লিঙ্গ ছিল—পুরুষ, স্ত্রী এবং অর্ধনারীশ্বর। মানুষের দেহাকৃতি এখনকার মতো খাড়া ছিল না, বরং ছিল গোলাকার। তাদের অস্তিত্ব ছিল জোড়ায় জোড়ায়। অর্থাৎ, দুজন পুরুষ মিলে একটি জুটি, দুজন স্ত্রী মিলে একটি জুটি এবং একজন পুরুষ ও একজন নারী মিলে অর্ধনারীশ্বর জুটি—সোজা কথায়, যুগল-পুরুষ, যুগল-নারী এবং যুগল নারী-পুরুষের অস্তিত্ব ছিল তখন। যেহেতু তারা ছিল জোড়ায়, স্বাভাবিকভাবেই তাদের ছিল চারটে হাত, চারটে পা এবং দুটি করে যৌনাঙ্গ। প্রতিটি জোড়া ছিল অপরিমিত শক্তির অধিকারী।

এহেন জোড়ায়-অবস্থানকারী মানুষরা একদিন ঠিক করল স্বর্গ দখল করবে। কিন্তু দখল করতে চাইলেই তো আর দখল করা যায় না! তাই, স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে ওই সমস্ত মানুষদের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বজ্রের দেবতা জিউস-সহ স্বর্গের অন্যান্য দেবতারা সভা ডাকলেন। প্রথমে তাঁরা ভেবেই পেলেন না, এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলা ঠিক কীভাবে করবেন। কারণ, দৈত্যদের বজ্রের আঘাতে মেরে ফেলা সম্ভব হলেও, মানুষকে তো নিধন করা যাবে না—করলে, দেবতারা মানুষের কাছ থেকে পুজো পাবেন কী করে? অনেক ভেবে বজ্রের দেবতা জিউস একটি উপায় ঠিক করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, এইসমস্ত মানুষদের তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন ঠিকই, কিন্তু তাদের শক্তি হ্রাস করবেন তিনি।

সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বজ্রের দেবতা জিউস প্রত্যেক জোড়া মানুষকে বজ্র দিয়ে মাঝ-বরাবর কেটে আলাদা করে দিলেন। তখন কী হল ? না, মাঝবরাবর কেটে ফেলার ফলে পরস্পরের দিকে বাহু মেলে এক অর্ধ অন্য অর্ধকে আলিঙ্গন করতে চাইল। অর্থাৎ, প্রত্যেক টুকরোই তার অর্ধাংশের সন্ধান করতে থাকল।

সোজা কথায়, তখন, পুরুষ-জুটির একজন অন্য পুরুষকে খুঁজতে শুরু করল, নারী-জোড়ার এক নারী অন্য নারীর সন্ধানে ব্যাপৃত থাকল। আর, অর্ধনারীশ্বর জুটির এক পুরুষ সন্ধান শুরু করল অন্য নারীর। আদিতে যারা ছিল পুরুষ-পুরুষ জুটি, সেই জুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে, একজন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করল, সেই সমকামিতা যে নির্লজ্জতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, তা নয়। বরং, তারা পুরুষোচিত, শৌর্যশালী, বীর্যশালী হয়ে উঠবে বলেই, পুরুষের অন্বেষণ করতে থাকল। কাজেই, বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন গ্রীসে, পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালোবাসাকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ প্লেটোনিক প্রেম বলতে বোঝানো হয়েছে দুটি পুরুষের প্রেমকেই।

আদিতে যারা ছিল নারী জুটি, সেই জুটির এক নারী অন্য নারীর সন্ধান করতে থাকল। আর, অর্ধনারীশ্বর জোড়ার ক্ষেত্রে, পুরুষ সন্ধান করল নারীর, আর, নারী সন্ধান করতে থাকল পুরুষের।

এই-যে প্রতিটি জুটির এক অর্ধাংশ আর-এক অর্ধাংশের সন্ধানে লিপ্ত হল, এটাকেই প্লেটো বলছেন ভালোবাসা।

অর্থাৎ, দেহকে মাঝ-বরাবর কেটে ফেলার ফলে প্রত্যেক অর্ধাংশ তার অপর অর্ধাংশের কাছে চাইছে আদিম পূর্ণতা। শুধু শারীরিকভাবে পরস্পরকে ভোগ না করের তারা ফিরে যেতে চাইছে প্রত্ন বা আদি ভালোবাসার সন্ধানে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো এই আত্মিক উত্থানের কাহিনি বলছেন শারীরিক কামনাকে মেনে নিয়েই। তাঁর বক্তব্য, দেবতার অভিশাপ নস্যাৎ করে আমরা আমাদের প্রত্যেক অর্ধাংশকে পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে-যে তার সঙ্গে মিলতে চাইছি, সেই চাওয়া-ই হল ভালোবাসা বা প্রেম। মিলতে যে পারা যাবেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সেই অনুসন্ধান চলবেই। এরই নাম প্রেম।

'কবিমানসী'কার জগদীশ ভট্টাচার্য লিখছেন, 'মানুষের এই আদিম যুগ্মসত্তার কল্পনা হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই। কিন্তু এর মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে। এই মর্ত্যলোকের প্রেমিক তার প্রাণের দোসর তার 'মনের মানুষ'কে খুঁজে বেড়ায় সেই মনের মানুষকেই সে ভালবাসে। তারই নাম প্রেম।'

ফলে, 'প্লেটোনিক প্রেম' সম্পর্কে চণ্ডীদাসের যে-প্রচলিত বুলি—'প্লেটোনিক প্রেম নিকষিত হেম / কাম-গন্ধ নাহি তায়।।' —এটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কারণ, প্লেটোনিক প্রেমের মূলে কাম থাকবেই থাকবে। কাম না থাকলে, তার প্রেমে উত্তরণ অসম্ভব। রোম্যান্টিসিস্টদের সূত্রে প্লেটোনিক প্রেমের যে নবরূপায়ণ ঘটেছিল, তাকেই প্লেটো বিশেষজ্ঞের মধ্যে অন্যতম এ.ই. টেলর বলেছেন, সবচেয়ে 'un-platonic'। অর্থাৎ, কামগন্ধহীন প্রেমের কল্পনা আসলে প্লেটোর কল্পনা নয়। প্লেটোনিক প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ হল কামের ঊর্ধগতিপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ অবস্থা। কাম সেখানে 'a steppingstone'।

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে Thomas Taylor 'সিম্পোসিয়াম'-এর প্রথম ইংরিজি অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় অনুবাদ করেন শেলি, যদিও সেটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি—১৮৪০-এ সম্পাদিত আকারে তার প্রকাশ ঘটে। পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে আরও পরে—১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, কয়েক দশক ধরে যেটি হয়ে উঠেছিল 'সিম্পোসিয়াম'-এর স্বীকৃত ও গ্রাহ্য অনুবাদ।

শেলি-ই প্রথম বিশুদ্ধ প্লেটোনিক প্রেমের পাশাপাশি রোম্যান্টিক প্লেটোনিজমকে আনলেন। রবীন্দ্রনাথ এই রোম্যান্টিক প্লেটোনিজমকেই বলেছেন রোম্যান্টিক প্রেম। কী পার্থক্য এই বিশুদ্ধ আর রোম্যান্টিক প্রেমের? বিশুদ্ধ প্লেটোনিক প্রেম ছিল সমকামের, আরো, নির্দিষ্ট করে বললে, দুটি পুরুষের প্রেম-ই ছিল বিশুদ্ধ প্লেটোনিক প্রেম। আর, রোম্যান্টিক প্লেটোনিজম বা রোম্যান্টিক প্রেম বলল বিপরীতকামের কথা। অর্থাৎ, একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রেম-ই হল রোম্যান্টিক প্রেম।

১৭.৪.২ প্লেটো লিখিত 'ফিড্রাস' ('Phaedrus')

প্লেটো তাঁর 'ফিড্রাস' নামক সংলাপে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য দুটি রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম রূপকটি আসলে পক্ষবান আত্মার কল্পনা। আর, দ্বিতীয় রূপকে মানুষের আত্মাকে যুগল-অশ্ববাহিত একটি রথের সারথিরূপে কল্পনা করলেন প্লেটো।

প্রথম রূপকের ক্ষেত্রে প্লেটো জানালেন, মানুষের আত্মা একসময় ছিল পক্ষবান—ডানাওয়ালা। সেই পক্ষবান আত্মা ঘুরে বেড়াত স্বর্গের আশেপাশে। একদিন তাদের পক্ষ ছিন্ন হওয়ায় তারা ওড়ার শক্তি হারিয়ে নেমে এল এই মর্তপৃথিবীতে। তারপর থেকে সেই স্বর্গচ্যুত আত্মা, পৃথিবীতে কোনো মর্ত্যসৌন্দর্যের সন্ধান পেলেই, স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে। তখন ধীরে ধীরে তাদের আবার পক্ষ উদ্ভূত হতে থাকে। আকাশে ওড়ার শক্তি আবার ফিরে পায় তারা।

দ্বিতীয় রূপকে, প্লেটো-কল্পিত রথের বাহক দুটি অশ্বের একটি হল জৈব কাম বা Vulgar Eros। অন্যটি হল দিব্য কাম বা Divine Eros। জৈব কাম চায় বিপথে চালিত হতে। দিব্য কাম মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে। রথের বাহক দুই অশ্ব যদি পরস্পর বিপরীতগামী হয়, তাহলে যেমন সারথির দায়িত্ব থাকে সেই দুই ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রিত করে অগ্রসর হওয়ার; ঠিক তেমনি, মানুষ যখন তার জীবনে এই জৈব কাম ও দিব্য কামের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তখনই সে তার অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়।

কাকে বলে জৈবকাম? মানুষের জৈবিক যৌন চাহিদা যখন শারীরিক সুখভোগ ও পরিতৃপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তখনই তা জৈব কাম। আর দিব্যকাম কী? যে-কাম-এর প্রভাবে, কোনো একটি বিশেষ শারীরিক সৌন্দর্যের (beauty) প্রতি আকর্ষণ, অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে ঊর্ধগতিপ্রাপ্ত হয় এবং তা মানুষের মনে এক নির্বিশেষ সৌন্দর্য (Beauty)-র আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে, সেটিই হল দিব্য কাম।

'ফিড্রাসে প্লেটোর মূল বক্তব্য সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মূল বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, যৌন বাসনার সুগতি ও দুর্গতিও যে ফিড্রাসের বিষয়ীভূত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। প্রেম কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার ফল আমাদের জীবনে শুভংকর না অশুভংকর—এসব প্রশ্ন সেখানে উত্থাপিত হয়েছে এবং প্লেটো সক্রেটিসের বাচনিকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ফিড্রাসে সক্রেটিস বলছেন, প্রেম নিশ্চয়ই এক ধরনের বাসনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুটি নিয়ন্ত্রী শক্তি আছে। মানুষ এই দুটি শক্তির অনুশাসনেই পরিচালিত হয়। একটি হল সুখের জন্য সহজাত বাসনা, অপরটি হল শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলের জন্য বাসনা—এই দ্বিতীয় বাসনাটি মানুষের সহজাত নয়, তাকে বিচারের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। মানুষের সহজাত আত্মরতি বা আত্মসুখের বাসনা যেখানে বলবৎ সেখানে প্রেমর পাত্র "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য।" ...কিন্তু সত্যকার প্রেম হল একটি ঐশ্বরিক চেতনা। প্রেমের মধ্যে উন্মত্ততা আছে, কিন্তু সে উন্মত্ততা ক্ষেমংকর। ...মহৎ কাব্যরচনা যেমন ঐশ্বরিক প্রেরণাসঞ্জাত উন্মাদনা, তেমনি মহৎ প্রেমও দিব্যোন্মাদনা। ...প্লেটো বলেছেন, এই দিব্য প্রেরণা ছাড়া যেমন সত্যকার কাব্য রচিত হতে পারে না, তেমনি প্রেমের দিব্য প্রেরণা ছাড়াও মানুষ পৃথিবীতে সত্যকার মহৎ কোন ব্রতে ব্রতী হতে পারে না।' ('কবিমানসী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬)

প্রেমের বিচিত্র রহস্যে আছে কয়েকটি সোপান পরম্পরা। 'সুপথে পরিচালিত হলে এই রহস্যজাল ভেদ করে জীবনের একটি পরম তত্ত্বে প্রেমিক উপনীত হয়। আর তাই হল আত্মিক প্রেমের চূড়ান্ত পরিণাম। বিচিত্র থেকে পরম একে, সীমা থেকে অসীমের চেতনায় এই প্রেম-পরিক্রমার কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হবে। প্রথমে একটি সুন্দর দেহকে ভালবাসা। তারপরে এই বিশ্বাস যে, প্রতিটি সুন্দর দেহের মধ্যে একই চিরসুন্দর প্রকাশিত। এই অনুভূতির ফল সুন্দর দেহমাত্রকেই ভালবাসা। তার পরের স্তরে এই বিশ্বাস যে, প্রতিটি সুন্দর দেহের মধ্যে একই চিরসুন্দর প্রকাশিত। এই অনুভূতির ফল সুন্দর দেহমাত্রকেই ভালবাসা। তার পরের স্তরে এই বিশ্বাস যে, দেহের সৌন্দর্যের থেকে আত্মার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ অনেক বেশি। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মিক সৌন্দর্যের অনুশীলন এবং তজ্জনিত জ্ঞানই পরবর্তী স্তর। এইভাবে নিঃসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রের সন্ধান এবং সর্বশেষ স্তরে পরম-সুন্দর ও পরম-শিবের চেতনায় এক এবং অদ্বিতীয় সত্যের পরা-জ্ঞানই প্রেমচর্যার শেষ কথা।' (তত্রৈব, পৃ. ৩১)

অর্থাৎ, সীমা থেকে অসীমের চেতনায় এই প্রেম-পরিক্রমার স্তরগুলি ক্রমান্বয়ে কীরকম? প্রথম স্তরে বিশেষ কোনো এক নারীর দেহসৌন্দর্যে (beauty) কোনো এক পুরুষ মুগ্ধ হলেন, তাঁর কামবাসনা জাগল। কিন্তু তিনি দেখলেন, বাস্তবে তাঁর সেই কামবাসনার পরিতৃপ্তি অসম্ভব। তখন দ্বিতীয় স্তরে তিনি সমগ্র পৃথিবীর দিকে

তাকালেন, দেখলেন, সেই নারীকে ভালোবেসেছেন বলেই এই নিসর্গ প্রকৃতিও তাঁর কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। তৃতীয় স্তরে এসে সেই প্রেমিকের মনে এই সন্দেহ জাগল যে, পৃথিবীতে সুন্দরের পাশাপাশি অনেক অসুন্দর-ও আছে। তাহলে পৃথিবী কি সত্যই সুন্দর? চতুর্থ স্তরে পৌঁছে প্রেমিক বুঝতে পারলেন যে, দুই-দুই বিপরীতের মেলবন্ধনেই এই পৃথিবী সুন্দর। তাই পৃথিবীতে আলোর পাশাপাশি সহাবস্থান করে অন্ধকার, সাদার পাশাপাশি কালো। এরপর পঞ্চম স্তরে প্রেমিকের মনে হল, বাস্তব এই পৃথিবীই যদি এত সুন্দর হয়, তাহলে এই বিশ্বস্রষ্টার মনে পৃথিবী নির্মাণের যে-ভাবনাটি ছিল, সেটি আরও কত-না সুন্দর! অর্থাৎ, এই পঞ্চম স্তরে, একটি লোকোত্তর বা ধ্যানগত সৌন্দর্যচেতনায় উপনীত হলেন সেই প্রেমিক। আর, প্রেম-পরিক্রমার সর্বশেষ স্তর, ষষ্ঠ স্তরে পৌঁছে, প্রেমিকপুরুষটি সেই ধ্যানগত সৌন্দর্যে (Beauty) লীন হয়ে গেলেন।

জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে তাই লিখছেন, 'প্লেটোনিক প্রেমচর্যা উন্নততর জীবনচর্যারই নামান্তর। তার রয়েছে বিচিত্র সোপান-পরম্পরা। কিন্তু এর সর্বশেষ স্তরে অসীমের কোটিতে পৌঁছে প্রেমের দৃষ্টিতে চিরসুন্দরের অনুধ্যানই প্লেটোনিক প্রেমধর্মের পরমতত্ত্ব। বলাই বাহুল্য, এই প্রেমতত্ত্ব, যার অন্য নাম এরসতত্ত্ব, তা দার্শনিক প্লেটোর জীবনতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত।'

১৭.৪.৩ ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবিদ্যা :

প্লেটোর এরস-তত্ত্বই বিংশ শতাব্দীতে 'লিবিডো' (Libido) তত্ত্বরূপে দেখা দিল সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ-বিদ্যায় (Phycho-analysis)। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণে মানুষের মনের তিনটি স্তর—সংজ্ঞান, নির্জ্ঞান ও আসংজ্ঞান। মনের যে-অংশ সম্পর্কে আমরা সচেতন, সেই স্তর হল সংজ্ঞান। যে-অংশ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়, সেটি হল নির্জ্ঞান। আর, যা ঠিক কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের সংজ্ঞানস্তরে নেই, অথচ, সামান্য প্রচেষ্টাতেই আমরা তাকে সংজ্ঞানে আনতে পারি, তাই হল আসংজ্ঞান। সংজ্ঞান মনের তুলনায় নির্জ্ঞান স্তর আয়তনে বৃহৎ এবং তা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের সংজ্ঞান স্তর আসলে নির্জ্ঞান থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু সেই নির্জ্ঞান স্তরের শক্তির সন্ধান পাওয়া মুশকিল। এই নির্জ্ঞান স্তরের গোপন শক্তির আবিষ্কার ও অনুসন্ধানই মনঃসমীক্ষণের মুখ্যকৃত্য।

মানুষের মনের মতো, মানুষের ব্যক্তিত্বের-ও তিনটি স্তর—ইদং বা অদস্, অহং এবং অধিশাস্তা। কী এই তিনটি স্তরের অর্থ? প্রতিটি মানবশিশু জন্মগ্রহণ করার সময় কিছু সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct নিয়ে জন্মায়। সেই প্রবৃত্তিগুলিই শিশুমনের মানসিক জীবনের আদি উপকরণ। মনের এই আদি অবস্থাকেই ফ্রয়েড বলেছেন Id। শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়, তখন এই ইদ-এর যে-অংশ ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে পরিবেশের সংস্পর্শে আসে এবং বহির্জগতের নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করিয়ে দেয়, তাকেই ফ্রয়েড বলেছেন Ego বা অহং। ইদ চায় আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ। কিন্তু অহং পরিবেশ সচেতন হয়ে তাকে ক্রমাগত বাধা দেয়। ফলে, ইদ এবং অহং-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আর, অধিশাস্তা কী? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্বে অহং-এর যে-অংশ নিজেই নিজেকে শাসন করে, তাকেই বলে অধিশাস্তা বা Super-ego। এই স্তরই হল মানস বিবর্তনের চূড়ান্ত স্তর।

মনোসমীক্ষকরা মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিত্বের এই তিনটি স্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হল ইদ, অর্থাৎ, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে দুটি প্রধান—ক্ষুৎপিপাসা এবং রিরংসা, ভারতীয় মতে, এরই নাম হল শিশ্নোদর-পরায়ণতা। তবে, ইদ-এর আদিম প্রবৃত্তিগুলি শুধুই শিশ্নোদর-পরায়ণ, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ফ্রয়েড এই আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—বন্ধনস্থাপন ও বন্ধনছেদনের

প্রবৃত্তি। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এই বন্ধনছেদনের প্রবৃত্তিকেই বলা হয়েছে 'এরস' এবং সেই এরস-এর শক্তিই ফ্রয়েডীয় নামকরণে Libido বা কামশক্তি।

এই লিবিডো বা কামশক্তির লীলা মানবমনে আশৈশব ক্রিয়াশীল। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই কামভাবের উদ্ভব। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ তার যৌনবিকাশের পক্ষে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। তাই, সেইসব যৌনচিন্তা মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তি যখন সহজ চরিতার্থতার পথে বাধা পায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই প্রবৃত্তি যদি মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়, তখন অতৃপ্ত কামনার তাড়না ভোগ করতে হয় না। নির্জ্ঞান স্তরে সহজাত প্রবৃত্তির এই নির্বাসন-ই হল অবদমন বা repression এবং মানুষ মূলত তার কামপ্রবৃত্তিকেই অবদমিত করে। কিন্তু সেই অবদমন যখন মানুষের মনে বিকার সৃষ্টির পরিবর্তে কোনো সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে গৌণভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই তাকে বলা হয় কামের উদ্‌গতি বা sublimation।

মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনার উদ্‌গতি সবসময় সমান হয় না। এমনকি, অবদমিত কামশক্তির সমস্তটাই যে উদ্‌গতি লাভ করতে পারবে, এমনও নয়। ফ্রয়েডের মতে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, অতৃপ্ত কামাবেগের অতি সামান্য অংশই উদ্‌গতিপ্রাপ্ত হয় এবং অবদমিত বাসনাত উদ্‌গতি-ক্রিয়াতেও কামশক্তির কিছু অংশ আদিম প্রবৃত্তির সুস ও স্বাভাবিকপথে চরিতার্থতা লাভ করে।

'সিম্পোসিয়াম'-এ প্লেটোর এরস্ তত্ত্বই সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লিবিডো বা কামতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। প্লেটো যাকে বলেছেন মানুষের জীবনে দিব্য-এরসের লীলা, ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় সেটিই হল কামশক্তির উদ্বর্তন বা উদ্‌গমন।

১৭.৫ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৮ নং চিঠির বিশ্লেষনাত্মক পাঠ

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখছেন ১০ অক্টোবর, ১৮৯০-এ। চিঠিটি শুরুই হচ্ছে, 'মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের গতি এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানাতার এত দিকে গতি... এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে-ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ।'

কেন রবীন্দ্রনাথ চিঠির গোড়াতেই এইকথা বললেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে চিঠিটি লেখার প্রেক্ষাপটে। কী সেই প্রেক্ষাপট? রবীন্দ্রনাথ তখন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ইংল্যাণ্ডে আছেন। তিনি বারবার বিলেত থেকে ফিরে আসতে চাইলেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রতিহত করেছেন। কিন্তু, ১৮৯০-এর ৭ অক্টোবর ভারতে ফেরার জাহাজে আসন নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এলেন। স্বভাতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিনলিপিতে সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'রাত্তির দুটো পর্যন্ত আমার দেশে ফেরা সম্বন্ধে সমালোচনা করা গেছে।'

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও মানবজীবনে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো উক্তির সঙ্গে ফ্রয়েডীয় চিন্তাভাবনার আশ্চর্যজনক কিছু সাদৃশ্য থাকলেও, একথা বলা যাবে না যে, রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই কথা বলেছিলেন। কারণ প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রয়েড সমসাময়িক হলেও, ফ্রয়েডের চিন্তা পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা তাঁর ব্যক্তিজীবনসম্ভূত।

'ছিন্নপত্রাবলী'-র এই আট সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে প্রবৃত্তিকে বলেছেন, 'জীবনের গতিশক্তি'। তারপর বলেছেন, প্রবৃত্তিই জীবনীশক্তি। এই জীবনীশক্তিই মানুষের জীবনের একমাত্র পাথেয়। সেই প্রবৃত্তি মানুষকে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তোলে। আসলে সেক্সুয়ালিটি বা যৌনতা-যে নর-নারীর সম্পর্কের খুব সামান্য একটা অংশ, যা শুধু সৃজনক্রিয়ার সহায়ক—সেই আঙ্গিকে দেখলে সেক্সকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা হয়। সন্তানসৃজন এবং দেহের ক্ষণিক আনন্দ-উপভোগেই তার পরিসমাপ্তি। আসলে, জৈব কাম বা Vulgar Eros-এর কাজই তাই। কিন্তু যদি বৃহত্তর অর্থে ভাবা যায়, তাহলে এই যৌনতারই একটি অপরিসীম শক্তি আছে—অনবরত যে-শক্তির নিঃসরণ ঘটে মানবমনে, যে-শক্তি আসলে দিব্য কাম বা Divine Eros থেকে জাত।

তাই, এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে।' যে-প্রবৃত্তি আমাদের জীবনের মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, সেই প্রবৃত্তি আসলে জৈব কাম। আর, যে-প্রবৃত্তি আমাদের জীবনীশক্তির সহায়ক হয়ে জীবনের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়, তাই-ই হল দিব্য কাম। এইকারণেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, মানুষ পথিক এবং 'প্রেম'-ই তার 'পথের আলো'।

মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির দান যদি শুধু নেতিবাচক-ই হত, তাহলে, মরুভূমিতে-লীন-হয়ে-যাওয়া নদীর মতোই, মানুষের জীবন হত দিকশূন্য। ছন্নছাড়া। অসফল। কিন্তু তা নয় বলেই, 'প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি'কে ধারণ করে মানুষ দিব্য কামের প্রভাবে জীবনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা রাখে বলেই, সমুদ্রে-লীন নদীর মতো তার যাত্রা হয় সার্থক। জীবন হয় সর্বাঙ্গসুন্দর।

কিন্তু প্রতিটি মানুষ-ই কি দিব্য কাম-এর দ্বারা পরিচালিত হতে পারে? না। দিব্য কাম ধারণের শক্তি সকলের নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই', সে কেমন? 'সে জীবনে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।'

১৭.৬ 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৫৫ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

শিলাইদহ

বুধবার, ২ আষাঢ়। ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ করে এল।... কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না— জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না।— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে

অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়— সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন-ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে— ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়— তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে— এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি— অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়— এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।... যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব— এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে— বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায়

না। কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি! পরিপাটি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা করে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী সুন্দর অরাজকতা নেই! কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি— কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে— কনভেন্‌শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়— তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য— হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।...

পুঃ— আসলে যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই— ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জুড়ব না— কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

কলকাতা ১৬ জুন? ১৮৯২

১৭.৭ ৫৫ নং চিঠির ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন প্রসঙ্গসূত্র

ক) 'মেঘদূত লেখার পর থেকে ... নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস!'

এই সূত্রে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'। সেখানে অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।'

অর্থাৎ, নিতান্ত শিশুকাল থেকেই কালিদাসের 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনাকে বিচিত্ররূপে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। তাই, রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নানা পর্বে, তাঁর কবিতায়, গানে ও প্রবন্ধে 'মেঘদূত'-এর অনুষঙ্গ দেখা দিয়েছে নানাভাবে। তার মধ্যে 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা, 'প্রাচীন সাহিত্য'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধ এবং 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' গীতিগদ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগদীশ ভট্টচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রকবিতাশতক' গ্রন্থে 'মেঘদূত' কবিতার আলোচনাসূত্রে দেখিয়েছেন, কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর তুলনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'মেঘদূত' কোথায় আলাদা; প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-রূপকল্প 'চির-নিশি'র প্রতি তিনিই সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'ছিন্নপত্রাবলী'র চল্লিশ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে লিখছেন, 'সেদিন কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল—রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ / পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ। তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং / ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।। অস্যার্থ। রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্যুৎসুক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্বজন্মের কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে। কালিদাসের মনটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বিকল হয়ে উঠত তা বেশ বোঝা যায়। মেঘদূতেও কবি বলেছেন 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'—মেঘ দেখলে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।'

খ) 'সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন ... আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না !'

সৌন্দর্যপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি মুহূর্তে সৌন্দর্য পান করতে চেয়েছেন। প্রতি বছর পয়লা আষাঢ় তাঁর মনে যে-ব্যাকুলতা জন্ম দিয়েছে, সেই সূত্রেই প্রথমে তাঁর মনে হয়েছে, একদিন এই পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে তাঁকেও পাড়ি দিতে হবে মৃত্যুদেশে। তখন কোথায় থাকবে কালিদাসের সেই দিন, কোথায় থাকবে 'মেঘদূত'! কিন্তু কবি নৈরাশ্যবাদী নন। তাই, জীবৎকালে যেখানে যতটুকু সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তাকেই তিনি দু'চোখ ভ'রে দেখেছেন। আক্ষেপ করেছেন, এই নিসর্গ পৃথিবীর সবটুকু কেন তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া'। কিন্তু সত্যিই কি 'আকাশ ছাঁকিয়া' নীলিমাকে স্পর্শ করা সম্ভব? না। তবু তাঁর মন বলে, 'আমি সব নিতে চাই সব নিতে ধাই হে'।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমর জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে!' রবীন্দ্রনাথ কবি। রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক। সত্তর বছর পূর্তিতে 'পান্থ' কবিতায় তাই তিনি তাঁর বহুপরিধিময় এককেন্দ্রিক সত্তাস্বরূপ বৃত্তের মূল কেন্দ্রবিন্দুটির পরিচয় উদ্ঘাটন করে লিখলেন—'শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, / আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই। / আমি কবি, আছি / ধরণীর অতি কাছাকাছি, / এ পারের খেয়ার ঘাটায়।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বে কবিপ্রতিভার তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রথম হল বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের বশীভূত হয়েই তিনি লেখেন, 'এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশেষ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না!'

গ) 'আমার সেই পেনেটি বাগানের গুটিকতক দিন ... আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।'

পেনেটি বা পানিহাটিতে যাত্রা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র 'বাহিরে যাত্রা' অধ্যায়ে লিখছেন, 'একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুর বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম। এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। ...প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।'

অবশ্য, পেনেটিতে যাওয়ার আগেও, নিসর্গের সৌন্দর্য বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। 'শেষ সপ্তক' ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তখন আমার বয়স ছিল সাত। / ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে / অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে, / বেরিয়ে আসছে কোমল আলো / নতুন-ফোঁটা কাঁঠালিচাঁপার মতো। / বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে। কাক ডাকবার আগে, / পাছে বঞ্চিত হই / কম্পমান নারকেল-শাখাগুলির মধ্যে / সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে। / তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন। / যে-প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে / আলোতে স্নান করে আসত / রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে, / সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি, / আসত আমার মুখে চেয়ে।'

'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে রয়েছে এরই প্রতিফলন—'বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। ...বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।'

'চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'জীবনস্মৃতি'র 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বিলাতযাত্রার আরম্ভ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন। ...সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।' চন্দননগরের বাগানবাড়িতে জ্যোতিদাদা ও বউঠানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দিনযাপনের সেই স্মৃতি সূত্রে 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র 'সরোজিনী প্রয়াণ'-এ পাই, 'এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ-জন্মে দেখিতে পাইব না!'

ঘ) 'সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! ...নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।'

পৃথিবীর এই সৌন্দর্যের আকর্ষণেই শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকো বাড়ির ভিতরের বাগান ছিল 'স্বর্গের বাগান'। 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে তিনি লিখছেন, 'বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পুব দিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত। ...তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।' পুনশ্চ, 'বাহিরে যাত্রা' অধ্যায়ে, জোড়াসাঁকোর বাইরে পেনেটি অর্থাৎ পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রথম পদার্পণের স্মৃতিচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ : 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। ...প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।'

ঙ) 'যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে, কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।'

সৌন্দর্য-যে ইন্দ্রিয়াতীত, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর কয়েকটি লেখা থেকেই নিচে উদ্ধৃত করা হল :

১. **'ছেলেবেলা'** : 'মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম; তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে

ধরা যায় না।' রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ্ম বা শতদল আসলে সৌন্দর্যের প্রতীক। সৌন্দর্যকে যে স্পর্শ করা যায় না, দূর থেকেই সেই সৌন্দর্য উপভোগ্য—জীবনসঞ্জাত সেই অনুভূতির কথাই রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যক্ত করেছেন।

২. **'নিষ্ফল কামনা' / 'মানসী'** : 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব, / কেহ নহে তোমার আমার। / অতি সযতনে, অতি সংগোপনে, / সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবনসে, / বিপদে সম্পদে, / জীবনে মরণে, / শত ঋতু আবর্তনে / বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে / শতদল উঠিতেছে ফুটি; / সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে / তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে? / লও তার মধুর সৌরভ, / দেখো তার সৌন্দর্য্যবিকাশ, / মধু তার করো তুমি পান, / ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, / চেয়ো না তাহারে। / আকাঙ্ক্ষার ধন-নহে আত্মা মানবের। / শান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধ কোলাহল / নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে, / চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।'

৩. **'সৌন্দর্যবোধ' / 'সাহিত্য'** : 'সৌন্দর্য ... প্রয়োজনের বাড়া। ...সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি। ...পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। ...যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না। ... সৌন্দর্য ঠিকমত ... উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনই আবশ্যক। ... শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না।'

৪. **'ছিন্নপত্রাবলী' ১৮৯ সংখ্যক পত্র** : 'সৌন্দর্য জিনিষটাও কিছু jealous, সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না।'

৫. **'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৭ সংখ্যক পত্র** : 'সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয়, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই—সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না ... সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা ...।'

চ) 'পুঃ—আসল যে কথাটা বলতে ... বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।'

সমগ্র চিঠির শেষে 'পুনশ্চ' সংযোজিত এই অংশটি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের রসিক মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে।' —সামান্য এক পঙ্‌ক্তির এই বাক্যেই যদি চিঠিটি লেখা হত, তাহলে সেটি হয়ে দাঁড়াত একটি নিছক সংবাদপ্রেরণ। কিন্তু এক পঙ্‌ক্তির এই ভাবকেই রবীন্দ্রনাথ যখন, 'চার পাতা' জুড়ে ভাষা দিয়ে বাঙ্ময় করে তোলেন, তখনই তা হয়ে ওঠে পত্রসাহিত্যের অনন্য নিদর্শন।

১৭.৮ সারাংশ

'ছিন্নপত্রাবলী'র ৮ সংখ্যক চিঠিটির মূল ভরকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা এবং তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে কেন্দ্রীভূত করেই ৫৫ সংখ্যক চিঠিটি আবর্তিত হয়েছে। এই দুটি পত্রে যেসব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সেগুলিকে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী' গ্রন্থে আলোচিত প্রসঙ্গসূত্রে আরও বিস্তৃতভাবে দেখা যেতে পারে। মূল পত্রদুটির পাঠ ও সে দুটিতে আলোচ্য বিষয়ের পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

১৭.৯ অনুশীলনী

ক. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৮ সংখ্যক চিঠিটি কবে লেখা হয়েছিল?

২. 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৮ সংখ্যক চিঠির মূল বিষয়বস্তু কী?

৩. 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৫৫ সংখ্যক চিঠিটি মূল কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত?

৪. বিশুদ্ধ প্লেটোনিজম এবং রোমান্টিক প্লেটোনিজম কি এক?

৫. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে ফ্রয়েড কী নামে অভিহিত করেছিলেন?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. '... এরা কি কম মূল্যবান!' কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি?

২. 'এই রকম করেই আমরা চলেছি।' —বিশ্লেষণ করুন।

৩. প্লেটোর অভিপ্রেত অর্থে 'প্লেটোনিক প্রেম' কাকে বলে, বুঝিয়ে দিন।

৪. 'অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো।' —রবীন্দ্রনাথ কেন একথা বলেছেন?

গ. বিস্তৃত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. মানুষের জীবনে দিব্য কাম (Divine Eros) কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

২. 'সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত'—পাঠ্য পত্র অনুসারে আলোচনা করুন।

১৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ছিন্নপত্রাবলী', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬০, নূতন সংস্করণ : চৈত্র ১৩৯৯, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৪১০।

২. 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : ১৯১২, সাধারণ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩১১।

৩. 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯৪।

৪. 'মানসী', রবীন্দ্র রচনাবলী (সুলভ সংস্করণ), প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৯৩।

৫. 'সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪, চতুর্থ সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৭, পুনর্মুদ্রণ : কার্ত্তিক ১৪১১।

৬. 'কবিমানসী' (দ্বিতীয় খণ্ড), জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৭৮, প্রথম ভারবি সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০০।

৭. 'রবিজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ, ১৩৯৪।

একক : ১৮ এবং জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ প্রস্তাবনা

১৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর 'পত্র-পরিচয়'

১৮.৪ 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম চিঠি— মূল পাঠ

১৮.৫ পত্রোদ্ধৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

১৮.৬ সারাংশ

১৮.৭ অনুশীলনী

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে, জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের গভীরতা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৮.২ প্রস্তাবনা

জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির সূত্রে পত্রপ্রাপক-পত্রপ্রেরক সম্পর্কের পত্রোদ্ধৃত নানা প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এই এককটি সজ্জিত।

১৮.৩ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর 'পত্র-পরিচয়'

জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়-সহ 'পত্র-পরিচয়'-এর জন্য রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২২ চৈত্র, ১৩২২-এ রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, 'প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন কর্‌ছিল', সেইসময়েই তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয়। তখন জগদীশচন্দ্র যে চিঠিগুলি তাঁকে লিখেছিলেন, তার মধ্যেই উভয়ের 'প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাক্‌তে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্ত্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উদ্ঘাটন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই।' রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'প্রথম বন্ধুত্ব' জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি মনে থাকলেও তার ছবি সর্বাংশে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে-লেখা চিঠিগুলির মধ্যে এমন 'মন্ত্র ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার' রবীন্দ্রনাথের 'মনে জেগে উঠেছে'। উভয়ের 'বন্ধুলীলার ছবি' জগদীশচন্দ্রের ধর্মতলার আবাস থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'নিঃসঙ্গ', 'সমাজের

বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে' তাঁর দিন কেটেছে। ঠিক যেভাবে একদিন 'শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্য্যোদয়ের মহিমা' তাঁকে শোওয়ার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছিল, সেইভাবেই তাঁকে তাঁর 'চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে' 'টেনে বের ক'রেছিলেন' জগদীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যে সহজেই দেখেছিলেন 'একটি ঐশ্বর্য্য'। 'অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না।' কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি লিখছেন, 'প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা সে জাতের ছিল না। আমার অনুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর; বর্তমান সাক্ষ্যটকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে খর্ব্ব ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই আভাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পার্‌বে।'

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'জগদীশচন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন—উভয়ের সম্পর্ক-সূত্রটি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সেটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।'

১৮.৪ 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম চিঠি—মূল পাঠ

৫

[অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০০]

বন্ধু

সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে? মহৎ কর্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সারিয়া উঠিতে হইবে।

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই— শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে :— পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।

ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্ব্বেই বলিয়াছি— আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮.৫ পত্রোদ্ধৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

পত্রোদ্ধৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এখানে মূল নির্ভর 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ।

'সীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে ?' :

বিদেশের বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতিপ্রাপ্তিকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চিঠিতে সীজারের কীর্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন, ১৯০২-এর মে মাসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন, 'ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈরাশ্যে হউক, তুমি নিজেকেও ব্যর্থ করিতে পার না। যিনি ভিতরে থাকিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহার কর্ম্মকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে ? সীজারের নৌকা কখনও ডুবে না। নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্থৈর্য্য তোমাকে তোমার কর্ম্মের মধ্যে অনায়াসে রক্ষা করুক্। কোন ক্ষুদ্র আকর্ষণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমার মহৎ ব্রত হইতে ভ্রষ্ট না করুক। ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে।'

কেন রবীন্দ্রনাথ বিদেশে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অর্জন প্রসঙ্গে বারবার সীজারের নৌকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'র ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে আলোচ্য চিঠিটির সূত্রে লেখা হয়েছে, " 'সীজারের নৌকা' প্রসঙ্গে বোধ করি নিম্নলিখিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিতেছিল—' "। এরপর তিনি ইংরিজিতে যে-কাহিনিটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটি শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

At Apollonia, since the force which he had with him was not a match for the enemy and the delay of his troop; on the other side caused him perplexity and distress, Caesar conceived the dangerous plan of embarking in a twelve-oared boat. without any one's knowledge, and going over to Brundisium, though the sea was encompassed by such large armaments of the enemy. At night, accordingly, after disguising himself in the dress of a slave he went on board, threw himself down as one of no account, and kept quiet. While the river, Aous was carrying the boat down towards the sea, the early morning breeze, which at that time usually

made the mouth of the river calm by driving back the waves, was quelled by a strong wind which blew from the sea during the night; and the river therefore chafed against the inflow of the sea and the opposition of the billows, and was rough, being beaten back with a great din and violent eddies, so that it was impossible for the master of the boat to force his way along, He therefore ordered the sailors to come about in order to retrace his course. But Caesar, perceiving this, disclosed himself, took the master of the boat by the hand, who was terrified at sight of him, and said: "Come, good man, be bold and fear nautht; thou carryest Caesar and Caesar's fortune in thy boat." The sailors forgot the storm and laying to their oars, tried with all alacrity to force their way down the river ...

'আমার সমস্ত ছোটগল্প একত্রে ছাপিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' :

এটি আসলে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'র প্রথম সংস্করণ। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন, ১৩০৭—বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ১১ অক্টোবর, ১৯০০। আর, ১৩০৭-এ, ইংরিজি ১৯০১-এ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড।

'আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে ...' :

পাশ্চাত্যে রবীন্দ্ররচনার প্রচারে জগদীশচন্দ্র বিশেষ উদ্যোগী হলেও, প্রথমে তা সার্থক হয়নি। লণ্ডন থেকে ২ নভেম্বর, ১৯০০-য় রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়ছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knight-কে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না ? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।'

২৩ নভেম্বর, ১৯০০-য় জগদীশচন্দ্র এই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় লিখছেন, 'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisher-রা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্দ্ধেক কোন সদনুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি ? আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি। এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knight-কে দেই নাই।'

জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১২ ডিসেম্বর, ১৯০০য় জানালেন, 'আমর গল্পের দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহির হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমার হস্তগত হইলে নির্বাচন করিবার সুবিধা হইবে।

আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গালা-ভাষা-বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল—ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয়-পরিজনের কাছে সে যেভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ঐখানে তোমাদের জিৎ—জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে। ...আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না—তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।'

কেন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান ভাষার অপেক্ষা তেমন করিয়া রাখে না, ভাব ভাষার কাছে আপাদমস্তক বিকাইয়া আছে।' কারণ, 'যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। ... কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়, দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বার বার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্ব দিকে ওঠে এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না; কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। ... অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোনো জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীন ভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' ('সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', কার্ত্তিক, ১৩০০)

১৬ জানুয়ারি, ১৯০১-এ জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, 'তোমার গল্পের পুস্তক দ্বিতীয় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খন্ড হইতে ৩টি গল্প তরজমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল ? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সেসবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের ক্লিপিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি :'

এই তিন শ্রেণির বন্ধুর প্রথম হলেন এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা। সাহিত্যে তাঁর 'বিশেষ অনুরাগ' ছিল এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পটি শুনে 'কাঁদিয়া আকুল' হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'Typical John Bull। "ছুটী" শুনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না—ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে, এরূপ দু-একজনকে আমি জানি—true to life। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।' তৃতীয়জন ছিলেন ইওরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত এক সম্ভ্রান্তবংশীয় মানুষ। রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন জগদীশচন্দ্র : 'He has not seen such a fine touch in any European Literature.'

উপরি-উক্ত তিন ব্যক্তির তিনপ্রকার মত জানানোর পর জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'সুতরাং সাধারণের নিকট কিরূপ লাগিবে জানি না।' পুনশ্চ, 'কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখানকার একজন publisher-এর নিকট পাঠাইতে চাই। এদেশীয় publisher চোর। অনেক দর-দস্তুর করিতে হইবে। প্রথমে লোকসান পূরণের জন্য টাকা চাহিবে।' 'অথবা কোন Magazine-এ পাঠাইতে পারি।'

বিদেশের ম্যাগাজিনে রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদ করে পাঠানো প্রসঙ্গে ২২ মে, ১৯০১-এ জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন ম্যাগাজিনে পাঠাইয়ছিলাম। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?'

এই সূত্রে Ptrick Geddes তাঁর 'The Life and Work of Sir Jagadis C.Bose. গ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe, and Bose felt keenly that the West had not the opportunity of realizing his friend's greatness. So his second visit to England, in 1900, he had one of his stories, 'The Kabuliwalla', translated into English. Prince Kropotkin—a good critic in letters as well as science—declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen—and Bose submitted it to Herper's Magazine. It was denied, because the West was not sufficiently interested in Oriental life. The time had not yet come—but Bose during his last visit to America in 1915, when Tagore's fame was reaching his meridian, and did not fail to utilize the opportunity to rub this in when harper was publishing his own articles'.

'ত্রিপুরার মহারাজ ... পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।' :

ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্য জগদীশচন্দ্রকে-যে একাধিকবার অর্থসাহায্য করেছেন, সেই উল্লেখ পাওয়া যায় জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিতে। যেমন, ২০ নভেম্বর, ১৯০০য় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষভাবে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হবে আছেন।'

পুনশ্চ, আগরতলা থেকে কার্ত্তিক ১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন, 'আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতারাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যে তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হিতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তর রূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। ...মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।'

ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সূত্রেই। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ...১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়। ...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, "...যদি তুমি পার উপস্থিত হইও।" ...মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ...রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। ...তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষত বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০্ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০্ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া বলেন, "এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। ..." তৎপর জগদীশবাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটি ফুরাইয়া আসায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত, এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহ বাণী এবং ২০,০০০্ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যলাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

'বিলাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? ...ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।' :

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে এই চিঠি লিখছেন ১৯০০ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় জগদীশচন্দ্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিদেশে কোন্ কাজ নেওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে? ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'জড় কি সজীব' প্রবন্ধে এর আভাস পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত। সেই প্রবন্ধসূত্রে জানা যায়, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার কীভাবে 'ঈথর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদ্দের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে'। তিনি আসলে জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য ভেদ করে বিজ্ঞানীদের 'সচকিত' কে তুলেছিলেন—'আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া সাধর্ম্য প্রমাণ' করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ দু'ভাগে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম, আঘাতজনিত সাড়। 'অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক-সূচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।'

পুনশ্চ, 'শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায়; —ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।' এই আঘাতজনিত সাড়ের পাশাপাশিই আছে আলোকজনিত সাড়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আলোকজনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি কৃত্রিম চক্ষু নির্মান করিয়াছেন; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থ-বিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উলট্‌পালট্‌ করিয়া দিবে।'

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলে বৈজ্ঞানিক শ্রোতৃবৃন্দ উৎফুল্ল হন এবং জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তাঁকে ইংল্যান্ডে অধ্যাপনায় ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। সেই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০য় রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—

'বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার stereoscope— M E R O ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means ? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India and you are hampered there. Can't you come over to England. Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ University-র নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration-এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?'

বিদেশে কর্মভার গ্রহণ করা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের এই মানসিক দ্বিধার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একাধিক পত্রে। জগদীশচন্দ্রের সেই চিঠি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদেশে বৈজ্ঞানিক কার্য সমাধার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। যেমন—

৫ অক্টোবর, ১৯০০য় জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। ... জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিয়োরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।'

পুনশ্চ, ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন, 'আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে? ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে? ...তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে। সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না। ...আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যেসব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব। ...এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easter এর পূর্বেই আমার ছুটী ফুরাইয়া আসিবে। ছুটী চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ। ...এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর এই সময় লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত।'

ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণা প্রসঙ্গে, জগদীশচন্দ্রের চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২০ নভেম্বর লিখলেন, 'আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি না? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করিবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা যে আমাদের পক্ষে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কী বল?'

এই সূত্রে জগদীশচন্দ্র জানালেন, 'সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কার্য্য শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছি; জানি না পাইব কি না।' (২৩ নভেম্বর, ১৯০০)। পুনশ্চ, ১০ ডিসেম্বর লিখছেন, 'আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, লিখিও। ...আমার সময়ের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, লিখিও।'

জগদীশচন্দ্রের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ১২ ডিসেম্বর চিঠিতে লিখছেন, 'গবর্ম্মেন্ট যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকারী নও? যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি। যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না। তুমি তোমার কর্ম্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।'

'অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কর্ম্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কর্ম্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না—আমার ত এই পরামর্শ। ...আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।' (জানুয়ারি, ১৯০১?)

এর কয়েকমাস পর, ৩ মে, ১৯০১-এ জগদীশচন্দ্র আবার চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে—'তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অন্ততঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে, জার্মেণী, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?'

প্রত্যুত্তরে ২১ মে, ১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাক্‌তে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।'

জগদীশচন্দ্র যখন লিখছেন, 'আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটী দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না।' তখন রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল, ভারতবর্ষে না ফিরে বিদেশে থেকেই জগদীশচন্দ্র যেন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ করে দেশে ফেরেন। জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহদানে-লেখা একাধিক পত্রে সেই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন—

এক. 'তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি—অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর—দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাঁধিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।' (৪ জুন, ১৯০১)

দুই. 'তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা জানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অন্যান্য সভায় তোমার মত প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জানিবার

জন্য আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্মানি ও অ্যামেরিকায় যাইবার কোনপ্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি?' (৩ জুলাই, ১৯০১)

তিন. 'তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফল লাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে তোমার কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা দৃঢ় রাখিয়ো।' (অক্টোবর বা নভেম্বর, ১৯০১)

চার. 'য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো—তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না।' (এপ্রিল, ১৯০২)

পাঁচ. 'তুমি জর্ম্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস—তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।' (২০ জুন, ১৯০২)

১৮.৬ সারাংশ

বিদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র যাতে কোনোরকম অসুবিধে, বিশেষত আর্থিক অনটনে তাঁর গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, এবং তিনি গবেষণায় খ্যাতি অর্জন করতে পারেন—সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই বর্তমান চিঠিটি আবর্তিত।

১৮.৭ অনুশীলনী

ক. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।' —কোন্ বন্ধুত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২. 'আমার হতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক।' —কে কাকে পনেরো হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন?

৩. 'সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থবিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়তে পারে।' —কোন্ আবিষ্কার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য?

৪. '...তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি' —কারণটি কী ছিল?

৫. আলোচ্য চিঠিতে ত্রিপুরার কোন্ মহারাজের প্রসঙ্গ উল্লিখিত?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. 'বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না।' —কোন্ 'শুভ সময়'-এর কথা বলা হয়েছে?

২. 'এই গেল আদিকাণ্ড।' —'আদিকাণ্ডটি কী ছিল?

৩. 'আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহারই প্রকাশ করিয়াছেন।' —কোন্ পরীক্ষার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

৪. 'আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।' —প্রসঙ্গ-সহ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

গ. বিস্তৃত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. আলোচ্য চিঠির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের রসায়ন আলোচনা করুন।

১৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. 'চিঠিপত্র' (ষষ্ঠ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ : মে ১৯৫৭, সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

২. 'সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪, চতুর্থ সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৭, পুনর্মুদ্রণ : কার্ত্তিক ১৪১১।

একক : ১৯ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি

গঠন

১৯.১ উদ্দেশ্য

১৯.২ প্রস্তাবনা

১৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়সূত্র

১৯.৪ 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৭৯ সংখ্যক চিঠি—মূল পাঠ

১৯.৫ পত্রোদ্ধৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

১৯.৬ সারাংশ

১৯.৭ অনুশীলনী

১৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯.২ প্রস্তাবনা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটির সূত্রে পত্রপ্রাপক-পত্রপ্রেরক সম্পর্কের পত্রোদ্ধৃত নানা প্রসঙ্গের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এই এককটি সজ্জিত।

১৯.৩ রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়সূত্র

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের পরিচয়সূত্রটি আলোচনার ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক প্রায় চুয়াল্লিশ বছরের। রামানন্দ যখন 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক, তখন সেই পত্রিকার ১৩০৫-এর বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়' কবিতা প্রকাশিত হয়; যদিও দুজনের চাক্ষুষ পরিচয় সেইসময় ছিল না। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও উভয়েই উভয়কে চিনতেন। কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপক রামানন্দ-সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় ১৮৯৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের সমালোচনা লেখেন গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ঠিক পরের মাসে, অর্থাৎ, ১৮৯৬-এর মার্চে, রামানন্দ নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটির সমালোচনা করেন।

এলাহাবাদে 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদনা ছেড়ে ১৮৯৭-এর ডিসেম্বর মাসে সদ্য প্রকাশিত 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন রামানন্দ। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এই 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরী' চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, পত্রিকা-সম্পাদক রামানন্দ-ই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সেই চিত্রের ব্যাখ্যামূলক একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ সেইসময় একবার এলাহাবাদে যান। যাওয়ার মূল কারণ ছিল, দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ—মৃত বলেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। সেই উপলক্ষ্যেই, ১৯০০ সালে রামানন্দের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে রবীন্দ্রনাথের।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন রামানন্দ। এরপর ১৩০৮-এর বৈশাখ মাসে, ১৯০১-এর এপ্রিলে, রামানন্দের সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকা। আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা থেকে বোঝা যায়, এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কতখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নিজের লেখার পাশাপাশি, বিদেশি বিভিন্ন রচনা রবীন্দ্রনাথ নিজে অথবা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের সূত্রে অনুবাদ করিয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করতেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রবাসী'র ১৩৪৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রামানন্দ লিখছেন :

'রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর জন্য বিলাতী ও আমেরিকার বহু মাসিক পত্রের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোন কোন অংশ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকে কাহাকেও অনুবাদ করিয়ে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন এবং কোন কোন অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না।'

'প্রবাসী'তে লিখেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সম্মানদক্ষিণা পান। সাময়িক পত্রের লেখককে এই দক্ষিণাদান প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা কটাক্ষ করলে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায়।

১৯০৭। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন 'Modern Review' পত্রিকা। ১৯১১-র এপ্রিল সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের অন্তর্গত 'জন্মকথা' ও 'বিদায়' কবিতা দুটির অনুবাদ প্রকাশিত হল। সেই সূত্র ধরেই প্রতি মাসেই 'Modern Review' পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ প্রকশিত হতে শুরু করে। অনুবাদকদের অন্যতম ছিলেন পাটনা কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক যদুনাথ সরকার।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' এবং 'Modern Review' পত্রিকা, বাংলায়, বহির্বঙ্গে এবং পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ প্রচারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পত্রিকা দু'টি। ১৯০৮-এ রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ১৯২৫-এ। কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তরে পদত্যাগ করলেও রামানন্দ কখনওই রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শ প্রচারে বিমুখ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কার্যধারা যাতে কখনওই ভুলভাবে ব্যাখ্যাত না হয়, সেইদিকে বিশেষ সতর্ক ছিলেন রামানন্দ।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯১২য় রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের নেপথ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন রামানন্দ। ১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রামানন্দ 'Golden Book of Tagore' সম্পাদনা করেন।

১৯.৪ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৭৯ সংখ্যক চিঠি (মূল পাঠ)

৭৯

২৫-২৬ অক্টোবর ১৯২৩

ওঁ

ভিয়েনা
২৫ অক্টোবর
১৯২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মডার্‌ন্‌ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য বেরিয়েচে, আপনার চিঠিতে সেটাকে আপনি ভুল বলে জানিয়েচেন। আমি তাকে ভুলের চেয়ে কেন বেশি মনে করি সে কথা গোপন করা উচিত নয়।

সরলা যখন আপনার সম্পাদকের কার্য্যকে ব্যবসাদারী বলেছিল তখন সেটাকে আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশত ভুল বলে মনে করতে পারতুম। কিন্তু লেখার মধ্যে অসম্মানকর শ্লেষ ছিল বলেই আমি তা ভাবতে পারি নি এবং সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেই আত্মীয়মণ্ডলীকে বেদনা দিয়ে প্রকাশ্যে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি— বিশেষ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে তার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করি নি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি বিচারক নই, আমি ফরিয়াদী কিন্তু সেজন্যে ত বিচারের আদর্শ স্বতন্ত্র হতে পারে না।

প্রথমতঃ বুঝতে হবে, আপনার কাগজে আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা স্বতই অতিপরিমাণ লাভ ক'রে লোকের চোখে উগ্র হয়ে লাগে— নায়ক-এর মতো কাগজে এর গুরুত্ব অনেক কম হয়। এই লেখায় সাধারণ লোকে যে চমৎকৃত হয়েচে দেশের কোনো কোনো চিঠি থেকে তার পরিচয় পেয়েছি। দ্বিতীয়ত আমার সম্বন্ধে এ রকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশী বিদেশী শত্রু মিত্র কারো কাছ থেকে অনেকদিন পাই নি। যাদের সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার মতান্তর আছে আমার মত ও আচরণকে আক্রমণ করবার ন্যায্য অধিকার তাদেরই। কিন্তু আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ বা আক্রমণ নয় ব্যক্তিগত অবমাননা।

দেশের পলিটিক্‌স্‌, সমাজ বা সাহিত্যিকরুচি অথবা সমব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা নিয়ে লোকের মন যখন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় তখন বাদপ্রতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কটূকাটব্য আপনি এসে পড়ে। তখন পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আত্ম-বিস্মৃতি অন্যায় হলেও নিরতিশয় অসঙ্গত মনে হয় না। তৎসত্ত্বেও নন-কো-অপারেশনের ঘোর আন্দোলনের মুখেও আমার বিরুদ্ধবাদী কোনো পত্রে এমন ভাবে আমার প্রতি গ্লানিপূর্ণ শ্লেষ প্রয়োগ সম্প্রতি কোথাও ঘটেচে বলে জানি নে।

মডার্‌ন্‌ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে যে প্রসঙ্গে সমালোচনা বেরিয়েচে সে হচ্চে ফ্যাসিস্ট্‌ দলের প্রতি আমার আতিথ্যবিরুদ্ধ ব্যবহার। সে সম্বন্ধে আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাতে আমার বন্ধুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হতেও পারেন কিন্তু তাঁদের রক্ত অত্যন্ত বেশি গরম হয়ে ওঠবার মতো বিষয় এটা নয়। আমার পত্র প্রকাশের পর ইটালীর বাহিরে ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের নানা স্থানের কাগজ থেকেই কাটা টুক্‌রো পেয়েছি কোথাও কেউ আমাকে

এমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বক্রোক্তি করেন নি— আমার কৈফিয়ৎটাকে সাধারণত শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেচেন। এমন কি ফর্ম্মিকিও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হলেও দুঃখ প্রকাশ করেচেন আমাকে অসম্মান করেন নি।

লেখাটাকে ভুল বল্‌চেন। কিসের ভুল? ঘটনার ভুল? এ সম্বন্ধে যেটুকু ঘটনা প্রাসঙ্গিক সে আমার চিঠিতেই আছে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে বলেচেন চিঠি আমার কি না তাঁর সন্দেহ রয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর মতে চিঠি আমার এতই অযোগ্য যে ওটাকে জাল বলে মনে করলেই আমার লজ্জা রক্ষা হয়। বোধ করি ইটালীর কোনো ফ্যাসিস্ট কাগজেও এমন ছদ্মসন্দেহের কুটিল অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয় নি।

নিকটের ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক সময়ে ক্ষিপ্রহস্তে কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালনার আশু প্রয়োজন ঘটে— সে অবস্থায় মানুষের ক্ষোভের মাত্রাও বেশি হয়। সে অবস্থায় মান্য ব্যক্তিকে বা বন্ধুকেও বিনা বিচারে বা স্বল্প প্রমাণে কঠিন কথা বলা সম্ভবপর হয়। সেই কারণে যদুনাথ সরকার মশায়ের পত্র নিয়ে আপনার ইংরেজি বা বাংলা বা উভয় কাগজেই যদি অপ্রিয় আলোচনাও হত তাহলে সেটা আক্ষেপের বিষয় হলেও বিস্ময়ের বিষয় হ'ত না। কিন্তু দূরের ব্যাপার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অসংযত উত্তেজনা স্বাভাবিক নয় বলেই অন্তত মান্য বা বন্ধুব্যক্তির প্রতি আমরা ধৈর্য্য প্রত্যাশা করি। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সেটা অশোভন হয়।

... র সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয় নি; তার সঙ্গে সম্বন্ধ আপনার সম্বন্ধ অনুসরণ ক'রেই। কিন্তু ... আত্মীয়ের মত নিকটে এসেছিল। ... আমার কাছ থেকে অজস্র স্নেহ পেয়েছে। মডারন রিভিয়ুতে ও তার পনেরো দিন পরে প্রবাসীতে সর্ব্বজনগোচর যে অবমাননা আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে তারা যে তা স্বীকার করে নিতে পারলে এটাই সব চেয়ে আমাকে বেদনা দিয়েছে। অবশ্য কর্ত্তব্যের দাবী আত্মীয়তার দাবীর চেয়ে বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই দাবী কি এত অত্যন্ত বেশি ছিল যে, ভাষায় অপরাধীর প্রতি সামান্য সৌজন্যেরও সংযম রক্ষা করা অসাধ্য হয়েছিল।

আপনি Forward-এর প্যারাগ্রাফের উল্লেখ করেছেন। সুধীন্দ্র বসুর প্রেরিত সংবাদমালার পরে সে প্যারাগ্রাফ গ্রথিত। তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে সংবাদ অবিশ্বাস করবার কোনো হেতু ছিল না। তবু যখনি সংবাদ অসম্পূর্ণ বলে জেনেছেন তখনি অসঙ্কোচে দোষ স্বীকার করেছেন। আপনার দুই কাগজে যে আলোচনা বেরিয়েচে সে আমার নিজের লেখা পত্র অবলম্বন করে— উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

জীবনে আত্মীয়তার বিকার বন্ধুত্বের বিপর্য্যয় বিনাকারণেই বারবার ঘটেচে— চুপ করেই সহ্য করেছি। এবারেও প্রতিবাদ করব না, এমন কি, বৃদ্ধ দার্শনিক কবির সাঙ্গোপাঙ্গেরাও না করেন এই আমার ইচ্ছা। তবে কি না যেটা যা সেটাকে তাই বলেই গণ্য করার প্রয়োজন আছে— ইচ্ছাকৃত অত্যাচারকে অজ্ঞানকৃত ভুল বলে চাপা দিতে গেলেই যথার্থ ভুলের সম্ভাবনা ঘটে— সেইজন্যেই আপনার চিঠির উত্তরে এই চিঠি লিখ্‌লুম— নইলে কোনো কথাই বল্‌তেম না।

এই বিদেশে আমার পত্রে আপনি কিছুমাত্র ক্ষোভ অনুভব করেন এ আমি ইচ্ছা করি নে। সেই জন্যে দেশের ঠিকানায় পাঠালেম, ফিরে গিয়ে পাবেন— ততদিনে এই বিতর্কের অনেক উত্তাপ আপনিই শান্ত হয়ে যাবে।
ইতি ২৬ অক্টোবর ১৯২৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯.৫ পত্রোদ্ধৃত বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

'মডার্ন্ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে আমার সম্বন্ধে ... উচিত নয় :

'Modern Review' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কেন এবং কী মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ বুঝতে গেলে, রবীন্দ্র-জীবনে ১৯২৫ এবং ১৯২৬—এই দুটি বছরের কার্যকলাপ, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ এবং মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বটির আলোচনা প্রয়োজন। এই উপ-এককটি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের দু'বারের ইতালি ভ্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নথি-সমন্বিত গ্রন্থ শ্রী কল্যাণকুমার কুণ্ডুর 'ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ'। এছাড়া নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে'-ও এইসূত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইতালি সফরের সূত্রপাত ঘটে এইভাবে :

কালিদাস নাগ ইস্টারের ছুটি কাটাতে প্যারিস থেকে রোমে পদার্পণ করেন ১৯২১-এ। তিনি তখন সিল্ভ্যাঁ লেভির অধীনে প্যারিসে গবেষণা করছিলেন। রোমে পৌঁছনোর পর তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির। সেইসূত্রেই তিনি পরিচিত হন দু'জন প্রাচ্যবিদ জিওভান্নি ভেক্কা এবং জুসেপ্পি তুচ্চির সঙ্গে। ইতালির তৎকালীন সেনেটের গ্রন্থাগারিক ছিলেন তুচ্চি। ফর্মিকি সেইসময় প্রায়ই কালিদাস নাগকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং নানা বিষয়ের কথোপকথনে উঠে আসত রবীন্দ্রসাহিত্য। ফর্মিকি তখনও পর্যন্ত ভারতে আসার নানা চেষ্টা করেও সফল হননি শুনে, কালিদাস নাগ-ই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে, কালিদাস নাগ ইস্টারের ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসেন প্যারিসে। ১৯২৩-এ দেশে ফেরার পথে তিনি আবার রোমে যান এবং সেইসময় রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে ফর্মিকির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। ১৯২৪-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি আবারও এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় অন্য সূত্রে—রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত আইনজীবী ডি. জে. ইরানির সঙ্গে সাক্ষাতে ফর্মিকি কবির ইতালি সফর নিয়ে আলোচনা করেন। উভয়ের সেই আলোচনা কালিদাস নাগকে চিঠিতে জানান ফর্মিকি। জুন মাসে সেই চিঠি পাওয়ার পর নাগ প্রত্যুত্তরে লেখেন, 'এই বছরেই যাতে টেগোর ইতালি সফরে যেতে পারেন তার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে চলেছি। ...লাতিন আমেরিকার লোকেরা ডিসেম্বর মাসে তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উদযাপন করতে চলেছে, কবি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ডিসেম্বরের গোড়ায় শতবার্ষিকী উদযাপন হওয়ার কথা। সুতরাং হাতে থাকছে অক্টোবর মাস—তার মধ্যেই স্পেন ও ইতালির বক্তৃতা শেষ করতে হবে। ইতিমধ্যে স্পেন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার জন্য জাহাজের বন্দোবস্ত করেছে। ইতালি এই ব্যাপারে কি করছে জানাবেন।...'

ফর্মিকির তখনও কোনো ধারণা ছিল না যে, ইতালিতে কবিকে আমন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারিভাবে কী করণীয়। প্রথমে তিনি সরকারি ও বেসরকারি নানা সূত্রে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এমনকি, শিক্ষামন্ত্রী অ্যালসেন্দ্রো ক্যাস্তির কাছে অর্থ মঞ্জুরের আবেদন জানান। কিন্তু কোনোভাবেই অর্থের সংস্থান না হওয়ায় হতাশ ফর্মিকি যখন রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা প্রায় বাতিল করার কথা ভাবছেন, সেইসময় মিলানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গুইদো ক্যাগনোলার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'Circolo Filologico Milanese'-এর আর্থিক সহায়তায় আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ইতালিতে।

নানা দেশ ঘুরে অবশেষে ক্লান্ত ও অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ইতালির জেনিভায় পদার্পণ করেন ১৯২৫-এর ১৯ জানুয়ারি। চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটল ফর্মিকির সঙ্গে। ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় 'Circolo Filologico Milanese' প্রতিষ্ঠানে এক বিপুল জনসমাবেশে প্রথম বক্তৃতা দেন রবীন্দ্রনাথ। পরদিন ২৩ জানুয়ারি তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয় মিলানে। ২৪ থেকে ২৮ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সেবারের ইতালি সফর অসমাপ্ত রেখেই তিনি দেশে ফিরবেন। সেইমতো, ২৯ জানুয়ারি কবি সদলবলে মিলান থেকে ভেনিসে রওনা হন। তবে, ইতালি থেকে বিদায়গ্রহণের আগে রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি সুযোগ পেলে আবার ইতালি আসবেন।

১৯২৫-এর নভেম্বরে কার্লো ফর্মিকি মাসিক পাঁচশ' টাকা সাম্মানিক বৃত্তিতে পাঁচ মাসের জন্য বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে স্বাগত জানান আম্রকুঞ্জের অনুষ্ঠানে। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে ফর্মিকি বলেন, '...যখন আমি টেগোরের কাছ থেকে এখানে আসার আমন্ত্রণ পেলাম তখন আমি আমার সরকারকে এই সুযোগে এখানকার লাইব্রেরির জন্য কিছু ইতালিয় বই উপহারস্বরূপ পাঠাবার জন্য জানাই। প্রধানমন্ত্রী বেনিতো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে ইতালির সমস্ত ধ্রুপদী সাহিত্য, আধুনিক কলা ও কলাপ্রযুক্তি বিষয়ক বই সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে এক চিঠিতে ইতালি ও ভারতের মধ্যে এই পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের যে সূচনা হল তার জন্য গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমি এই শিক্ষার পীঠস্থানে মুসোলিনির উপহার নিয়ে আসার জন্য এবং সেইসঙ্গে, কেবল আমার দেশের মানুষের হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করা নয়, যিনি আমাদের সরকারের প্রধান সেই শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত ব্যক্তির সহানুভূতি বহন করে আনার জন্যও গর্বিত। আসুন, আমরা অন্তরের আনন্দের সঙ্গে এবং গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, ধর্মের আধার ভারত এবং শিল্পের আধার ইতালির মধ্যে আধ্যাত্মিক সেতু তৈরি করতে চলেছেন যে দুজন ব্যক্তি—সেই মুসোলিনি ও রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাই।...'

ফর্মিকি যে সমস্ত উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে ছিল ভেনতুরীর 'Storia Arte Italia', 'Biblioteca d'Arte Illustrata', ভ্যাটিক্যান ফ্রেস্কোর দুর্মূল্য প্রতিলিপি 'Pinacoteca Vaticana', পঞ্চাশ খণ্ডে ইতালীয় নবজাগরণের মূল্যবান গ্রন্থ 'Biblioteca del Risorgimento' এবং দান্তে, তাসো থেকে শুরু করে কার্দুচি ও পাস্‌কোলি পর্যন্ত বিবিধ ধ্রুপদী লেখকের সমগ্র সংগ্রহ। ইতালিয়ান অধ্যাপক জুসেপ্পি তুচ্চি বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ও চীনা ভাষা শেখানোর জন্য যোগদান করলেন ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে। বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইউরোপীয় ভাষা ছাড়াও জানতেন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, চীনা ও তিব্বতী ভাষা।

মুসোলিনি-প্রেরিত উপঢৌকন এবং অধ্যাপক তুচ্চির নিয়োগে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই প্রীত, অভিভূত এবং বিমুগ্ধ। তিনি ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ২ ডিসেম্বর এক টেলিগ্রামে মুসোলিনিকে জানালেন, 'ভারতীয় সভ্যতার প্রতি আপনার প্রশংসনীয় অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ; আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ইতালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধনের জন্য, অধ্যাপক তুচ্চিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি অধ্যাপক ফর্মিকি মারফত প্রেরিত উপঢৌকনের সূত্রে যে মহত্ত্ব ও বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে তা কেবল আপনাদের বিশ্ববিশ্রুত দেশের ঐতিহ্যের উপযুক্ত। আমি শুধু এই আশ্বাস দিই, ইতালির জনগণের পক্ষ থেকে আপনার এই সহানুভূতির ফলে আপনার ও আমার দেশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হল ইতিহাসে

তা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।' (তথ্যসূত্র : 'ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ', কল্যাণকুমার কুণ্ডু)

কবির সঙ্গে ফর্মিকি ও তুচ্চি নানারকম গল্প করতেন। যেমন, ইতালিতে তাঁরা দুঃখের জীবন যাপন করতেন, শান্তিনিকেতনে তাঁরা খুব সুখে আছেন। অধ্যাপক তুচ্চিকে নাকি কোনো এক অসামাজিক কাজের ফলস্বরূপ দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্তই বিশ্বাস করতেন। ইতিমধ্যে ইতালি থেকে কবি আমন্ত্রণ পেলেন। সেইমতো, শান্তিনিকেতন থেকে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ-সহ সদলবলে ১২ মে রওনা হলেন—বম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ল ১৫ মে। এটিই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় তথা শেষ ইতালি সফর।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ কেউই চাননি রবীন্দ্রনাথ ইতালি যাত্রা করুন। তাঁরা সেকথা বললেও রবীন্দ্রনাথ তাতে কর্ণপাত করেননি। কারণ, ফর্মিকি এবং তুচ্চির প্রতি প্রসন্ন কবিমন বিশ্বাস করেছিল, ভারতবর্ষ এবং ইতালির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরিতে ইতালিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কবির একান্ত জরুরি। এদিকে রবীন্দ্রনাথ তখনও ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাছাড়া, বিগত প্রায় এক বছর ধরে তিনি ফর্মিকি ও তুচ্চির কাছে শুনে এসেছিলেন যে, আধুনিক ব্যবস্থায় ইতালি কীরকম উন্নতি লাভ করেছে। ভারতের একদল মানুষের কাছে মুসোলিনি তখন মূর্তিমান অবতার। ইতালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মুসোলিনির জয়গানে তাঁরা মুখর। কাজেই, ফ্যাসিজমের প্রকৃত স্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই অজানা ছিল রবীন্দ্রনাথের। ইতালিতে নিমন্ত্রণগ্রহণে তাঁর যুক্তি ছিল, 'ওরা নেমন্তন্ন করেছে, আমি যাচ্ছি, তাই বলে কি ভাবতে হবে যে আমার সব মতামতও ওদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে? ওদের সম্বন্ধে নিন্দনীয় যেটা, সেটা সম্বন্ধে তো আমি চুপ ক'রে থাকব না। আমার বিশ্বমানবতার ধারণা যা, তা ওদের কাছেও আমি বলব। তবে ওরা দেশটাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাও তো দেখা উচিত'।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এইসময় জানান, 'আমার মনে একটা ভয় আছে যে কবিকে ওরা নিজেদের প্রোপাগান্ডার জন্য নিয়ে যাচ্ছে এবং সেইরকম করেই ওঁকে ওরা ব্যবহার করবে। কবির মনে ফর্মিকিদের সম্বন্ধে যতই ভাল ধারণা থাকুক না কেন, ওদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ওঁর কাছাকাছি একজন সর্বদা সজাগ থেকে সতর্ক দৃষ্টিতে ফর্মিকিদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখার দরকার ছিল। সেই কারণেই আমি আরো সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। ওরা বোধহয় তা টের পেয়েছে, তাই এতদিন চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ শেষ মুহূর্তে বলল, ওদের জাহাজে জায়গা পাওয়া যাবে না, যাতে আমার অন্য ব্যবস্থা করারও সময় না থাকে।'

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর সঙ্গে ইতালি যান। তাই বর্ধমান স্টেশনেও তিনি বারবার বলছিলেন, 'না হয় বম্বে এসেও চেষ্টা করে দেখো, অন্য কোনো জাহাজেও হয়ত শেষ মুহূর্তে কেউ টিকিট ক্যান্‌সেল করতে পারে।' হাওড়া থেকে বম্বেগামী ট্রেন যখন ছেড়ে দিয়েছে, সেইসময় রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে বললেন, 'প্রশান্ত, কথা শোনো, রাণীকে নিয়ে বম্বে চলে এসো, নিশ্চয়ই জায়গা পেয়ে যাবে।'

যাই হোক, নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে প্রশান্তচন্দ্ররা ইতালি পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন রোমে খোদ মুসোলিনির অতিথি। তিনি আছেন রোমের গ্র্যান্ড হোটেলে। সেখানে গিয়েই দেখা করলেন প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ। তাঁদের দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেও, বলাই বাহুল্য, প্রমাদ গুনলেন ফর্মিকি। (তথ্যসূত্র : 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', নির্মলকুমারী মহলানবিশ)

রোমে পৌঁছনোর পরের দিন সন্ধেবেলা ফর্মিকিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুসোলিনির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন শেষে রবীন্দ্রনাথ যখন হোটেলে ফিরছেন, সেইসময় ফর্মিকি জানতে চান, মুসোলিনির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কবির কী মনে হল। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানান, 'নিঃসন্দেহে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি কথায় এবং কাজে তাঁর ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। তাঁর বিরাট মস্তিষ্কের বলিষ্ঠতা দেখে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর খোদাই মনে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে এমন এক সারল্য রয়েছে তা দেখে মনে হয় না তিনি এক নিষ্ঠুর শাসক—সচরাচর যেভাবে তাঁকে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।'

মুসোলিনির জীবনীকার Denis Mack Smith তাঁর 'Mussolini' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'No doubt his personal magnetism worked best with those who saw him rarely; nevertheless he could always impress a visitor when he tried, and all the fascist leaders remembered how they had at times fallen under a real spell, especially in the early days...'

রবীন্দ্রনাথ-ও এর ব্যতিক্রমী ছিলেন না।

মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের পর দু'দিন রবীন্দ্রনাথের কোনো জনসভায় উপস্থিতি বা কোনো বক্তৃতাদানের নথি পাওয়া যায় না। তবে, ৪ জুন ইতালির রাষ্ট্রদূত-ভবনে তিনি দ্বিপ্রাহরিক আহারের আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ফিরে এসে ফর্মিকিকে বলেন, 'যতদিন মুসোলিনি থাকবেন ইতালি ততদিন নিরাপদ। ইতালির সীমানা পেরিয়ে গেলে যদি আপনার দেশের দুর্নাম শুনি, তখন আমাকে কি বলতে হবে এখন আমি জানি।' ('ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ')

রোমে দুই-একদিন থাকার পরেই টের পাওয়া যায়, ফর্মিকি সবসময়েই রবীন্দ্রনাথকে প্রায় একরকম পাহারা দিয়ে রেখেছেন। তিনি সকালবেলা হলেই কবির বাসভবনে চলে আসতেন এবং ফিরতেন রাতের খাবার সেরে। আসলে, সমস্তদিন তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে সজাগ থাকতেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে কারা আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কবির কী ধরনের কথোপকথন হচ্ছে। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—মুসোলিনির বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর কোনো মানুষ যাতে কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারেন। মুসোলিনির অতিথি হিসেবে ইতালিতে থাকার সময় অনেকেই রবীন্দ্রনাথের ইন্টারভিউ নিতেন। রবীন্দ্রনাথ ইতালীয় ভাষা জানতেন না। তাঁর ভাষামাধ্যম ছিল ইংরিজি এবং ইতালীয় ফর্মিকি সেখানে দোভাষীর কাজ করতেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ইতালীতে অনুবাদ করে দিতেন। পরদিন ইতালির সমস্ত সংবাদপত্রে সেই বক্তব্য বড় বড় হরফে প্রকাশিত হত। প্রশান্তচন্দ্র দু'তিনদিনের কাগজ সংগ্রহ করার পর বুঝতে পারলেন, রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন এবং ফর্মিকি তার যে তর্জমা করেছেন—সেই দুইয়ে অনেক পার্থক্য। ফর্মিকি আসলে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনবরত মুসোলিনি এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থার জয়গান করাচ্ছেন।

ইতালিতে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত এমন কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাননি যাতে, ফ্যাসিজমের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তিনি ধারণা করতে পারেন। যাঁদের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই মুসোলিনির কর্মদক্ষতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসলে, ফর্মিকি সেইসব মানুষকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্বাচন করেছিলেন, যারা ফ্যাসিজমের সমর্থক। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন, ফর্মিকির অনুপস্থিতিতে ক্যাপ্টেন র‍্যাপিকাভোলি নাম এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোক এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। মুসোলিনির অভ্যুদয়ের আগে থেকেই তিনি উচ্চপদে বহাল ছিলেন। তিনি ভালোই ইংরিজি জানেন, ফলে

দোভাষীর প্রয়োজন পড়ল না। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এমন একজনের পরিচয় ঘটল, যিনি ফ্যাসিজম বিরোধী, যিনি অকপটে মুসোলিনির সমালোচনা করতে পিছপা হন না।

রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জানালেন যে, তিনি ইতালির বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সঙ্গে আলাপ করতে চান। তিনি এর আগে ফর্মিকিকে সেকথা বারংবার বললেও কর্ণপাত করেননি ফর্মিকি। ক্যাপ্টেন র‍্যপিকাভোলি তখন বললেন, তিনি ক্রোচের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর সেই ইচ্ছার কথা খোদ মুসোলিনিকেই জানান। কারণ, একমাত্র মুসোলিনি অনুমোদন করলেই ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ সম্ভব। তাছাড়া তাঁর মনে হয়, ফর্মিকি আসলে চান না, ক্রোচের সঙ্গে কবির চাক্ষুষ পরিচয় ঘটুক। এর প্রধান কারণ, ক্রোচে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করায় অনেককেই ইতালি থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। ক্রোচেকেও হয়ত নির্বাসিত হতে হত, যদি-না তিনি আন্তর্জাতিক মানের দার্শনিক হতেন। রবীন্দ্রনাথ সেকথা শুনে স্তম্ভিত। এরপর র‍্যপিকাভোলি আসন থেকে উঠে চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ করে কবির কাছে বসে জানালেন, 'স্যার, আপনি বাইরে থেকে ইটালীকে যা দেখছেন এইটাই সব নয়। এর পিছনে কতজনের দুঃখ-বেদনা, অত্যাচার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তা ধারণা করতে পারবেন না। সমস্ত দেশটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে; কারো মুখ খুলবার উপায় নেই, তা হলেই বিপদ। ক্রোচের সঙ্গে দেখা হলে পাছে আপনি এই সব কথা শুনতে পান সেইজন্যই ফর্মিকি তাঁকে আপনার কাছে আনছেন না। আমি যে আপনাকে মুসোলিনির কাছ থেকে অনুমতি নিতে বলছি, সেটার কারণ, আমি তা না হলে বিপদে পড়ব। আপনি যা দেখছেন, তার চেয়ে যা দেখছেন না সেটার অংশই বেশী। ... তবে বাইরে বাইরে যে অনেক উন্নতি হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্বাধীনচেতা মানুষ, যাদের মনে একটুও সমালোচনা আছে, তারা যে ক্রমাগত দলে পিষে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে')

১৩ জুন, রোমে অবস্থানের শেষ দিন রবীন্দ্রনাথের দুটি সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল, মুসোলিনির সঙ্গে কবির দ্বিতীয় তথা শেষ সাক্ষাৎ এবং দ্বিতীয়টি হল ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ক্যাপ্টেন র‍্যপিকাভোলির পরামর্শ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সেদিন সকালে মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন। রম্যাঁ রলাঁ উভয়ের এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির কিছু সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কে মুসোলিনির সঙ্গে আলোচনায় নেমে পড়েছিলেন কবিজনোচিত স্পষ্ট নিশ্চয়তা নিয়ে ...। তাঁদের কথা হয়েছিল স্বাধীনতার সঙ্গে কর্তৃত্বের সম্পর্ক নিয়ে। মুসোলিনি বলেছিলেন, 'এমন ঐতিহাসিক ক্ষণ আসে যখন শান্তিশৃঙ্খলা এবং জনগণের কল্যাণের জন্য ডিক্টেটরীয় ক্ষমতার দাবী জানায়। তখন কিছু বিশেষ স্বাধীনতাকে মুলতুবি রাখতেই হয়। অবশ্য তা হবে এক সাময়িক চরিত্রের।' রবীন্দ্রনাথ সায় দিয়েছিলেন শুধু এই কথা বলে যে দুটির ব্যাপারে আপস করা অসম্ভব—একটি নিষ্ঠুরতা, অপরটি মিথ্যা। ...রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আপনার সম্পর্কেই সবচেয়ে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে।' অপরজন নিরীহভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি তা জানি কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।' তখন রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি এসেছিলেন প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে, কিন্তু ইতালি আসার পর যা কিছু দেখেছেন এবং শুনেছেন তাতে তাঁকে মানতেই হবে যে এই দেশে এবং সরকারের আমলে অনেক জিনিস হয়েছে যা ভালো ...।' ('ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ')

এরপর রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির কাছে ইতালির বিখ্যাত দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মুসোলিনি আপত্তি না জানালেও সেখানে উপস্থিত ফর্মিকি অনিচ্ছুকভাবে জানান যে, কবির সেই ইচ্ছা পূরণ সম্ভব নয়, কারণ, ক্রোচে তখন রোমের বাইরে কোথায় আছেন, তা জানা নেই। মুসোলিনি আদেশ দিলেন, যেভাবে হোক ক্রোচের সন্ধান পেয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করানো। পরদিন, খুব ভোরে, ফর্মিকি সেখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই ক্যাপ্টেন র‍্যপিকাভোলি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে এলন ক্রোচেকে। ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ করে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হল ফ্যাসিজম নিয়ে।

ক্রোচে প্রথমদিকে ফ্যাসিজমের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ১৯২৫-এ তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে এবং নিজেকে ফ্যাসিজম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। ক্রোচেকে শিক্ষামন্ত্রীর পদে আহ্বান করার পাশাপাশি মুসোলিনি তাঁকে ইতালিয়ান অ্যাকাডেমির প্রধান পদের জন্যেও মনোনীত করেছিলেন। ক্রোচে উভয়ক্ষেত্রেই তা প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন, 'তুমি এদেশে এসেছ, রোজ খবরের কাগজে তোমার প্রশংসাবাণী বেরোচ্ছে এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, যদি কোনো রকমে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম, তাহলে দেশের আসল অবস্থাটা তোমাকে জানিয়ে দিতাম। আমি তো তোমার লেখা পড়েছি; তোমার আদর্শ, তোমার মতামতের কথা জানি। তুমি কিছু না জেনেই এদের প্রশংসা করছ, তা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যেই আমার বেশী আগ্রহ হয়েছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার ভাগ্য ভাল, তাই এই সুযোগ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে গেলাম।' পুনশ্চ, 'একটা কথা তোমাকে আমি বলে দিতে চাই; তুমি এদের একটুও বিশ্বাস কোর না। বাইরে যা কিছু রঙীন ফানুশ দেখছ সে কেবল বাইরের লোকের মন ভোলাবার ব্যবস্থা। আসলে দেশের অত্যন্ত দুঃখের দশা চলছে। কোনো রকম ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই। ফ্যাসিজম সম্বন্ধে অতি মৃদু আপত্তিও এরা সহ্য করে না, তখনি তাকে পিষে ফেলবার ব্যবস্থা হয়। আমার নিতান্ত বাইরের জগতে একটা খ্যাতি আছে, তাই আমার গায়ে এখনও হাত দেয়নি। কিন্তু আমারও মুখ এরা সম্পূর্ণ বন্ধ করেছে। আমার কোনো কথা কারোকে জানাবার উপায় নেই। নিতান্ত চুপচাপ রয়েছি, তাই এরা আমাকে ছেড়ে রেখে দিয়েছে; তা না হলে আমিও এতদিনে শেষ হয়ে যেতাম। ফ্যাসিজমের বিন্দুমাত্রও বিরোধী যারা তাদের পক্ষে এদেশ নিরাপদ নয়। সমস্ত দেশের মানুষ এখানে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। এটাকে কি তুমি প্রশংসা করতে পার? মানুষের মনের স্বাধীনতার যেখানে মূল্য নেই, সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কখনও দেশকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না। দেশের লোকের মনই যদি মরে গেল, তাহলে ঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়ছে কি না-ছাড়ছে তা দিয়ে কী হবে? এখানে লোক কারো সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলতে পারে না। কাউকেই বিশ্বাস করা শক্ত, কারণ কে যে সরকারের গুপ্তচর তা তো জানা নেই। হঠাৎ দেখবে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, জেলে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করছে। তার কোনো বিচার নেই, কারো কাছে আপীল করবার উপায় নেই। মানুষ এখানে সম্পূর্ণ অসহায়।'

ক্রোচে চলে যাওয়ার পর ফর্মিকি এসে জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইতিমধ্যেই দার্শনিকের সাক্ষাৎ ঘটেছে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন তাঁর অনুগত ভক্ত তথা ফরাসী আর্টিস্ট আঁদ্রে কার্পেলের সঙ্গে। আঁদ্রে জানালেন, 'জানেন গুরুদেব, এ দেশে কীরকম ডিমোক্র্যাসি? একটা লালফুল পরবারও স্বাধীনতা নেই।' কেন? কারণ, ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকার মনে করে, লাল ফুল পরার অর্থই হল কমিউনিজমকে সমর্থন করা। ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে')

ক্যাপ্টেন র‍্যপিকাভোলি এবং ক্রোচের কাছ থেকে মুসোলিনি ও ইতালির ফ্যাসিজম সম্পর্কে শোনার পর

আঁদ্রের মুখেও একই বর্ণনা শুনে, রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জাগল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-ও তখন ভরসা করে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে, কবির বক্তব্য কীরকম বিকৃত তর্জমায় ইতালি-সহ বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে পরিবেশিত হচ্ছে। যেমন—

১১ জুন, ১৯২৬-এ ব্রিটেনের 'Daily News'-এ প্রকাশিত হল : 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইতালিতে মুসোলিনির অতিথি হয়ে আছেন। তিনি ফ্যাসিজ্‌ম সম্বন্ধে এবং যিনি ফ্যাসিজ্‌মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও স্বীকার করেছেন ইতালিতে যে নীতি উপযুক্ত তা অন্যদেশে প্রয়োগ করলে সমান উপকার না-ও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি শুধু দেখে যাচ্ছি, বাইরে থেকে সমালোচনা করতে চাই না। আমি খুশি এই কারণেই যে এমন একজনের কাজ দেখার সুযোগ পেলাম যিনি অবশ্যই এক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর এই সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" ভারতবর্ষের 'Madras Mail'-এ ১৭ জুন প্রকাশিত হয়, 'ড. রবীন্দ্রনাথ টেগোর ইতালিতে মাত্র কয়েকদিন থেকেই এবং ইতালি থেকে নির্বাসিত অল্পসংখ্যাক মানুষ—যাদের মধ্যে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা না করেই ফ্যাসিজ্‌ম সম্বন্ধে প্রশংসা করে চলেছেন (যদিও তিনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন)—যে ফ্যাসিজ্‌ম, সহনশীলতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি তাঁর নিজস্ব উদারনৈতিক মতবাদের ঘোর পরিপন্থী। জানতে ইচ্ছা করে টাইরোলে মুসোলিনির উগ্র সাম্রাজ্যবাদিতা নিয়ে ড. টেগোর সত্যি কী ভাবছেন?' ('ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ')

কিন্তু মুশকিল হল, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে বিকৃত করা হয়েছে, তা শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানালেই তো হল না, সেজন্যে প্রমাণ দরকার।

ইতালি পরিত্যাগের আগে রবীন্দ্রনাথের শেষ সফর ত্যুরিনে। ১৯২৬-এর ১৮ জুন যখন তিনি ফ্লোরেন্স থেকে ট্রেনে ত্যুরিনে আসছিলেন, সেইসময় পথে মিলান স্টেশনে ডিউক স্কত্তি-র সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হয়। একসময় সকলের অলক্ষ্যে তিনি কবিকে জানান, 'বেশি কথা বলার সময় নেই। আপনি বাইরে থেকে যা দেখছেন তাতে মুগ্ধ হবেন না ইতালির অবস্থা সত্যিই খারাপ ... কারো কোনও স্বাধীনতা নেই।'

রবীন্দ্রনাথ যখন সদলবলে ত্যুরিনে, সেইসময় অপেক্ষাকৃত কমবয়সী একজন মহিলার সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের পরিচয় হয়, যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ভাল ইংরিজি জানেন। ঘটনাচক্রে প্রশান্তচন্দ্র-ও কেম্ব্রিজের প্রাক্তন ছাত্র হওয়ায় খুব সহজেই দুজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় গড়ে উঠল। প্রশান্তচন্দ্র তখন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জানালেন যে, ইতালীয় সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য-কেন্দ্রিক পরিবেশিত সংবাদগুলির ইংরিজি তর্জমা তিনি করে দিলে বিশ্বভারতী বুলেটিনে ছাপানোর কাজে সুবিধে হয়। মহিলা সেই অনুবাদ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সংবাদপত্রের কর্তিত অংশগুলি তিনি নিতে নারাজ। কারণ, ফ্যাসিস্ট ইতালিতে কেউ যদি জানতে পারেন যে, তিনি-ই সেই তর্জমা করে দিয়েছেন, তাহলে তাঁর বিপদ বাড়বে। কাজেই প্রশান্তচন্দ্র যেন সকলের অলক্ষ্যে সেই কাগজগুলির কাটিং তাঁকে দেন। এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখছেন, 'কী সাংঘাতিক অবস্থা! প্রকাশ্য সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছে সেই জিনিসটাই যদি ইংরিজি ভাষায় কেউ তর্জমা করে দেয়, তাহলেই তার উপর অত্যাচার হবে? ক্রমে বর্তমান রাষ্ট্রের ছবি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল।'

তর্জমা হল। প্রশান্তচন্দ্র নিজে তা পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথকেও সেই অনুবাদ পড়ে দেখালেন। কবি বুঝলেন, তাঁর মুখের কথা ফর্মিকি বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন করে নিজের কথা বসিয়ে সাংবাদিকদের কাছে এমনভাবে

পরিবেশন করেছেদন, যাতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, কবি ইতালিতে পদার্পণ করা থেকে শুরু করে সবসময়েই মুসোলিনির প্রশংসা করে চলেছেন এবং সেই দেশের সমস্তকিছু দেখেই তিনি মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ-যে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, বাইরের সাফল্যই কোনো দেশের একমাত্র কাম্যবস্তু হতে পারে না, রাষ্ট্রের মানুষের মন দেশে কীভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, সেইটিই দেশের সাফল্যের প্রধান পরিচয়—সেইসব প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ ফর্মিকি করেননি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ ভিলন্যভে পৌঁছে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর বোন সেই বক্তব্য তর্জমা করলেন। জানালেন, 'আমার ভাই বলছেন, আপনি এ কী করে এলেন মুসোলিনির দেশে গিয়ে? আপনার মত লোকও যদি ফ্যাসিস্ট সরকারের এত প্রশংসা করে, তাহলে পৃথিবীর প্রগতিশীল লোক যারা, তারা কার মুখের দিকে তাকাবে? আপনিও যদি ওদের দিকে চলে যান তাহলে এই মারাত্মক ফ্যাসিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে কারা? মানব-কল্যাণের কামনায় আপনি হচ্ছেন আমাদের সকলের অগ্রণী। আজকের দিনে পৃথিবীতে, যে কোনো জায়গাতেই হোক না কেন, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দাসত্বের বিরুদ্ধে জীবন পণ ক'রে অভিযান চালাচ্ছে, তারা সকলেই আপনার মুখের দিকে তাকায়, আপনার মুখ থেকে উৎসাহের বাণী শুনতে চায়। বিশ্বজোড়া অশান্তির মধ্যে আপনি আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছেন, এই ঘৃণ্য ফ্যাসিজম্ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। তাতে আপনি কী ক'রে সায় দিতে পারলেন? সারা য়ুরোপে আপনার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে, বড় বড় হেডলাইন দিয়ে ইটালী থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, আপনি নিজের চোখে মুসোলিনির রাজত্ব দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন, ক্রমাগত তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। আমরা ব্যথিত চিত্তে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি আপনার এই রকম মতের পরিবর্তনে।'

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত। বললেন, 'আমি বলেছি এই সব কথা? তোমরা কী ক'রে বিশ্বাস করতে পারলে যে, আমার মতের এতটা পরিবর্তন ঘটেছে?' রম্যাঁ রলাঁ তখন বিভিন্ন খবরের কাগজের সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখালেন যে, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের নামে অপপ্রচার চালানো হয়েছে—সেখানে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই, আছে শুধু বিমুগ্ধ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'আমি বলিনি এসব কথা। আমি তো ওদের ভাষা জানি না, তাই আমার যা বক্তব্য তা ইংরিজিতেই বলেছি; প্রফেসর ফর্মিকি আমারই সামনে সেগুলো রিপোর্টারদের কাছে ইটালীয়ান ভাষায় তর্জমা করে দিয়েছেন। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এইরকম ক'রে আমার নামে মিথ্যা প্রচার করছে।' ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে') পুনশ্চ, '...আমাকে বলা হয়েছে ইতালিতে এক সময় প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় মানুষের ধারণা হয়েছিল দেশ যদি এক প্রভুত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তিনি হয়তো শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারেন। আমাকে বলা হয়েছে ইতালিতে ঠিক এটাই ঘটেছে। মুসোলিনি আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের যা দুরবস্থা ছিল এখন তার থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে আগে শান্তিকামী নাগরিকরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বাইরে বেরতে পারতেন না; বের হলেই লুট-পাট, খুন-জখমের সম্ভাবনা ছিল।' ('ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ')

রম্যাঁ রলাঁ যখন বুঝতে পারলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে অপপ্রচারের শিকার, তিনি আসলে এই ব্যাপারে আদৌ দায়ী নন, তখন রলাঁর মানসিক ক্ষোভ কিছুটা কমল বটে। কিন্তু মুসোলিনির এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যে রবীন্দ্রনাথের উচিত হয়নি, সেই কথাও জানালেন তিনি। এরপর তিনিই রবীন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিলেন, 'ফ্যাসিজম-এর অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানুষ যে দু-চারজন পালাতে পেরেছে, আমি তাদের সঙ্গে তোমার দেখা

করিয়ে দেব। তুমি আগে তাদের কাছে নিজের কানে সব শুনো,—কী বীভৎস কাণ্ড ওরা করছে, তারপর তোমার প্রবন্ধ লিখো।' ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে')

রবীন্দ্রনাথের মন তখন আশ্চর্য্যভাবে দ্বিধান্বিত। একদিকে তিনি ইতালীয়দের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস, অভ্যর্থনা, রাজসিক সরকারি সংবর্ধনা, বিশ্বভারতীর জন্য মুসোলিনির অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারছেন না; অন্যদিকে মুসোলিনি ও তাঁর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ক্রোচে, রলাঁ, ডিউক স্কত্তি প্রমুখ মানুষের কাছ থেকে যা নিজে কানে শুনছেন, তাকেই-বা অস্বীকার করবেন কী করে? তবুও, রলাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনেই অবশেষে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে রাজি হলেন। রলাঁ প্রথমে চেয়েছিলেন, ইতালি থেকে বহিষ্কৃত বা দেশত্যাগী মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে সাক্ষাৎ করে তারপর প্রবন্ধ লিখুন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত সেইরকম কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটেনি এবং ইতালি সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে যা দেখানো হয়েছিল, সেখানে প্রতিবাদের কিছু ছিল না। তবুও তিনি তাঁর বক্তব্য লিখিতভাবে দিতে সম্মত হলেন। সিদ্ধান্ত হল, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতিবাদপত্রটি যাতে যথাতথ প্রকাশিত হয়, সেইজন্য ঔপন্যাসিক দুয়ামেল এক লিখিত প্রশ্নপত্র তৈরি করে দেবেন এবং তার উত্তর লিখবেন রবীন্দ্রনাথ। সেইমতো, ৩০ জুন সকালে দুয়ামেলের প্রশ্নগুলি ইংরিজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ উত্তর লিখলেন। নৈশাহারের পর সেই বক্তব্য পাঠ করা হল। কী লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

রলাঁ তাঁর জার্নাল 'Inde' তে লিখছেন, 'প্রবন্ধটি ফাঁদা হয়েছে অস্পষ্ট ও এলোমেলো রীতিতে, যথাযথ উত্তরের ধারে-কাছে যায়নি। আত্মসন্তুষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ এতে লিপিবদ্ধ করেছেন "ভালোবাসা" ও শ্রদ্ধার সাক্ষ্যগুলিকে, ইতালিতে তিনি যার ভাজন হয়েছিলেন। তিনি ভালোই ইঙ্গিত করেছেন—কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে—যে, তিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের অতিথি ছিলেন এবং সরকারের চোখ দিয়েই সব দেখেছেন। তত্ত্ব ও বক্তৃতার ঢঙে তিনি ফ্যাসিজ্‌মের তাত্ত্বিক জনৈক ইতালীয় অধ্যাপকের সঙ্গে—যার নাম তিনি দেননি—ফ্যাসিজ্‌মের বিমূর্ত নীতিগুলো সম্পর্কে এক তৃপ্তিদায়ক ও সৌজন্যপূর্ণ আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন; ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সব তিনি সমর্থন করেন না, —কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই ভঙ্গিতে যে ভঙ্গিতে দর্শনের ক্ষেত্রে অধ্যাপকসুলভ কোনো হৃদয়াবেগ ছাড়াই পক্ষ-প্রতিপক্ষ খাড়া করা হয়, যা জীবনকে আগ্রহী না করে আগ্রহী করে তোলে মনকে। তড়িঘড়ি তিনি যোগ করেছেন যে, ফ্যাসিজ্‌মের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি বিচার করতে পারেন না, তিনি কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেননি, কিছুই বোঝেননি, কিছুই জানেননি, তিনি হাত ধুয়ে ফেলেছেন। অবশেষে তিনি হঠাৎ থেমে গেছেন মুসোলিনির সঙ্গে ডবল সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে; তাঁর এক স্তুতিকর ছবি এঁকে; মুখের ওপরের দিকে অদম্য প্রাণশক্তি, নিচু দিকে মানবিক স্নিগ্ধতা; তাঁকে তুলনা করেছেন আলেক্‌জান্ডার ও নেপোলিয়নের সঙ্গে; এবং শেষ করেছেন কয়েক লাইনে, —সেখানে তিনি এইসব কর্মবীরের চেয়ে চিন্তাবীরদের প্রতি তাঁর নিষ্কাম পক্ষপাতিত্ব জানিয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথের এহেন প্রতিবাদে সকলেই হতাশ হলেন। শেষে কবিকে অনুরোধ করা হল, ইতালি থেকে নির্বাসিত মানুষদের সঙ্গে দেখা না করে, বিশেষত লণ্ডনে সাল্‌ভেমিনি এবং জুরিখে সাল্‌ভাদোরীর সঙ্গে দেখা না করে যেন কোনও প্রতিবাদপত্র প্রকাশ না করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন এবং জানালেন, তিনি ওই প্রবন্ধটি আরও একবার দেখে বিস্তারিতভাবে ফ্যাসিজমের সমালোচনা করবেন। রলাঁ ইতিমধ্যে সাল্‌ভেমিনি এবং সাল্‌ভাদোরীকে চিঠি দিয়ে জানালেন, তাঁরা যাতে যথাস্থানে ও যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ('ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ')

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে এলেন সুইৎজারল্যান্ডে। একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রফেসর সালভাদোরীর স্ত্রী মাদাম সাল্‌ভাদোরী। তাঁর স্বামী শয্যাশায়ী, তাই তিনিই এসেছেন কবির কাছে ফ্যাসিস্ট ইতালির স্বরূপ জানাতে। মাদাম সাল্‌ভাদোরী বললেন, একবার তাঁর স্বামী একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, যার বিষয়বস্তু ছিল, মানুষের চিন্তাপ্রকাশের স্বাধীনতা বন্ধ করে দিলে তা কোনো একটি দেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক ও শোচনীয় হতে পারে। শুধু সেই অপরাধেই ইতালীয় পুলিশ অধ্যাপক সাল্‌ভাদোরীকে থানায় ডেকে পাঠায়। বাবার বিপদের আঁচ অনুভব করে সঙ্গে যায় তাঁর ছেলে। থানায় উপস্থিত হওয়ামাত্রেই কোনো কারণ না দর্শিয়ে পিতা-পুত্র উভয়ের ওপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। যখন তাঁরা প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পৌঁছলেন, সেইসময় তাঁদের সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামী ও ছেলে বাড়ি ফেরার পর সেই রাতেই মাদাম সাল্‌ভাদোরী সপরিবার ইতালি থেকে পালিয়ে সুইৎজারল্যান্ডে চলে আসেন। এই ঘটনার বিবৃতি শেষ করে তিনি বললেন, 'আমরা যখন কাগজে পড়লাম যে তুমি ক্রমাগতই মুসোলিনি এবং তার বর্তমান রাষ্ট্রশাসনের প্রশংসা করছ, তখন থেকে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি। তুমিও যদি ওদের দলে চলে যাও তাহলে আমরা আর কার মুখের দিকে তাকাব? তাই আমরা রোলাঁকে লিখেছিলাম যে তিনি যেন আমাদের দুঃখ অত্যাচারের কথা তোমাকে বলেন। তিনি আমাদের লিখলেন, তুমি জ্যুরিকে আসছ, আমরা যেন নিজেরা দেখা ক'রে সব ঘটনা তোমাকে বলি।' ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে')

স্তম্ভিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন সব। শেষে বললেন, 'আমার একটুও ধারণা ছিল না যে, ফর্মিকি এইভাবে আমার নামে মিথ্যা প্রচারকার্য চালাচ্ছে। তোমরা কি বিশ্বাস কর, যে-আমি বিশ্বমানবতার কথা বার বার আমার সাহিত্যে প্রচার করছি, সেই আমিই এই দানবিক মতামত এবং পাশবিক অত্যাচারের সমর্থন করতে পারি? ...ভারতে থাকার সময় মাঝে মাঝেই ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের খবর পেতাম তাই ইতালিতে আসার ব্যাপারে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এমন সময় অধ্যাপক ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন আমাদের শিক্ষায়তনের জন্য সাহিত্য ও শিল্পকলার একাধিক বই ও প্রতিলিপি। সেইসঙ্গে ছিল মুসোলিনির পাঠানো এক সপ্রশংস চিঠি। এক আন্তর্জাতিক মানবতার পীঠস্থান যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে এসে মিলিত হবে—এই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আমার সংগঠনে প্রেরিত বইগুলি খুবই সাহযায্য করবে—তাই সমগ্র উপঢৌকনটি আমাকে চমৎকৃত করেছিল। মুসোলিনির অনুমোদিত অধ্যাপক ফর্মিকি ও ড. তুচ্চির পরিষেবাও আমাদের কাজে সাহায্য করেছিল। মুসোলিনিকে আমি তাঁর প্রেরিত উপঢৌকনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠি দিই। সেই চিঠির বক্তব্য মূলত ধন্যবাদজ্ঞাপন, আততে কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ ছিল না। অধ্যাপক ফর্মিকি এবং ড. তুচ্চি ইতালিতে আসার জন্য আমাকে প্রায়ই পীড়াপীড়ি করতেন কিন্তু তখনো আমার দুর্ভাবনা ঘোচেনি। এক সময় আমি ইতালিতে না আসার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমাকে প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে। এ ছাড়া, রোঁমা র‍্যলাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটানোর এক অদম্য ইচ্ছা ছিল। এই আমার শেষ সুযোগ। তাই আমি ইতালিতে এসেছিলাম এবং রোমে উঠেছিলাম।

'ফ্যাসিস্ট সংগ্রামের উৎপত্তি এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আমার ভাবনাচিন্তা করার সুযোগ হয়নি এবং এই প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্য করিনি বরঞ্চ প্রায় প্রতি সাক্ষাৎকারে আমি খুব সাবধানতার সঙ্গে বলেছি ভাবনাচিন্তা না করার জন্য সংগঠিত ফ্যাসিজ্‌ম সম্বন্ধে কিছু বলার উপযুক্ত আমি নই।

'তবে মুসোলিনির কথা বলতে গেলে আমি অবশ্যই বলবো শিল্পী হিসেবে তিনি আমার কৌতূহল উদ্রেক করেছিলেন। আমিও শিল্পী তাই যেখানেই মানবিক উপাদান আছে, এমনকি রাজনীতিতেও, তা আমাকে বিমূর্ত কোনও কিছুর থেকে বেশি স্পর্শ করে। বর্তমান সভ্যতা খুবই বিজ্ঞানভিত্তিক সুতরাং তা আমার কাছে নৈর্বক্তিক। তাই ব্যক্তিমাত্রই আমাকে কৌতূহলী করে থাকে। আমাদের ভারতীয় সম্রাট আওরংজীবের কথাই ধরুন না। তিনি নৃশংস শাসক ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়। তাঁর সম্বন্ধে আমার উৎসাহের কারণ এই নয় যে আমি তাঁর কার্যকলাপ সমর্থন করি। কাজের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ভালো হতে পারে আবার না-ও হতে পারে; কিংবা খুবই সাঙ্ঘাতিক হতে পারে, কিন্তু যখন তাঁর কাজ প্রবলভাবে প্রতীয়মান হয় তখন তা আকর্ষণীয় তো বটেই। এক নাটকীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে নীতির বিচার এবং তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। মুসোলিনির কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করেছিল। কেবলমাত্র ক্ষমতার দৃঢ়তা নয়, তৎপরতার সঙ্গে প্রকৃত সুযোগের ব্যবহার—এই সমস্ত গুণের জন্য তিনি সমগ্র জনসাধারণের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা রাখেন। তাঁর এই নাটকীয় ব্যক্তিত্ব আমার কল্পনায়—বন্য ঘোড়ায় আরোহী একজন তাঁর অসামান্য ক্ষমতায় উন্মাদ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন—এই চিত্রটি ভেসে ওঠে। আর তখনই মনে হয় সারা দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কাজ সমর্থনযোগ্য।

'আমি ফ্যাসিজ্‌ম সমর্থন করিনি। মুসোলিনির প্রশংসা করেছি মাত্র এবং সেই প্রশংসাও শিল্পী হিসেবে। আমি দুটি ব্যাপার সাবধানতার সঙ্গে আলাদা রাখার চেষ্টা করেছি। এক শিল্পী হিসেবেই তাঁকে উল্লেখ করেছি। যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁরা সবাই একবাক্যে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ফ্যাসিজ্‌ম ইতালিকে অর্থনৈতিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।'

সাল্‌ভাদোরী জানান, '... মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার আগেই সোশ্যালিস্টরা তাদের ভুল বুঝতে শুরু করেছিল। তিনি তাঁর নৃশংস ক্ষমতার বলে তাদের বাগস্বাধীনতা চূর্ণ করে দিয়েছেন।'

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ : '... এখন বুঝতে পারছি কেন বিদেশিরা বিশেষত ইংরেজরা এই রাজনৈতিক নৃশংসতাকে ক্ষমতার চোখে দেখছেন। তাদের নির্মম স্বভাব যা এখন সারা পৃথিবীতে প্রকটিত হয়ে উঠেছে তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধের পর পৃথিবী হিংস্রতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ... ক্ষমতাসীন ব্যক্তির দৌরাত্ম্য নিয়ে ইয়োরোপ খুব একটা মাথা ঘামায় না। আপনি যে ধরনের বর্বরতার কথা বলছেন আমার বিশ্বাস যুদ্ধের আগে হলে ইয়োরোপের বোধবুদ্ধিকে নিশ্চিতভাবে নাড়া দিত।'

সাল্‌ভাদোরী তখন বলেন, 'কিন্তু ইতালির কাগজে কিছুই বের হয়নি। তারা কিছুই প্রকাশ করেনি। ফ্লোরেন্সে একরাত্রে ১৮ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে; বাবাকে ঘুম থেকে তুলে, ছেলেমেয়েদের আর্তচিৎকার 'বাবাকে মেরো না'—তার মধ্যেই বিছানায় খুন করা হয়েছে ...। কী অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের দিন কেটেছে তা আপনারা জানেন না। স্বামীকে স্ত্রীর সামনে হত্যা করা হয়েছে ...; তার আর্তনাদ আমি নিজের কানে শুনেছি। কাগজে কোথাও সেই খবর নেই—কখনোই নেই।'

এসব শোনামাত্র রবীন্দ্রনাথ জানান, 'ইতালিতে এই ধরনের কালিমালিপ্ত ঘটনার কথা আগে যদি জানতাম, তাহলে কখনোই এদেশে আসতাম না, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসতাম না। এর আগে কোনও নির্যাতিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সবকিছু শুনে আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।' পুনশ্চ, 'এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে। আমি বলব সারা পৃথিবীর লোককে যে

কী রকম চাতুরি ক'রে ওরা আমাকে ব্যবহারে লাগিয়েছে নিজেদের শয়তানি প্রচারকার্য চালাবার জন্য। আমি আজই আমার প্রতিবাদ লিখতে বসব।'

১৯২৬-এর ১৪ জুলাই ভিয়েনার ব্রিস্টল হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন অ্যাঞ্জেলিকা ব্যালাবানফ এবং মোদিগ্লিয়ানি। দুজনেই ইতালি থেকে নির্বাসিত হয়ে ভিয়েনায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অন্য অনেকের মতো, তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝে খোদ্ তাঁর কাছ থেকেই ফ্যাসিস্ট ইতালি ও শাসক মুসোলিনি সম্পর্কে শুনতে এসেছেন। তাঁরাও ফ্যাসিস্ট শাসনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে কবিকে অবহিত করলে রবীন্দ্রনাথ জানান, 'দয়া করে ভুল বুঝবেন না। যখন ইতালিতে এসেছিলাম তখন এর আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছু জানতাম না। বাস্তবে কি হচ্ছে তা জানার কোনও সুযোগ ছিল না। আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর কাছ থেকে ফ্যাসিজ্‌ম কী তা জানতে পারলাম। প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ইতালি ছাড়ার পর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ফ্যাসিস্ট রাজত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণা শীঘ্রই এক বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।'

সাল্‌ভাদোরী, ব্যালাবানফ এবং মোদিগ্লিয়ানির সঙ্গে কথোপকথনের পর রবীন্দ্রনাথের মনে আর কোনো সংশয় থাকল না যে, ইতালিতে মুসোলিনির আতিথ্যগ্রহণ তাঁর জীবনের এক অন্যতম অনিচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি তখন ফ্যাসিজমের সমালোচনা করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন অ্যান্ড্রুজকে। অ্যান্ড্রুজ তখন ভারতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানালেন, চিঠিটি যাতে ভারতীয় প্রেস প্রকাশ করে। এই মূল চিঠিটি পাওয়া যাবে 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ডে এবং এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কল্যাণকুমার কুণ্ডুর 'ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে।

ফ্যাসিজমের সমালোচনায় অ্যান্ড্রুজকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চিঠিটি প্রকাশের পর 'প্রবাসী'র আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'Modern Review'-এর অক্টোবর ১৯২৬ সংখ্যায় 'Notes' অংশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে লেখা হয়, '... কবি পূর্ব্বে ইতালীয় গভর্ণমেন্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও তৎপরে তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দের মনে যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভজনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাও না হইলেই ভাল হইত ... যদি তিনি বা তাঁহার কর্মসচিবগণ উন্মুক্ত চক্ষু অবস্থায় সঙ্কীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ উন্নত ও উদার—বিশ্বপ্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য্য করেন ও দ্বিতীয়তঃ যে কোন কারণ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনির আতিথেয়তার প্রতিদান করেন; তাহা হইলে অন্তত একথা বলিতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই। দার্শনিক কবি সকল বাহ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন, ... কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (যাঁহারা যুবক, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ, তাহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর মুসোলিনির গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন? ... ইতালীয় গভর্ণমেন্টের সহিত সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাদিগের সেই মনোভাবের পরিচয় পাই, যে পরিচয় আমরা তাঁহাদিগের বিশ্বভারতীর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষানীতির আজন্ম সমালোচক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যখন বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন আমরা সে-চেষ্টার মধ্যে compromise বা আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া লাভের চেষ্টার পরিচয় পাই। এই অল্প লাভের আশা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান ব্যক্তির

কল্পনাপ্রসূত নহে। কারণ যে-কবি, যে-মহাপুরুষ স্থান কাল ও পাত্রের সকল প্রলোভন, অত্যাচার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষাধিককাল নিজের জীবনের আদর্শের গতি শ্রেয়ের পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কদাপি ক্ষুদ্র সুবিধার চেষ্টায় আদর্শকে বলিদান দিতে পারেন না। যে অদূরদর্শিতায় ও আদর্শনিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ঘটিত ব্যাপারে প্রথম পাই, আজ কবির কর্মসচিবদিগের ইতালীয় 'এডভেনচারে' আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীব দফায় পাইলাম।'

'Modern Review'-এর সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'Tagore's Condemnation of Fascisim'। ওই পত্রিকারই অক্টোবর ১৯২৬-এ প্রকাশ পায় 'Dr. Tagore's European Tout'। উভয়ক্ষেত্রেই 'প্রবাসী' পত্রিকার মতোই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে রামানন্দকে 'আপনার চিঠি' বলে যে-চিঠিটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেটি আসলে জেনিভা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রামানন্দের চিঠি। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রবাসী মডার্ণ রিভিউতে আপনার ইটালী বৃত্তান্ত নিয়ে যে সব ভুল কথা লেখা হয়েছে সেটা যাতে আবার ঠিক ক'রে দেওয়া হয়, তা আমি দেখব। প্রশান্ত এবং রথী যে আপনার আসার বিপক্ষে ছিলেন, সেকথা জানিয়ে দেব। আপনার নিজের সম্বন্ধে যে সব ভুল কথা লেখা হয়েছে তা আপনি যদি সংশোধন ক'রে নিজে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে দেন, তাহলে খুশী হব। অন্যান্য অনেক কাগজের মতো প্রবাসী আপনার শত্রু নয়। গত বছর ফরোয়ার্ডে যখন আপনার সম্বন্ধে সুধীন্দ্র বোসের (ইটালী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে) লেখা বেরোয় তখন ক্ষুদুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার একটা লম্বা জবাব মডার্ণ রিভিউতে ছাপিয়েছিল। কাজেই তার সম্বন্ধে আপনি ভুল করবেন না।'

'সরলা যখন আপনার সম্পাদকের ... চেষ্টা করি নি।' :

'প্রবাসী'তে লিখেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সম্মানদক্ষিণা পান। সাময়িক পত্রের লেখককে এই দক্ষিণাদান প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক সরলা দেবী কটাক্ষ করলে তার প্রত্যুত্তরে 'সবুজপত্র' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তারপরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

'প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন, তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

'কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য

করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।'

'প্রথমতঃ বুঝতে হবে তার পরিচয় পেয়েছি।' :

কেন একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ? এর উত্তর পেতে গেলে মুসোলিনির ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ।

বেনিতো অ্যামিলকেয়ার আন্দ্রিয়া মুসোলিনির জন্ম ১৮৮৩-র ১৯ জুলাই—ইতালির রোমানা অঞ্চলের পারদাপ্পিওতে গ্রামে। মুসোলিনির মা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। বাবা আলসেন্দ্রো পেশায় কামার হলেও প্রায় সারাদিনই তিনি অতিবাহিত করতেন পাড়ার সোশালিস্ট পার্টির অফিসে। সেখানে বিপ্লব সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ ও ইস্তেহার পড়ে তিনি সময় কাটাতেন। কথিত আছে যে, মাঝে মাঝে আলসেন্দ্রো তাঁর বাড়িতেও সবাইকে ডেকে মার্কসের 'Das Kapitol' পড়ে শোনাতেন, কখনও-বা আলোচনা করতেন মাট্‌সিনি বা মেকিয়াভেলির জীবন। অর্থাৎ, ছোটবেলা থেকেই মুসোলিনি এক সোশালিস্ট পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন। বাবার সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সোশালিস্ট পার্টির সভাতেও যেতেন।

মুসোলিনির যখন আঠারো বছর বয়স, তখন তিনি একটি প্রাথমিক স্কুলে কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন এবং সেই সময় থেকেই তাঁর মনে আন্তর্জাতিক সোশালিজম্ নিয়ে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। তিনি নিজেকে সোশালিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং স্থানীয় সোশালিস্ট দলের সদস্য হয়ে নানা বামপন্থী পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। পত্রিকা সম্পাদনা এবং সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন মুসোলিনি। ১৯০২-এ মিলিটারি সার্ভিসকে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয় ইতালিতে। মুসোলিনি সেই সার্ভিসে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই, চাকরিপ্রাপ্তির মিথ্যে অজুহাতে তিনি পালিয়ে যান সুইৎজারল্যান্ডে। সেখানকার সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এরপর মুসোলিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। কখনও ফ্রান্স, কখনও জার্মানি, কখনও-বা অস্ট্রিয়া। ফরাসী ও জার্মান শিখে তিনি ইতালিতে ফিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিলিটারিতে যোগদান করেন। ১৯০৮ থেকে মুসোলিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সেইসময় তিনি 'La Lima' নামে একটি সোশালিস্ট পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ তাঁর চরম বামপন্থী মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর তিনি 'Popolo' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। মাত্র তিন মাস সেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেই মুসোলিনি, পত্রিকা জনপ্রিয় করার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন।

গোঁড়া সোশালিস্ট মুসোলিনি তখনও রাজনৈতিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে চলেছেন। এইসময়, ফোর্‌লির সোশালিস্ট ক্লাব তাঁকে একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার আহ্বান জানায়। মাত্র চার পৃষ্ঠার সেই পত্রিকার নাম দেন মুসোলিনি—'La Lotta di Classe' ('The Class Struggle')। কীভাবে কোনো পত্রিকা জনপ্রিয় করতে হয়, সেই কৌশল মুসোলিনি আগেই শিখেছিলেন। ফলে, মাত্র এক বছরে—'La Lotta di Classe' পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত হতে থাকে। ১৯১০-এ সোশালিস্টদের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতে মিলানে আসেন মুসোলিনি। জাতীয় মঞ্চে সেই তাঁর প্রথম উত্থান। ইতালির রাজনীতিতে সোশালিস্টরা তখন নরম ও চরমপন্থার মাঝামাঝি এক সংখ্যালঘু দল। সেই সভায় মুসোলিনির বক্তব্যবিষয় ছিল, বিশ্বের নিগৃহীত ও অত্যাচারিত মানুষের স্বার্থে স্বশস্ত্র আন্দোলন-ই হল একমাত্র পথ। ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিওলেত্তি লিবিয়া আক্রমণ করেন। সেইসময় ওই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের

তীব্র বিরোধিতা করেন মুসোলিনি। শুধু তাই নয়, সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্টে উস্কানি দেওয়ার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মুসোলিনিকে। জেল থেকে বেরিয়ে মুসোলিনি দেখেন, তাঁর জনপ্রিয়তা আগের থেকে বেড়েছে। সেই জনপ্রিয়তাকে মূলধন করেই তিনি আগামী সোশালিস্ট পার্টির অধিবেশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হলেন। এই কংগ্রেস অধিবেশনের চার মাস পর বিখ্যাত সোশালিস্ট দৈনিক 'L'Avanti' সম্পাদনার সুযোগ পান মুসোলিনি। বুদ্ধিজীবী পাঠকের পরিবর্তে তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সমাজের অত্যাচারিত, নিগৃহীত নিচুতলার মানুষ। ফলে, অত্যন্ত দ্রুত এই পত্রিকার পাঠকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯১৩-র নির্বাচনে প্রায় দশ লক্ষ ভোটার সোশালিস্ট পার্টিকে ভোট দেয়। সংসদে মোট তিপান্নটি আসন দখল করে সেই পার্টি। এই বিপুল সাফল্যের প্রেক্ষাপটে 'L'Avanti' পত্রিকার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

১৯১৪য় শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মুসোলিনি প্রথমে সেই যুদ্ধে ইতালির অংশগ্রহণকে সমর্থন করেননি। কারণ, তখনও তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক নেতা। কিন্তু, ১৯১৫ সালের ১৮ অক্টোবর, হঠাৎই নিজের মত পরিবর্তন করলেন মুসোলিনি। জানালেন, তাঁর এতদিনের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। তাই তিনি মনে করেন, ইউরোপীয় দুর্যোগের দিনে ইতালির নিরপেক্ষ থাকা উচিত নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় সোশালিস্ট পার্টির সমর্থকরা প্রথমে বিহ্বল হলেও পরে তাঁরাই মুসোলিনির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মুসোলিনিকে 'বিশ্বাসঘাতক', 'খুনি' বলতেও পিছপা হলেন না তাঁরা। এর ফলস্বরূপ সোশালিস্ট পার্টির সংস্রব চিরকালের জন্য মুসোলিনিকে ত্যাগ করতে হল। সোশালিস্ট দৈনিক 'L'Avanti'-র সম্পাদনাকার্য থেকেও সরে দাঁড়াতে হল তাঁকে। এর মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে মুসোলিনি 'Il Popolo d'Italia' নামে একটি নতুন দৈনিক প্রকাশ করলেন, যার মূল মন্ত্রই ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার। তিনি জানালেন, 'পৃথিবী জানুক ইতালি যুদ্ধে কোনও অংশে কম নয়। ইতালীয়রা যুদ্ধবিরোধী, অলস, প্রমোদমত্ত জাতি নয়।' ১৯১৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ইতালির মিলানে Fasci di Combattimento নামক এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন মুসোলিনি এবং ফ্যাসিজমকে হাতিয়ার করে এক সঙ্ঘটিত রাজনৈতিক আন্দোলনের আহ্বান জানান। মার্কসিস্ট আদর্শকে মুলতুবি রেখে মুসোলিনির চোখে তখন নায়ক হয়ে ওঠেন ম্যাটসিনি। ইতিমধ্যে ইতালির রাজনৈতিক ইতিহাসে টানাপোড়েন চলছে। প্রধানমন্ত্রী বদলে গেছেন। পার্লামেন্টরি শাসনতন্ত্র প্রায় তখন ভেঙে পড়ার অবস্থা। পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধবিরোধী। মুসোলিনি দেখলেন, এই অরাজক অবস্থাকেই তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি 'কালোকামিজ' (Blackshirts) নামে এক সংঘটিত আধামিলিটারি ফ্যাসিস্টবাহিনি গঠন করেন। সেই বাহিনি নানা সরকারি ভবন দখল করায় ইতালির রাজা ভিত্তোরিয় ইমানুয়েল সন্ত্রস্ত হয়ে ২৮ অক্টোবর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। প্রধানমন্ত্রীর ওপর ইমানুয়েলের কোনও আস্থা ছিল না। সেইসময় ইমানুয়েল চূড়ান্ত অসাংবিধানিক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, আর সেটা হল, তিনি মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। ২৯ অক্টোবর ১৯২২ মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী হন মুসোলিনি।

প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েই মুসোলিনি ধীরে ধীরে এই ধারণা প্রচার করতে থাকেন যে, ফ্যাসিজম সম্পূর্ণরূপে ইতালির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়। ১৯২৪-এ ইতালির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসোলিনি, বিরোধী গোষ্ঠীর ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। মারপিট, খুনজখম ছাড়াও একাধিক নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটপত্র কারচুপির অভিযোগ উঠল মুসোলিনির বিরুদ্ধে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভোটে জয়ী হল মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টি-ই। খুন হলেন সোশালিস্ট নেতা মাত্তিয়েত্তি, কারণ তিনি ওই নির্বাচনের অবৈধতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। আমেন্দোলা, আর এক তীব্র মুসোলিনি-বিরোধী, খুন হলেন এই ঘটনার এক মাস পরেই। মাত্তিয়েত্তি এবং

আমেন্দোলা খুনের ঘটনায় মুসোলিনির আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগলেও, তিনি অপ্রতিহত গতিতে ফ্যাসিজমকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল চূড়ান্ত অরাজক। মাত্তিয়েত্তি এবং আমেন্দোলা খুনের কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইতালি আসেন। তার আঠারো মাস পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ইতালি ভ্রমণ এবং সেইসূত্রেই জন্মলাভ করে রবীন্দ্র-মুসোলিনি বিতর্ক। যে-মুসোলিনি একসময় সোশালিস্ট দলের সমর্থক ছিলেন, যে-মুসোলিনি ছিলেন তীব্র যুদ্ধবিরোধী; সেই মুসোলিনি-ই সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার প্রলোভনে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন আর রবীন্দ্রনাথ কিনা সেই মুসোলিনির-ই জয়গান গেয়েছেন! বিদেশের পাশাপাশি দেশের মানুষ-ও রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝলেন এবং সেই অবস্থায় 'Modern Review' ও 'প্রবাসী'তে যখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ দেশবাসী 'চমৎকৃত' হয়ে উঠেছিলেন।

'এমন কি ফর্ম্মিকিও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ... অসম্মান করেন নি।' :

'The Manchester Guradian'-এ রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি প্রকাশিত হওয়ার পর কার্লো ফর্ম্মিকি তার প্রত্যুত্তরে ওই পত্রিকার সম্পাদককে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। সেই চিঠি প্রকাশ পায় 'The Manchester Guradian'-এর ২৫ অগাস্ট সংখ্যায়। চিঠির শেষে ফর্ম্মিকি লিখেছিলেন, 'অবশেষে ৭ জুলাই একটি চিঠি আসে। ড. টেগোর সেই চিঠিতে লেখেন—তাঁর ইতালি ছেড়ে আসার পর এমন একাধিক তথ্য তাঁর সামনে এসেছে যেখানে ফ্যাসিজ্‌মের প্রণালী মানবতার সুবিচারকে অভিযুক্ত করেছে, ফলে তাঁকে নিরপেক্ষ ও নীরব থাকতে দিচ্ছে না। কুড়ি দিন পরে আর একটি চিঠি আসে যা প্রায় যুদ্ধঘোষণার সামিল এবং যা আমার এই বর্তমান বিবৃতির উৎস। তারপর সব নীরব।'

'লেখাটাকে ভুল বল্‌চেন। ... চিঠিতেই আছে।' :

পত্রোদ্ধৃত প্রথম প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা এই সূত্রে দ্রষ্টব্য

'কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করে ... করা হয় নি।' :

'প্রবাসী' এবং 'Modern Review' পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ইতালি সফরে মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ এবং তারপরে তাঁর সমালোচনা প্রকাশিত হয়, মূল সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন জেনিভায়। ওই দুটি সংখ্যা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'লেখক' বলতে তাঁকেই ইঙ্গিত করেছেন।

'নিকটের ব্যাপার ... যদুনাথ সরকার মশায়ের পত্র ... বিষয় হ'ত না।' :

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকারের মধ্যে সৌহার্দের সম্পর্ক বজায় ছিল ১৯০৪ থেকে ১৯২১ অবধি। ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারকে বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালে যদুনাথ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেই সূত্রে, তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে তাঁর প্রতিকূল মনোভাব-ও গোপন না রেখে ৩১ মে, ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। সেই পত্রটি প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩৫২ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে। যদুনাথের সেই পত্রটি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সদস্যপদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন। (দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খন্ডের ৯২ সংখ্যক পত্র ও গ্রন্থপরিচয় অংশ)।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যদুনাথ সরকারের সেই পত্রটিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

'...র সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় ... করা অসাধ্য হয়েছিল।' :

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম ছিল ক্ষুদু—নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর কথাই বলেছেন। মনে হতে পারে, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নামটি বর্জন করা হয়েছে কেন? কে বর্জন করলেন—রবীন্দ্রনাথ? নাকি, অন্য কেউ? 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পাল 'ছিন্নপত্রাবলী'র একটি চিঠি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'ইন্দিরা দেবী এমনিতেই চিঠির অনেক অংশ বাদ দিয়ে নকল করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তারও উপরে 'ছিন্নপত্র' সংকলনে সময়ে এই শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দেন—যার ফলে তাঁর উত্তেজনার মূল কারণটি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ... পাণ্ডুলিপির পরের পৃষ্ঠার ঊর্ধাংশ কর্তিত, এই তথ্যটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইগুলি রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন বলে মনে হয়। যে-সব বর্ণনা যথেষ্ট ব্যক্তিগত নয় ভেবে ইন্দিরা দেবী নকল করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। যে-অংশগুলিকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে, সেগুলি উদ্ধারের আর কোনো উপায় নেই; কিন্তু কালি বুলিয়ে যে-অংশগুলিকে অবোধ্য করা হয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তার পাঠোদ্ধার সম্ভব বলে মনে করি। এই স্পর্শকাতর, জটিল মানসিকতার অধিকারী মানুষটির অন্তর্লোকে উঁকি দেওয়ার ইচ্ছা দোষণীয় নয়, প্রতিভার কারখানাঘরের চিত্রটি উদ্ঘাটিত হলে আমাদের শিক্ষার ও অনুভবের ক্ষেত্রটি অনেকটা প্রসারিত হতে পারে।' ('রবিজীবনী', তৃতীয় খণ্ড)

ফলে, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম, ইন্দিরা দেবী নিজেও চিঠির নকল করার সময় বাদ দিতে পারেন, অথবা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-ও সেই কাজ করে থাকতে পারেন।

'আপনি Frowardএর প্যারাগ্রাফের ... প্রভেদ বিস্তর।' :

১৯২৫-এর ৬ ফেব্রুয়ারি Mary Blankenhorn মিলান থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ সম্পর্কে আমেরিকার 'Nation' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন। সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইতালির বিভিন্ন সরকারি পত্রিকায় কিছু বিরূপ মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এরপর সুধীন্দ্র বসু 'Froward' পত্রিকায় 'Tagore in Italy' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সেই বিরূপ মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে পরিশেষে লঘুভাবে এই মন্তব্য করেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরার্থবাদের (altruism) বাণী য়ুরোপের পক্ষে উপযুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য চিঠিতে এই লেখাটি-ই উল্লেখ করেছেন।

'জীবনে আত্মীয়তার বিকার .. বল্‌তেম না।' :

অশোক চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণ নিয়ে বিরূপ সমালোচনায় তাঁকে উল্লেখ করেছিলেন 'বৃদ্ধ দার্শনিক কবি'। সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ এখানে 'বৃদ্ধ দার্শনিক কবি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

১৯.৬ সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার ইতালি ভ্রমণের সূত্রে দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে নেতিবাচক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই আলোচ্য চিঠিটি আবর্তিত।

১৯.৭ অনুশীলনী

ক. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. আলোচ্য চিঠিটি কবে লেখা হয়েছিল?

২. 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

৩. কে কার 'আত্মীয়ের মত নিকটে এসেছিল'?

৪. রবীন্দ্রনাথ প্রথম কত সালে ইতালি গিয়েছিলেন?

৫. 'প্রবাসী' পত্রিকা কোথা থেকে প্রকাশিত হত?

৬. রানী মহলানবিশের প্রকৃত নাম কী?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. মুসোলিনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২. টীকা লিখুন : 'কালোকামিজ'।

৩. দ্বিতীয়বারের ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কীভাবে বিকৃত করা হয়েছিল?

৪. ফর্মিকি যে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিকৃত করছেন, তা কীভাবে জানা গিয়েছিল?

৫. মুসোলিনিকে চাক্ষুষ দেখে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেন?

গ. বিস্তৃত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি বিতর্কের মূল সূত্রপাতের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিন।

২. রবীন্দ্রনাথ ও রম্যা রলাঁর সাক্ষাৎকার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

১৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৯৩।

২. 'ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ', কল্যাণকুমার কুণ্ডু, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯, সর্বশেষ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৯।

৩. 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', নির্মলকুমারী মহলানবিশ, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৩৭৬।

৪. 'রবিজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৪।

NOTES